

নায়কের মতো

ନାମ୍ନକେନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟୋ

ଅତୀନ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ



ନିଡି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସ (ପ୍ରାଃ) ଲି:
୬୮, ବାଲୁଜା ମୁକ୍ତି
କଲକତ୍ତା-୭୦୦ ୦୧୬

প্রকাশক :

শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :

বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮

সেদিন প্রভাতী সংবাদপত্রের সামনে সহস্র হৃদয় সহসা মুহূর্তেক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধূ ধূ শূণ্ডতা, হাহাকাৰ, এবং ইত্যাদি...। কেননা প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফের এবং বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের স্থানিক গুরুত্ব ছিল সেই মৰ্শাস্তিক সংবাদ। রূপালী পর্দার প্রেম-প্রণয়-শৌৰ্যবীৰ্যের একচ্ছত্র নায়কোত্তম, উদ্ভিন্ন এমন কি অগণিত অন্তা-যৌবনারও হৃদয়-হতাশ এবং লক্ষ যুবকের স্বপ্ন-পুরুষ অরুণকুমার চিত্র গ্রহণের সময় গুরুতর আহত হয়ে নার্সিং হোমে।

সংবাদটির আবেগ-মূলা—ইমোশনাল ইমপ্যাক্ট—এবং সে কারণে সংবাদ-মূলা সহজেই অহুমান করা যেতে পারে। ফলত তথ্যের সঙ্গে অহুমানের মিশেল দেয়া বিস্তৃতি প্রতিটি সংবাদপত্রের বিবরণেই ছিল। শহর সেই সকালে সংবাদপত্রে অতি-মাত্রায় মনোযোগী হয়েছিল সন্দেহ নেই, এবং সেই আবেগ ও মনোযোগ ছিল নিখাদ খাটি সোনা।

অবশ্য কিছু মানুষ নির্বাচন, জবামূল্যবদ্ধি, টেস্ট মাচে ইংলণ্ডের আটপৌরে দলের কাছে ভারতীয় দলের শোচনীয় পরাজয় প্রতৃতি গতাহুগতিক খবরের মতো এ খবরটিকেও নিরাবেগ অভায়ে গ্রহণ করেছিল। এদের বোধ হয় স্বাভাবিক মানুষ বলা যায় না।

কিন্তু একটি সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, প্রধানত তার রুজি-রোজগার এবং ভবিষ্যতের ভাবনায়, খবরের কাগজের ওপর ঝুঁক পড়েছিল। সামনে নিচু পর্দায় খোলা রেডিও, অর্থাৎ আকাশবাণীর খবরে কি বলে তাও তার জানা দরকার।

প্রশ্নটা বলা যায় তার অস্তিত্বের। কারণ সে অরুণকুমারের ডামি।

গতকালের ঘটনার সময় সেও দৃশ্বে ছিল। এ ছবিতে অরুণকুমারের অভিনয় বৈত চরিত্রে। তাছাড়া প্রচুর আকর্ষণ। অ্যাকশনের দৃশ্গুলিতে ডামি নিলয়কেই অভিনয় করতে হয়। অরুণকুমারের পক্ষে দৌড়ঝাঁপ ঘূষোঘূষি সম্ভব নয়। ঝুঁকি নেবার চেষ্টাও সে করবে না বা কেউ তাকে ঝুঁকি নিতে বলবেও না। অথচ আজকাল অ্যাকশন ছাড়া ছবি চলে না। তাদের প্রিয় নায়ক জীবনের ছরস্ত সমস্যাগুলোকে টপাটপ লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, ছুঁচাৰটে ঘূষি-লাখি-কারাটের প্যাচ-পয়জাবে কূপোকাত করে দিচ্ছে, এসব না থাকলে আর দর্শকের আনন্দ কি? সিনেমা

দেখাই বা কেন ? সিনেমার বাইরে জীবনটা বড় ছাপা হে। কোনো কাজ সহজে হবার উপায় নেই। অথচ সিনেমায় দেখ কত সহজে ব্যাপারগুলো মিটে যাচ্ছে। আর সেই মিটিয়ে দেবার ব্যাপারগুলো যদি অরুণকুমারের মতো নায়ককে দিয়ে হয় তবে কথাই নেই।

আহা কি চেহারা, কি তাকানো, কি ডায়ালগ বলার কায়দা। বাকিটুকু করে দেবার জন্ত আছে নিলয়। দুবস্ত ঘোড়ার পিঠে উর্ধ্বাশ দৌড়ে অরুণকুমার। লং শট। বাসের এয়ার-হর্নের মতো তীক্ষ্ণ শিশের শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। অরুণকুমারের সঙ্গে নিলয়ের চেহারার যেটুকু অমিল দুবস্ত তাও মুছে দিয়েছে। অতএব...জিতা রহো গুরু! ক্লোজ-আপে ঘোড়ার পিঠে অরুণকুমারের শরীরের উর্ধ্বাংশ তুলছে, কেয়ারি-করা চুল এলোমেলো হয়ে ঘামে-ভেজা মুখের ওপর অদ্ভুত অগোছাল গৌছানো কায়দায় নেমে এসেছে। অরুণকুমার বেঞ্চে বসে শরীর দোলাচ্ছে। হাতের লাগামের অগ্রদিক ডাইরেকটরের হাতে—ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে। এবার সম্পূর্ণ ঘোড়া—ঘোড়া ঘুরল—অরুণকুমারের পেছন—নিলয়। অরুণকুমারের গলা—হেঁচ হেঁচ জলদি। গোটা ফ্রেম জুড়ে দিগন্তের ব্যাকগ্রাউন্ডে ঘোড়ার পিঠে অরুণকুমারের ছায়ামূর্তি—নিলয়। নিলয় নয়, অরুণকুমার ! অরুণকুমার ! মায়হাবা! আকাশে হেলিকপটার। হেলিকপটার থেকে নেমে এল দড়ির সিঁড়ি। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে হেলিকপটারে উঠে যাচ্ছে নিলয়। নাঃ নিলয় নয়, অরুণকুমার। অরুণকুমার !

আসলে নিলয় নামের একজন সুন্দর শরীরের এবং আশ্চর্য শারীরিক দক্ষতার অধিকারী তিরিশ বছরের যুবকের শরীরী অস্তিত্বের অতিরিক্ত যে 'আমি'টুকু, যা মানুষকে দেয় বেঁচে থাকার অহংকার—গৌরব, তা যেন কেমন অম্পষ্ট অবাস্তব হয়ে গেছে। তবু, মানুষকে বেঁচে থাকতেই হয়, বেঁচে থাকার জন্ত ভাবতে হয়, বেঁচে থাকার ফন্দি-কিকিরগুলো না খুঁজলে চলে না।

মাঝে মাঝে সিনেমা হলে বসে অরুণকুমারের কোনো ছবি দেখতে দেখতে তার নিজের অভিনীত দুঃসাহসিক দৃশ্যগুলোকেও নিলয় নিজের বলে ভাবতে পারে না, মনে হয় একদা কোনো অলীক স্বপ্নে হয়তো বা সে নিজেকে এইসব দৃশ্যের নায়ক ভেবেছিল। মানুষের অস্তিত্বের কতটুকু তার নিজের ? অথবা নিজের বলে সত্যিই কিছু আছে কি ? এমনতর জটিল দার্শনিক প্রশ্নও যে কখনো কখনো তার মনে উঁকি দিয়ে যায় না তা নয়।

“স্থানীয় সংবাদ পড়ছি .. । ক্ষত খবরের কাগজের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে রেডিওর চাবি ঘোরাল নিলয় । আওয়াজ বাঁজল, বেশি নয়, পাশেই খাটে ঘুমোচ্ছে বাবুসোনা—নিলয়ের দু’ বছরের ছেলে ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বারোদঘাটনের খবরের পরেই অরুণকুমারের খবর । নাঃ, নতুন কিছু নেই । খবরের কাগজে বা লিখেছে তা-ই । নার্সিং হোমের নাম খবরের কাগজে দেয়নি, রেডিও-ও বলেনি । না বলার কারণও আছে । ভিডি সামলাতে তাহলে সেখানে শহরের সমস্ত পুলিশকে জড়ো করতে হবে । আইনশৃঙ্খলার সমস্যা বলে কথা । কালই হয়তো প্রশাসনিক ও পুলিশী বার্থতা নিয়ে বড় বড় নেতাদের বিবৃতি বেকবে কাগজে । এ জিনিস চলতে দেয়া যায় না, দেয়া উচিত নয়, অরিন্দমে হস্তক্ষেপ না হলে দেশ রসাতলে যাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি । ছকটা নিলয়ের জানা হয়ে গেছে ।

কিন্তু তার এখন কর্তব্য কি ? দু’এক জায়গায় খোঁজ নিলেই সে জানতে পারবে অরুণকুমার কোন্ নার্সিং হোমে আছে । তারপর ? তারপর হয়তো সেখানে টেলিফোন করে খবর নিতে পারে । কিন্তু সতাই কি কোনো প্রয়োজন আছে ? যখন টেলিফোনে ওরা জানতে চাইবে তার পরিচয়, তখন কি বলবে সে ? বলবে যে, সে অরুণকুমারের ডামি ? অসম্ভব । হাস্যকর । এটা কোনো মানুষের পরিচয় হতে পারে না । বলবে শুধু তার নাম নিলয় মজুমদার ? এটা আরো হাস্যকর । এ নামটি তার খুব কাছেই কয়েকটি মানুষ ছাড়া কারো কাছেই কোনো অর্থ বহন করে না । অর্থাৎ, অরুণকুমার যদি সজ্ঞানেও থাকে তবু নিলয় মজুমদার নামের একটি মানুষ যে তার খোঁজখবর নিয়েছিল সে খবর তার কাছে পৌঁছবে না । আর না পৌঁছলে খবর নেয়াও অর্থহীন । সে তো এমন কোনো মানুষ নয় যারা অল্প মানুষের খবর নিলেও (এমন কি টেলিকোনেও) সেটা খবর হয়ে যায় ।

অনেক অনুবোধ করেও নিজের নিলয় মজুমদার নামটা সে কোনো ছবির ভূমিকা-লিপিতে তোলাতে পারেনি । তাতে নাকি জানাজানি হয়ে গেলে অরুণকুমারের ইমেজ চোট খেতে পারে । আশঙ্কাটা অরুণকুমারের নিজেরই কিনা তা অবশ্য তাকে কেউ বলেনি ।

একটা জটিল নামের সাধনা তাকে দেয়া হয়েছে—জনি । অনেকবারই তার বলতে ইচ্ছে হয়েছে, এ নামটা দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, দেয়ার কোনো মানে হয় না । কিন্তু বলতে সে পারেনি, বলা তার মতো লোকদের সাজে না । তাই অরুণকুমারের অধিকাংশ ছবির ভূমিকালিপির শেষের দিকে যেখানে অনেকগুলো নাম-

জড়াছড়ি কবে জুত সবে যায় সেখানে একটা নাম থাকে—জনি—বে কে বা কি, চিন্তিতে কি তার ভূমিকা তা নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ মাথা ঘামিয়েছে বলে নিলয়ের জানা নেই। বরং মাথা না ঘামানোয় সে খুশি। দিনেমান্ন সে কি কাজ করি কখনো এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলে নিলয় ব্যাপারটাকে নিজেই খুব সহজ করে দেয়—‘আমি আর কি করব, রিকুইজিশন সাপ্রাই করি।’ অনেক জটিল কঠিন কাজ করার গৌরবের দাবিদার হওয়ার চেয়ে বরং নিজেকে ছোটখাট সাদামাটা একজন ব্যবসায়ী বলায় স্বস্তি মেলে ঢের বেশি। এর মধ্যে অরুণকুমার-নিলয় মজুমদার-জনির অস্তিত্বের ঘোলাটে ব্যাপারগুলো নেই।

কেউ হয়তো বলে—‘তোমার চেহারাখানা জবর হে, হঠাৎ দেখলে অরুণকুমার বলে ভুল হয়। দিনেমান্ন লাইনে যখন আছ, নেমে পড়লেই পার। ভালো পয়সা।’ নিলয় হাসে—‘ঐ চেহারা নিয়েই যে মুশকিল দাদা। ভগবান যে ছাঁচখানায় অরুণকুমারকে বানিয়েছিল আমাকেও সেইটাতেই বানিয়ে ফেলে গোলমাল করেছে।’

সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশটুকু শোনার পর খবরের কাগজ বা রেডিও কোনোটাতেই মনোযোগ ছিল না নিলয়ের। অগ্রমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ কোনো অসুপ্রবেশকারীর তারত্বের রবীন্দ্র-সঙ্গীত সঙ্ঘিৎ ফিরে আসতে সে রেডিও বন্ধ করে দিল। তাকাল বিছানার দিকে। বাবুসোনা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। এবার উঠবে হয়তো। উঠেই শুরু করবে দৃষ্টিপনা। যেদিন সকালে কাজ থাকে না বাবুসোনাকে নিয়েই বেশ কেটে যায় সময়। নিনারও ঘরের কাজে হুবিধা হয়। কিন্তু আজ ছেলের দিকে তাকিয়ে বসেই থাকে নিলয়, অগ্নিদৈব মতো এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নেয় না। শক্তসমর্থ চনমনে শরীরটা যেন আজ হঠাৎই বড় অকেজো হয়ে পড়েছে।

নিনা ঘরে এল চায়ের পেয়লা নিয়ে। টেবিলে নিলয়ের সামনে পেয়লা রেখে বাবুসোনাকে কোলে তুলে নিল। এক হাতে টেনে-টুনে ঠিকঠাক করে দিল বিছানার চাদর। বালিশগুলো সাজিয়ে রাখল।

চায়ের পেয়লায় অগ্রমনস্ক চুমুক দিচ্ছে নিলয়।

ছেলেকে কোলে নিয়ে পা মুড়ে বিছানায় বসে নিনা বলল—কি ভাবছ ?

‘নিলয় তাকাল, হাসল বা হাসবার চেষ্টা করল।

কাল রাতে স্টুডিও থেকে ফিরে নিনাকে সবই বলেছে নিলয়। নিনা বোঝে, অনেক কিছুই বোঝে, যা হয়তো গুর মতো মেয়েরা বোঝে না বলেই লোকের

ধাষণ। কাল রাতেও নিনা ঘে বোঝে তার প্রমাণ আরো একবার পেয়েছিল নিলয় ও নিলয়কে সাহস দিতে চেষ্টা করেনি, অবাস্তব কোনো পরামর্শ দেয়নি, অসম্ভব কোনো মেয়েলী পরিকল্পনাও হাজির করেনি। নিনা কখনো স্পষ্ট করে বলেনি, কিন্তু নিলয় অহুভব করে ওর বৈচে-থাকা আর অস্তিত্বের মথোকার বিরাট ফাঁক আর ফাঁকিট। নিনার মতো করে বুঝতে আর কেউ পারে না। আর সেজগ্রেই একান্ত কাছের মাহুষ হয়েছে সেই ভীষণ পলকা জায়গাটা নিনা কখনো ছুঁতেও চেষ্টা করে না।

ঘটনাটা শুনে নিনা শুধু বলেছিল—‘দেখ কি হয়। এখন পারলে ঘুমোও।’ এই ছোট্ট না-বানানো কথা ক’টির মথো এমন গভীর বন্ধুত্বের আশ্বাস ছিল যা নিলয়কে ভীষণ কোমল আর উচ্ছল করে তুলেছিল তখন।

না, এই একটি ক্ষেত্রে কোনো ভুল করেনি নিলয়। সিনেমার একটি এক্সট্রা মেয়েকে বিয়ে করা নিয়ে স্বজন মহলে কম তোলাপাড় হয়নি সেদিন। বাবা আর বড়ভাই সেই থেকে কোনো সম্পর্কই রাখে না।

তাদের দোষ দেয় না নিলয়। সিনেমার এক্সট্রা যানেই তো সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে। সামান্য টাকার টুকরো কাজে আসত শহরতলির কলোনি থেকে। সেখানে এখনো একখানা মেটে ঘরে থাকে ওর বাবা-মা বড় হুঁভাই। ভাইরা সামান্য রোজগার করে—সোজা পথে নয়, বাঁকা পথে। বাঁকা পথের রোজগারীদের কর্তব্য-দায়িত্বের বোঝাও তেমন সরল থাকে না। ওরা ইচ্ছে মতন সংসারে কিছু কিছু দেয় নিনা মাঝে মাঝে দশ-বিশ টাকার এক্সট্রার কাজ করে সংসারে সাহায্য করার চেষ্টা করত—বোকার মতোই চেষ্টা। এর বাইরে যদি নিনার জীবনে সন্দেহজনক কিছু থাকে তা জানার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি নিলয়। নিনার ঘনিষ্ঠতাই সে প্রয়োজন থেকে বোধ করতে দেয়নি। লোকে কি ভাবল না-ভাবল তাকে আমল দেয়নি।

তার ধারাটাই ঐ রকম। সকলের আশঙ্কি সে প্রায় নিঃশব্দেই পাশ কাটিয়ে গেছে। শুধু দাদার আশঙ্কি নোংরামির কাছাকাছি চলে যাওয়ায় বলেছিল—‘ভূমি এলেমদার লোক, ভালো লেখাপড়া জান, ভালো চাকরি কর, তোমার বৌও এসেছে ভালো ঘরের। আমি সিনেমার ডামি, আমার এক্সট্রাই ঠিক আছে। সবার এক জিনিস সয় না, তোমার মতো বৌ আমার সহবে না, তারও আমাকে সহবে না।’ দাদা এরপর নিলয়কে ভাই বলে স্বীকার না করার কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল।

পাশের ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে বাবুসোনাকে দুধ খাওয়ানো নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কখন এক ফাঁকে ঘর থেকে চলে গেছে নিনা, নিলয় খেয়াল করেনি। নিনার গলায়

স্বন্দ, ধমক, আদব । ছেলে তো নয় খুদে ডাকাত একটি । মুখে শব্দ করে না বিশেষ, যত দাপাদাপি হাতে পায় । একেবারে হিমসিম খেয়ে যায় নিনা । মা-ব্যাটার লড়াই উপভোগ করে নিলয়, হুযোগ পেলে নিজেও কিঞ্চিৎ ভাগ নেয় । এখন সে ইচ্ছাটা চিন্তার চাপে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল ।

সমূহ ভাবনা কয়েকটা বড় খরচ । পরশু ক্ল্যাটের ইনস্টলমেন্ট দেবার শেষ তারিখ । তার পরে দিলে ইন্টারেস্ট গুণতে হবে । সরকারী দাক্ষিণ্যের ক্ল্যাট বলে বাঁচোয়া । তিন মাসে সাড়ে চারশো টাকার মতো পড়ে । কুড়ি বছর দিয়ে যেতে পারলে মালিকানা নিজেই । অবশ্য খুবই ছোট ক্ল্যাট । সাবুল্যো তিনশো স্কোয়ার ফুট জায়গা হবে কিনা সন্দেহ । তবে যা দিনকাল পড়েছে এ ক্ল্যাটও তিন-চারশো টাকায় ভাড়া দিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ ।

এ ক্ল্যাটে ফ্রিজ টি.ভি দামী কার্নিচারের প্রসাধন মানায় না । সে সাধাই বা কোথায় নিলয়ের । বহুকাল পালিশ না পড়া সাধারণ খাট, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, দু'খানা চেয়ার, একটা শস্তা দামের চেউ-খেলানো স্টীলের (?) আলমারি—শোবার ঘরে এদের অবস্থান । বাইরের ঘরে (সাত ফুট বাই আট ফুট দেয়ালঘেরা জায়গাকে ঘর বলতে হাজার আপত্তি থাকলেও আইনত সেটা ঘরই) পুরনো চৌকির ওপর ত্রিশক পেতে এন. টি. সি'র দোকান থেকে কেনা শস্তা রঙিন বেডশীটে চৌকির পায়া পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে বেশ শৌখিন ভঙ্গ চেহারার বসার জায়গা করে দিয়েছে নিনা । বাইরের লোকজন এলে সেখানে বসে । পর্দা ঝুলিয়ে আবহ বাঁচানো । কিন্তু তিনশো স্কোয়ার ফুটে শব্দের গতি অবাধ ।

একবার হিলটন স্ট্রীটে অরুণকুমারের ক্ল্যাটে যেতে হয়েছিল নিলয়কে । একবারই । পাতাহাতি লড়াইয়ের ক্লোজ-আপ শটের জয় তালিম দিতে । সাধা জিনের কড়া ইন্টারিয়ার সাকারি পরা খানদানী চাকর একের পর এক ঘর পার করে নিলয়কে নিয়ে গিয়েছিল অরুণকুমারের শরীরচচার ঘরে ।

নিলয় যতদূর সম্ভব আদেখলেপনা না দেখানোর চেষ্টা করেও ইনটিরিয়র ডেকোরেশনের চূড়ান্ত দেখে এসেছিল । টাকার অঙ্কে এর দাম অনুমান করার সাধ্য তার নেই । আর, যেটুকু দেখেছিল তাতেই মনে হয়েছিল অন্তত তার ক্ল্যাটের মতো আট-দশখানা ক্ল্যাটের জায়গা ওখানে হয়ে যেতে পারে ।

প্রচুর টাকা বাদের হাতে, তাদের বোধ হয় টাকা খরচ করাটাও সমস্যা । নইলে অন্ত বড় ক্ল্যাট নিয়ে কি করে অরুণকুমার ? লোক মোটে দু'জন । বাবা, মা, প্রথম

পক্ষের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সব শৈতুক বাড়িতে। এ স্ক্যাটে দ্বিতীয় পক্ষ সুলক্ষণাকে নিয়ে অরুণকুমার।

দ্বিতীয় পক্ষটা সত্যিই পক্ষ কিনা, আইনের পক্ষপাত এ ব্যাপারে কোন্‌দিকে তা নিয়ে মাথা ঘামানো নিরর্থক। টাকা থাকলে এমন অনেক অধিকার কিনে নেয়া যায়, টাকা না থাকলে যা ভাবাও পাপ। নিলয় নিনাকে বিয়ে করেও শুধুমাত্র ভালোমন্দের কতগুলো বন্ধমূল ধারণার কাছে মার খেয়েছে। আর অরুণকুমার বেমালুম পয়সা দিয়ে সেগুলোকে কিনে ছেঁড়া কাগজের মতো হাওয়ায় দিয়েছে উড়িয়ে।

অথচ অরুণকুমারের লড়াই নায়কের ইমেজ নিলয় ছাড়া মুখ খুবড়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এমনই মজার নিয়মে চলে রঙ্গজগৎ—দু'জনের দামের ফারাক আসমান-জমিন। অরুণকুমারকে দিয়ে কাজ করানোর জন্ত তার দরজায় প্রযোজক-পরিচালকের ধরনা, আর নিলয় কাজ খুঁজে খুঁজে হাল্লাক। অরুণকুমারের দাম ঠিক করে সে নিজে, আর নিলয় তার দামের ব্যাপারে বড় জোর মোলায়েম প্রার্থনা পর্যন্ত যেতে পারে। যে ছবিতে অরুণকুমারের ডামি হতে হয় তাকে সেখানে দু'পয়সা বেশি মেলবে। অন্য ছবিতে পাইকিরি মারপিটের দৃশ্যে অভিনয়ের জন্ত লোক প্রচুর—পয়সাও কম।

কাল পেমেন্ট মেলেনি। দু'হাজার টাকার চুক্তিতে.. কাজ। পাঁচশো টাকা দেবার কথা ছিল। কিন্তু অরুণকুমার চোট খেয়ে পড়ে যেতেই এমন কাণ্ড শুরু হয়ে গেল যে টাকার কথা তখন কে কাকে বলে।

প্রোডিউসার ডাইরেকটর অরুণকুমারকে গাড়িতে নিয়ে সাঁই সাঁই বেরিয়ে গেল স্টুডিও থেকে। অল্প কর্মকর্তারাও একেকজন ছুটল একেকদিকে। পড়ে রইল শুধু জন কয় ঠুঁটো জগন্নাথ আর ছুটকো আর্টিস্ট। তখন মনে হয়েছিল ও কিছু না, বড় লোকের আত্মসেপনা। এখন খবরের কাগজ পড়ে আর রেডিও শুনে হাড় হিম। অরুণকুমার খাড়া না হতে ছবির কাজ তো বন্ধই, পয়সাও প্রোডিউসারের পকেটে। অথচ এই পাঁচশো টাকার বড় দরকার ছিল নিলয়ের। হাতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তিরিশ টাকা আছে কিনা সন্দেহ। কি করা যায়? টাকা জোগাড় করতেই হবে। স্ক্যাটের ইনস্টলমেন্ট না হয় না দিল। পরে হুদ দিয়েই দেবে। কিন্তু সংসারের নিত্যদিনের চাকায় তেল ঢালতেই হবে। সেটা আসে কোথা থেকে?

সাত-পাঁচ চিন্তায় নাজেহাল নিলয় অগ্রমনস্কভাবে পাজানা ছেড়ে প্যাট-শার্ট পরে নিল।

—বেরুচ্ছ? নিনা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল।

নিলয় উত্তর দেবার আগেই টলমল পায়ে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল বাবু-
নোনা। ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিল নিলয়। বাবুনোনা তার সাংকেতিক ভাষায়
জানালা—বেই ঘাই।

—না বাবা, নিলয় বলল, এখন বেই না। কাজে যাচ্ছি।

—আজ তো স্যাটিং নেই, কোথায় যাচ্ছ? নিনা বলল।

বাবুনোনাকে আদর করতে করতে নিলয় বলল—ভাবছি একবার জগদীশদার বাড়ি
থেকে ঘুরে আসি।

জগদীশদা প্রোডাকশন আসিসটাগট। বয়স্ক, খোলামেলা স্বভাবের মানুষ।
বুদ্ধি রাখে। বুদ্ধি দিয়ে উপদেশ দিয়ে নিলয়কে ফিল্মী ছুনিয়ার গোলকর্বাধায় চলতে
সাহায্য করে। আর সংসারের ঘাঁতঘোঁতগুলো বুদ্ধিয়ে দেয় নিনাকে। ওর চায়েরও
একজন বড় সমঝদার জগদীশদা।

—যাপারটা তোমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে মনে হচ্ছে। নিনার ঠোঁটের কোনায়
এক চিলতে হাসি।

—কিসে বুঝলে?

—নইলে সাতসকালে জগদীশদার কাছে ছুটছ?

বাবুনোনার গালে নাক ঘষতে ঘষতে নিলয় বলল—ভাবনার কথাই কিন্তু। তাছাড়া
কিছু টাকার ব্যবস্থাও করতে হবে।

নিনা হাত বাড়িয়ে নিলয়ের কোল থেকে অনিচ্ছুক বাবুনোনাকে টেনে নিল।
বাবুনোনার প্রতিবাদ জানানোর ভাষা বেশির ভাগ বাচ্চার মতো কান্নাকাটি নয়।
প্রহাৰে তার আস্থা বেশি। ছুঁহাতে সে মায়ের চুল টেনে ধরল।

—ছাড়, চুল ছাড়, উঃ লাগছে...

হেসে দরজার দিকে এগোল নিলয়।

২

ছুই বমজ ভাই—শেখর আর রাজেশ। একেবারে ছেলেবেলায় রাজেশ হারিয়ে
যায়। অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিপুল বিত্তশালী পিতার
হৃদয়ে এই বার্থতা বড়ই বেদনার সৃষ্টি করেছিল। যতদিন বেঁচে ছিলেন কোনো
উদ্বেজন্য কারণ ঘটলেই বা হাতে বুকের বা দিকে যেখানে হুংপিণ্ড নামক বস্তুটি থাকে
সেই জায়গাটা চেপে ধরতেন। এবং এইভাবে বুকের বেদনাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃত্যুর সময় বুকে হাত চেপেই তিনি উলটে পড়েছিলেন।

এখন শেখর পূর্ণ যুবক। বাবার বিরাট সম্পত্তির যোগা উত্তরাধিকারী। সে অল্পে চারটে বড় বড় কোম্পানি চালায়। ভালো গান গায়। ঘোড়ায় চড়ে। দারুণ ড্রাইভ করে। প্লেন চালাতেও সমান ওস্তাদ। দুটো দমন শিষ্টের পালন করে। এতসব করার পর একটি আশ্চর্য সুলতানী মেয়ের সঙ্গে নিয়মিত প্রেমও করে।

কাজ ও প্রেমের অবিশ্বাস ব্যস্ততার মধ্যেও সে কিছু বড় একা। মনে তার বড় কষ্ট। হারানো ভাই, যে ভাইকে তার মনেও পড়ে না, তাকে সে কিরে পেতে চায়। বাবার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা সে ভুলতে পারে না। কেবলই মনে হয় রাজেশকে খুঁজে বের করতে পারলেই বাবার স্মৃতির প্রতি ষথার্থ মর্ধাদা দেখানো হবে।

এদিকে রাজেশ কিন্তু সতিাই হারিয়ে যায়নি। স্বচতুর চক্রান্ত করে তাকে চুরি করেছিল দুর্ধর্ষ মাফিয়া কিং হাজি সুলতান। রাজেশের নাম এখন প্রীতম। সুলতানের সে ডান হাত। সুলতান কিন্তু প্রীতমকে জানায়নি তার আসল পরিচয়। গভীর চক্রান্তের জাল সে বুনে চলে।

একদিন সুলতান প্রীতমকে ডেকে দেখায় শেখরের ছবি। অবাক হয়ে যায় প্রীতম অবিকল তারই ছবি দেখে। সুলতান বলে—‘এ হচ্ছে শেখর চৌধুরী। কোটি কোটি টাকার মালিক। এর সঙ্গে তোমার চেহারার আশ্চর্য মিল দেখে কয়েক বছর আগে আমার মাথায় একটা জব্বর প্লান এসেছিল। এতদিন ধরে নিখুঁতভাবে প্লানটা আন্নি তৈরি করেছি। এবার কাজে লাগবার সময় প্রীতম।’ বলে প্রীতমের হাতে মোটা একটা কাইল দিয়ে আবার বলতে থাকে সুলতান—‘এ কাইলে আছে সব কিছু যা শেখর হতে গেলে তোমার দরকার। এমন কি, ওর হাতের লেখার স্পেসিমেন, সই—সব। ওর ম্যানেজারকেও আমি টাকা দিয়ে হাত করেছি। তার কাছ থেকে তুমি সবরকম সাহায্য পাবে। এখন শুধু তোমার শেখর হবার সাধনা। তুমি তৈরি হয়ে গেলেই আসল শেখরের আর দুনিয়ায় থাকবার দরকার হবে না। হাওয়ার মতোই সে মিলিয়ে যাবে। অবশ্য সে কাজটাও তোমাকেই করতে হবে, কেননা তুমি আমি আর ম্যানেজার ছাড়া এ কাজের কোনো সাক্ষী আমি রাখতে চাই না। তারপর নকল শেখর চালাবে আসল শেখরের রাজত্ব। হা: হা:।’

এখন পর্যন্ত গল্পের এটুকুই জানা গেছে।

শেখর আর রাজেশ তথা প্রীতম দুই চরিত্রেই অভিনয় করছে অরুণকুমার। বিস্ক-শর্টে নিলয়কেও দুই চরিত্রেই ডামি হতে হচ্ছে।

দৃশ্যটা ছিল এই রকম :

রাজেশ স্থলতানের নির্দেশে শেখরকে খুন করতে যাচ্ছে ।

গভীর রাত । শেখরের প্রাসাদোপম বাড়ির পেছনে বাগান । বাগানের বাইরে কালো অ্যামবাসাডর থেকে নামল রাজেশ (অরুণকুমার) । অ্যামবাসাডর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল । দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রাজেশ (অরুণকুমার)—ভক্তি হিংস্র, সতর্ক । উঁচু দেয়ালের ওপর রাজেশ (নিলয়), বাগানে লাফিয়ে নামল সামারসন্ট খেয়ে । বাগানের গাছগাছালি আলো-আঁধারির মধ্যে রাজেশ, নিঃশব্দ পায়ে আড়াল খুঁজে খুঁজে এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে মুখের ক্লোজ-আপ (অরুণকুমার) । যেন-পাইপ বেয়ে শেখরের শোবার ঘরের জানলার দিকে উঠে যাচ্ছে রাজেশ (নিলয়) । শেখরের শোবার ঘর । বিছানায় শেখর (অরুণকুমার), জানলার কাছে রাজেশ (অরুণকুমার)—হাতে ছোরা । শেখরের ঘুম ভেঙে গেল । ফাইটিং সিন । লং মিড আর ক্লোজ শটের মিস্স-আপ । প্রয়োজনমতো অরুণকুমার আর নিলয় । কখনো অরুণকুমার শেখর, কখনো অরুণকুমার রাজেশ । কখনো নিলয় শেখর, কখনো নিলয় রাজেশ । টুকরো টুকরো ভাঙা ভাঙা শটগুলো জুড়ে জুড়ে জব্বর একথানা লড়াইয়ের দৃশ্য । দর্শকের চোখে ডাবল রোলে অরুণকুমারের অবিখ্যাত অভিনয় ।

কনটিনিউয়েশন শট :

বারান্দা দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে রাজেশ । তাকে তাড়া করে ছুটে আসছে শেখর । একেক লাফে তিন-চারটে করে সিঁড়ি ভেঙে বিরাট ড্রইংরুমে নেমে গেল রাজেশ (নিলয়) । রেলিঙে-চেপে বাচ্চাদের স্লিপ খাবার মতো সড়াং করে নিচে চলে এল শেখর, বিরাট চারকোণা টেবিলের ওপর ছুটো ভল্ট খেয়ে একেবারে গিয়ে পড়ল রাজেশের ঘাড়ের ওপর—অবশ্যই মিড ও লং শটে নিলয় । হাতাহাতি লড়াই ।

শেখর ও রাজেশের বিপজ্জনক অ্যাকশনগুলো নিলয়কে দিয়ে টেক করা হল ক্যামেরার অ্যাক্সেল এমনভাবে ঠিক করে যাতে দর্শক অরুণকুমারের বদলিকে কোনো-মতেই বদলি বলে চিনতে না পারে ।

লাস্ট শটেই গোলমালটা হয়ে গেল । মিড আর লঙের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ক্যামেরা শেখর আর রাজেশকে ফ্রেম করেছে । হাতাহাতি ঘুষোঘুষি চলছে । শুধু পোশাকের পার্থক্য দেখে বোঝা যাবে কে শেখর আর কে রাজেশ ।

শেষ পর্যন্ত রাজেশ শেখরকে চোট দিয়ে পালিয়ে যাবে । না পালালে গল্প থাকে না, ওখানেই শেষ হয়ে যায় ।

শেখর (অরুণকুমার) রাজেশ (নিলয়) দু'জনে মুখোমুখি । পরস্পরের গলা টিপে ধরেছে ।

ক্যামেরা মিড-জোন থেকে ক্লোজের দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে । পরিচালকের নির্দেশমতো অরুণকুমারের মুখ সোজাহুজি ক্যামেরার দিকে, নিলয়ের মুখ ঘোরানো । ক্যামেরা খুব কাছ থেকে অরুণকুমারের এক্সপ্রেশন ধরে রাখছে । কাট্, । ও. কে ।

বাকি সামান্য একটু কাজ । নিলয় ডান হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘুষি চালাবে অরুণকুমারের তলপেটে । এখানেই কায়দা । ঘুষিতে প্রচণ্ড জ্বরের ভঙ্গি থাকবে, কিন্তু জ্বর থাকবে না, ইমপ্যাক্ট থাকবে না ।

ক্যামেরা আবার পিছিয়ে গেল মিড জোনে । যেমন নির্দেশ ছিল ঘুষি চালান নিলয় । অরুণকুমারের পোশাকও তার ঘুষি ছুল কি ছুল না । নিখুঁত এক্সপ্রেশন দিয়ে অরুণকুমার পেট চেপে উপুড় হয়ে পড়ল টেবিলের ওপর । নিলয় আড়চোখে দেখে চৌঁচাঁ দৌড়ল । কাট্, । ও. কে ।

কিন্তু তারপরই ব্যাপারটা আর ও. কে হইল না । অরুণকুমার উপুড় হয়েই আছে টেবিলের ওপর, গোড়াচ্ছে । অল্প কেউ হলে রসিকতা বলে মনে করা যেত । কিন্তু অরুণকুমার অভিনয়ে ছাড়া রঙ্গ-রসিকতার ধার ধারে না । অতএব ব্যাপার গুরুত্ব ।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হল সোফায় । ত্রস্তব্যস্ত প্রোডিউসার ডাইরেকটর । অথরা তটস্থ ।

কাতরাতে কাতরাতে অরুণকুমার বলল—যা হোক বাবস্থা করুন । অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে ।

প্রোডিউসার ছুটে এসে সেটের এক কোনায় দাঁড়ানো নিলয়কে জিজ্ঞেস করল— ঘুষিটা কানকটেড হয়েছিল নাকি ? তার চোখে স্পষ্ট সন্দেহ ও রাগ ।

—না, না, সভয়ে বলে উঠল নিলয়, ছোঁয়া পর্যন্ত লাগেনি । আমার মনে হয় পড়বার সময় টেবিলের কোনায়...

—সে গবেষণা তোমাকে করতে হবে না । নিলয়কে থামিয়ে দিয়ে প্রোডিউসার দৌড়ল ।

ডাইরেকটরকে একপাশে ডেকে নিয়ে প্রোডিউসার নিচু গলায় তাড়াতাড়ি কিছু আলোচনা করে নিল : ওপরের সারির কয়েকজন কর্মীকে ডেকে দরকারী কয়েকটা আদেশ-নির্দেশ দেবার পর গাড়িতে অরুণকুমারকে নিয়ে তারা বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাত্ ।

দারুণ বাস্তব আরো কয়েকটা গাড়ি ঠুঁড়িও চত্বর থেকে দরকারী লোকজনদের নিয়ে ছুটে গেল বাইরে।

শুধু সাধারণ কর্মীরা আর নিলয় হতভম্ব হয়ে ফিঙ্গফাস জটলায় দাঁড়িয়ে রইল। অরুণকুমারের যদি সত্যিই সিরিয়স কিছু হয়ে থাকে...ভাবতেও বুকে কাঁপন ধরল অনেকের। যারা ইনডাস্ট্রির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত তারাই জানে অরুণকুমার বেহাল হলে গোটা ফিল্ম ইনডাস্ট্রির অবস্থাই হবে ঝড়ের নদীতে হালভাঙা নৌকার মতো। কত লোকের রুজি-রোজগার যে লাটে উঠবে তার ঠিক নেই। সবার মনে চাপা আতঙ্ক, মুখগুলো হুঁচিন্তায় থমথমে।

শুধু একজন ঠিকে মজুর ঢাকা না পাওয়ার আপশোসে বলে উঠল—‘বাঃ শালা. সারাদিন কাজ করে পরসার বেলায় ফকা।’ অনেকে কটমট করে তার দিকে তাকাল। লোকটার কাছে মজুরির পরসারটাই বড় হল! অবশ্য তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এটা হলেও প্রেমেন্ট না হওয়ার বাস্তব সমস্যাগুলো যে সকলের মনে কাজ করছিল না তা নয়।

জগদীশলা চলে গেছে। আর বসে থেকে কি হবে? নিলয় একরাশ ভাবনা মাথায় নিয়ে মেক-আপ তুলতে চলে গিয়েছিল।

৩

শহরের দক্ষিণে শেষ স্টেপে বাস থেকে নামল নিলয়। এরপর মিনিট পনেরো ইটা পথ। রিকশা নিলে দু’টাকা। নিলয় হাঁটতে লাগল।

এগিয়ে-আসা শহরের ধাক্কা খেতে খেতেও গ্রাম একটু-আধটু এখনো বেঁচে আছে এখানে। মাঝে মাঝে সরকারী আবাসনের এজমালি মালিকানার বড় বড় বাড়ির জটলা। ব্যক্তিগত মালিকানায় স্নন্দর স্নন্দর বাড়িও উঠছে অনেক। কিন্তু মেটে পথ, গ্রামের মতো এলোমেলো ছড়ানো-ছিটানো সবুজ ঘাস, জানা-অজানা নানান ছোট গাছের বোপঝাড়, মাথা উঁচিয়ে এখানে-সেখানে দু’একটা বড় গাছ, পুকুর, ডোবী, কচুরিপানা ইত্যন্ত রয়ে গেছে। নিলয়ের শহরে ক্লাস্ত চোখ আরাম পায়।

তিরিশ-পঁয়ত্টিশ বছর আগে এখানে প্রথম আত্মনা নিয়েছিল জগদীশলা। তার মুখ থেকেই শোনা এ জায়গা তখন ছিল পুরো গ্রাম। বন-বাদাড়ে ভর্তি। সন্ধ্যা হলেই শেরালের কেতন শুরু হয়ে যেত। সাপখোপ ছিল বিস্তর। সন্ধ্যার

শীথ তখন চার দেয়ালের চাপে নীরব হয়ে যেত না, খোলা উঠোনে শিদিম-জালানো তুলসীতলা থেকে আকাশে ছড়িয়ে যেত অনেকদূর। মাঝে-মধ্যে ছোট আকারের বাষ্প নাকি বেরত। বাষ্পের গুরু নিয়ে বাগ্গার কাহিনী চালু আছে। তবে মাহুসে তাদের রুচি ছিল বলে শোনা যায়নি। চোর-ডাকাতের উৎপাত ছিল ভয়ানক। সন্ধ্যা হলেই দোরে খিল পড়ে যেত।

তবু স্টুডিও পাড়ার কাছাকাছি বলে এখানেই বাসা নিয়েছিল জগদীশদা।

সিনেমা নামের মায়াবিনী এমন কুহকে তাকে জড়িয়েছিল যে তা থেকে আজও তার মুক্তি মেলেনি। মুক্তি সে চায় না বলেই নিলয়ের ধারণা, মাঝে-মাঝে যদিও ঘেমায় এ লাইন ছেড়ে দেবার চিন্তা করে।

নিলয় জানে সেটা জগদীশদার মনের কথা নয়। আজ আর মোহ নেই, কিন্তু ভালোবাসা আছে—স্বপ্ন তৈরি করার কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখার ভালোবাসা। প্রথমে বাসনা ছিল গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা হবার। যখন দেখা গেল সেখানে প্রবেশাধিকার পাবার যোগ্যতা বা স্বযোগ কোনোটাই তার নেই তখনো সে কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি, সরিয়ে নেয়নি নিজেকে। প্রাসাদের বাসিন্দা যদি না-ও হওয়া যায় প্রাসাদ তৈরির কারিগর হওয়া ঠেকায় কে—চেষ্টি যখন আছে, শক্তি আছে, সবার ওপরে ভালোবাসাও আছে বুকভরা।

ছবি তৈরির হেন কাজ নেই যা সে জানে না। শুধু জানে না গল্প বানাতে, স্ক্রিপ্ট লিখতে, আর নেহাত নির্লজ্জ হতে পারেনি বলে পরিচালক হবার দুঃসাহস দেখাতে। কেউ তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলতে চাইলে সে বলে—‘নারে ভাই, পেটে চুঁ চুঁ বিচ্ছে নিয়ে যারা ওসব করতে সাহস করে ককক। আমি ওর মধ্যে নেই। নিজের বিচ্ছের বহর জানি। অজ লিখতে পোজ কাটে পুজের নাম বন্ধেশ্বর। অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপরে নাম লেখাতে চাই না। চলে তো যাচ্ছে।’—‘এ আপনার বাড়াবাড়ি’, কেউ হস্ততো আপত্তি করে, ‘আপনি একটু চাপ দিলেই অনেক ওপরে উঠতে পারেন। কত শালা ফেক্‌লু—!’—‘তা হস্ততো পারি। কিন্তু উঠে সেখানে থাকতে পারব না। পড়ায় বড় কষ্ট। তার চাইতে যতটুকু সয়, যতটুকু রাখতে পারব সেই ভালো।’

ছবি তৈরির মাগন্ত জগদীশদার নখদর্পণে। কোথায় কোন্টা পাওয়া যায়, কোন্ লোককে দিয়ে কোন্ কাজ ভালোভাবে হবে, চালচলন স্বভাব বুঝে কেমন করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া যায়, কোন্ স্টুডিওর ভাঁড়ারে কি আছে,

কোথায় কোন্ নতুন টেকনিশিয়ান উঠছে—তামাম স্থলুকসন্ধান মাথায় নিয়ে বসে আছে জগদীশদা, সেগুলোকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয় সে বিস্তেও তার জানা। তাই ছবির অতি আকালের দিনেও জগদীশদার কাজের অভাব হয় না। প্রোডিউসার ডাইরেকটর তাকে খুঁজে বেড়ায়।

অল্পে-তুই কাজ-পাগল মানুষটা ডুবে আছে তার ভালোবাসার কাজে।

ফিন্মী ছুনিয়ার বাইরে আলোর ছটা, ভেতরে অঙ্কার, ঘুরঘুটি অঙ্কার। এমন ঠকানো বোধ হয় আর কোনো ব্যবসায় নেই। সিনেমার কাগজে ছবি-ছাবা গালগল্প দেখে মনে হয়—আহা, রূপকথার জগৎ যদি কোথাও থাকে তবে তা এইখানে—এইখানেই।

স্থপার-স্টার স্টারদের বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে লোকে ভাবে এরই নাম বেঁচে থাকা। কিন্তু জানে না, বেঁচে শুধু ওরা ক'জনাই আছে, আর যারা ওদের বাঁচিয়ে-রেখেছে মুখে ঠিকমতো রঙটি লাগানো, ঠিক জায়গায় আলোটি ফেলা থেকে আরো হাজারো কাজে—তাদের প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত। এমন তাজ্জব ব্যবস্থা!

অরুণকুমার একেকটা ছবিতে নেয় দশ লাখ—তার মধ্যে লেখাপড়ায় দু থেকে তিন, বাকিটা কালোয়। তারপরেই হয়তো দেখা যাবে অরুণকুমারের চাইতে অনেক বড় অভিনেতা শঙ্কুবাবু, যাকে বলে সত্যিকারের ক্যারেকটার আর্টিস্ট, আগাগোড়া ছবিতে কাজ করলেন দশ হাজারে। ডাইরেকটর ক্যামেরাম্যান এডিটর—এরাও মন্দ পায় না।

কিন্তু যারা সবকিছু তৈরি করে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘামে ধুলোয় একাকার হয়ে (তবে না দেড় মিনিটের কালোয়াতি দেখিয়ে দিগ্বিজয় করে অরুণকুমারেরা, ডাইরেকটর ক্যামেরাম্যান দাঁত কেলিয়ে পুরস্কার নেয়) তাদের মধ্যে যারা সত্যিকারের এলমদার তাদেরও অনেকের রোজগার কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারের চাইতে কম। বেশি চাইলে কর্তারা বলে—‘এর চেয়ে বেশি দিতে পারছি না ভাই। তুমি বরং অল্প কাজ খুঁজে নাও।’

বলার হক তাদের আছে, কারণ সাদা-কালোয় মিলিয়ে টাকা তাদের অশুনতি, আর এটা ছুনিয়ার বহু পুরনো সত্য যে বেশি টাকা করতে হলে কখনো কম টাকার মানুষদের বেশি টাকা দিতে নেই। জগদীশদাও এর বাইরে নয়। অল্পদের চাইতে তার অবস্থা ভালো। তবে সেখানেও কর্তাদের হিসেব ঠিকই আছে। জগদীশদা কাজ করে তিনজন লোকের, তার সিনেমায় জগৎটাকে গুলে খাওয়া বিস্তেও অনেক

কাজে আসে কর্তাদের, তাকে দেড়জন বা দু'জন লোকের পয়সা দিয়ে রাখলেও লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

জগদীশদাকে বসে থাকতে হয় না, সারা বছরই তার কম-বেশি কাজ থাকে। তাই সিনেমা জগতের সাধারণ কর্মীদের পক্ষে যা স্বপ্ন, সেইগুলো মোটামুটি বাস্তব করতে পেরেছে সে। খায়দেনায় ডুবতে হয়নি। সংসারটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। সে এখন জব্বলপুরে চাকরি করে। বিধবা বুড়ো মায়ের সদগতি পর্যন্ত তার সেবায়-চিকিৎসায় ক্রটি করেনি। অবশ্য বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি ব্যাংক-ব্যালাঞ্জের মতো অবাস্তব জিনিস সে করতে পারেনি। তবে জীর্ণদশা যে বাড়িটায় জগদীশদা তিরিশ বছরের ওপর ভাড়াটে তার ভাড়াও বাকি পড়ে নেই।

এমন একজন সচ্ছল মানুষ সম্পর্কে সহকর্মীদের ঈর্ষা থাকাই স্বাভাবিক! কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা অগ্নরকম। জগদীশদা ছোটবড় সব সহকর্মীরই জগদীশদা। সকলের মন্ত সহায় আপদে-বিপদে। সারা তার যত সামান্যই হোক, ভালোবাসা সাহস বুদ্ধি দিয়েও যে সাহায্য সে বন্ধুদের করে তার দামও কম নয়।

নেতা সে নয়। কিন্তু হালফিল নেতাদের যে হাল দেখা যাচ্ছে তাতে জগদীশদার মতো মানুষরা নেতা হলে বা হতে পারলে অনেক কামেলার স্বরাস্য হয়ে যেত।

মোদ্দা জিনিসটা ভালোবাসা। রাজনীতি মানুষ করে মানুষের জ্ঞান, অন্তত সে রকমই বলে রাজনীতি-করা মানুষেরা। কিন্তু সত্যিই কি ভালোবাসার ছিটেকোটা কোথাও বেঁচে আছে তাদের মনে? যদি থাকত তবে কি এ হাল হত দেশের? দেশের মানুষের? ক্ষমতা আছে, ভালোবাসা নেই। তাই কিছু হচ্ছে না। ভালোবাসার অভাবে মানুষ ধুঁকছে।

মানুষের মনে জন্মাচ্ছে ঘৃণা। নিলয় অহুভব করতে পারে তার নিজের মনে যমন, তেমনি তার চারপাশে, যেদিকে তাকাও সেদিকেই, প্রতি মুহূর্তে জন্ম হচ্ছে ঘৃণার। তার চেহারা অস্পষ্ট, কখনো ভুল, নোংরা। কিন্তু এই ঘৃণাই হয়তো একদিন জমতে জমতে বিশাল হয়ে উঠবে, ঠিক পথ ঠিক লক্ষ্য খুঁজে নেবে, ফেটে পড়বে, হড়িয়ে পড়বে দাঁউ দাঁউ আঙুনের মতো। তারপর ছাইয়ের রাশিতে নামবে অঝোরে ঝুটি, একটি দু'টি করে জন্ম নেবে ভালোবাসার অজস্র সবুজ চারাগাছ। ছবিটা নিলয়ের মনে স্পষ্ট নয়, তবু এমনটাই যেন ঘটবে বলে তার মনে হয়। পৃথিবীতে

বেশির ভাগ মানুষই যে কোনো না কোনো ভাবে ডায়া হয়ে বেঁচে আছে। এ কি চিরকাল চলতে পারে ?

এ রাস্তায় নিলয়ের আশা যাওয়া বহুদিনের। প্রথম এসেছিল সাত বছর আগে। সেদিন বুকের দুক্ক দুক্ক কাঁপন আজও মনে পড়ে।

কেলের ধার ঘেঁষে প্রি-ইউ পাস করে সে তখন একটা কাজের জগৎ হস্তে হয়ে ঘুরছে। লেখাপড়ায় আর এগনোর চেষ্টা করার আশা নেই। দাদা ভ্রম্বে ঘি ঢালতে নারাজ। সংসার চলে তারই যোজ্ঞার। তার ওপর কথা বলার সাধ্য কারো নেই।

বিটায়ার্ড বাবা তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত। সংসারে সাহায্য করতে না পারার অক্ষমতা তিনি সর্ববিষয়ে নীরব থেকে স্বীকার করে নেন। বাবাকে অহুসরণ করা ছাড়া মা'র গতি নেই। নিলয়ের লেখাপড়ায় দাঁড়ি টেনে দেবার ব্যাপারে তাঁদের কোনো মতামত জানা গেল না। যদিও দাদার চাকরি বাবারই দৌলতে। একরকম হাতে ধরেই তাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য দাদা লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না—গ্র্যাজুয়েট। দাদা নিলয়ের চাইতে প্রায় দশ বছরের বড়। তখনো চাকরির বাজার এত খারাপ হয়ে যায়নি। এখন হলে কি হত বলা শক্ত। হয়তো দাদাকেও তার মতোই ফেকলু হয়ে থাকতে হত। কিন্তু যেভাবেই হোক একবার পায়ের নিচে মাটি পেয়ে গেলে সচরাচর মানুষ সব ভুলে দাপাতেই ভালোবাসে। দাদাও নিলয়কে অহরহ তার অপদার্থতা স্মরণ করিয়ে দিত। উত্তর দেবার শব্দগুলো মনে মনে শানাত নিলয়, ব্যবহার করত না।

বাবার যেমন যোগ্য সহধর্মিণী মা, দাদারও তেমনি বৌদি। উত্তরের যোগ্য প্রত্যুত্তরে তিস্কতা কতদূর গড়াবে আন্দাজ করা শক্ত ছিল না। তার চেয়ে দু'বেল দু'মুঠোর ব্যবস্থা করতে পারলে মানে মানে সরে পড়াই ভালো।

কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডখানায় শুধু পুরনো তারিখগুলো কেটে নবীকরণের তারিখগুলোই লেখা হতে থাকে, ইন্টারভিউর ডাক আসে না। খবরের কাগজ দেখে করা দয়খাস্তগুলো শেষ পর্যন্ত মনে হয় বাজে অভ্যাসের মতো, যা ছেড়ে দিতে পারলেই ভালো। ব্যবসা? তাতে টাকা লাগে। তার ওপর গুরু ছাড়া ও লাইনে প বাড়িয়েছি কি ভুবেছ। না টাকা, না গুরু। অতএব ব্যবসা দিয়ে বসার আশা ন করাই ভালো। টিউশনি? তা-ই বা তার মতো বিজ্ঞপ্তিকে কে দেবে?

এক পালকের পাখিরা এক জায়গাতেই জোটে। বেকারের গতি বেকার।

কাজ না থাকা লম্বা সময় একা একা কাটানো অসম্ভব। কাজের লোকেরা নিশ্চল

মকাজের লোকদের সঙ্গে দিতে কাজ কামাই করে বসে থাকবে না। বেকার তাই দু'জনে বেকারকে।

পাড়ার বেকারদের আড্ডায় গিয়ে জমত নিলয়। কিন্তু মনে-প্রাণে পাকা বেকার সে হতে পারেনি যেমন হয়ে গিয়েছিল ওর কোনো কোনো বন্ধু। পরগাছার জীবনে যে কোনো মানি আছে তা ওদের দেখে মনে হত না। কাজকর্ম খোঁজার ওদের আর আগ্রহ ছিল না। ভাবখানা ছিল এই রকম—সকলের সবকিছু হয় না, সকলের চাকরিও হয় না। কাজকর্ম যারা করে তাদের যেমন বেঁচে থাকার একটা ধরন আছে, যারা করে না তাদেরও একটা ধরন আছে, এতে লক্ষ্যের বা দুঃখের কি? ওরা নানান কায়দায় ছুটকো স্বখের সওদা করে বেড়াত। নিলয় কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকেও ওদের মানসিকতায় ভাগ বসাতে পারেনি। ভেতরে অসম্ভব জালা আর চাপা অস্থিরতা নিয়ে চোখ-কান খোলা রেখে ও শুধু হাতড়ে বেড়াত যে কোনো একটা রাস্তা...যে কোনো...

তার চেহারার সঙ্গে অরুণকুমারের চেহারার দারুণ মিল নিয়ে অনেকসময় আলোচনা হত—অনেকরকম ব্যাখ্যান। পথে-ঘাটে তার দিকে অচেনা লোকের ফিরে ফিরে তাকানোও নিলয়ের কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুরনো জিনিসটাই হঠাৎ একদিন নতুন মানে নিয়ে হাজির হল।

বন্ধুদেরই কে একজন বলেছিল—‘তোরা নাইনটি পারসেন্ট অরুণকুমার-মার্কী চেহারাখানা মাইরি কোনো কাজেই লাগালি না। দেখ না একবার ফিল্ম-নাইনে...’—‘দূর, চেহারা দিয়ে কি হবে, ও রকম অ্যাকটিং বাপের জন্মে করতে পারব!’

‘আড্ডার কথা আড্ডার চালেই তখন উড়িয়ে দিয়েছিল নিলয়। কিন্তু পরে একা হতে মনে হয়েছিল—কি জানি, হতেও পারে আমার চেহারাটাকে কারো না কারো দরকার।

যদিও দরকারের চেহারাটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। অনেক আজগুबी সম্ভাবনা মাথায় আসত, আবার সেগুলি যে আজগুबी তা বুঝতেও সময় লাগত না। অরুণকুমারের সঙ্গে চেহারার মিলের স্বত্র ধরে নিজেকে তার যমজ ভাইয়ের চরিত্রে কল্পনা করত নিলয়। পরক্ষণেই মনে হত, ধুং, প্রোডিউসার অরুণকুমারকে দিয়েই ডাবল রোল করাবে, তাকে নিতে যাবে কেন। অরুণকুমার ডাবল রোল করা মানে প্রোডিউসারের টাকা তিন ডবল হয়ে ফিরে আসা। ফিল্মী পত্রিকা পড়ে এসব জানা ছিল নিলয়ের।

বিশ্বেবুদ্ধি, মুকুবীর জোর, ঘুম দেবার মতো টাকা—যা যা থাকলে তার মতো ছেলেরও ছিলে হয়ে যায় সেসব একেবারেই না থাকায় নিজের চেহারাটাকেই মনে মনে ঝাঁকড়ে ধরল নিলয় ।

ভাবনাটা আস্তে আস্তে গভীর শিকড় চালিয়ে দিল মগজে । চেহারাই তার একমাত্র মূলধন । এই মূলধন কাজে লাগিয়েই তাকে ভবিষ্যত তৈরি করতে হবে ।

আড্ডা কামাই করে শুরু হল স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘোরা । একে তাকে ধরে গ্যাটিং দেখা ।

অরুণকুমারের সঙ্গে চেহারার অভূত মিল ছিল সহজ ছাড়পত্র । স্টুডিওর অনেক লোকজনের সঙ্গে মুখচেনা হয়ে গেল । ওরা তাকে একটা নামও দিয়েছিল—ছুনধর অরুণকুমার—সংক্ষেপে ছুনধর । শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে গ্যাটিং দেখতে নিলয়কে অস্বস্তিও নিতে হত না ।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই । গ্যাটিং দেখার রোমাঞ্চ আস্তে আস্তে কেটে গেল । কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না । অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে । কিন্তু কাকে দিয়ে যে কাজ হবে তা সে বুঝতে পারে না । তার চেয়েও বড় ভাবনা, কোন্ কাজ সে চাইবে ? যে চেহারাটাকে সে মূলধন করবে ভেবেছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটা তাকে খানিক আলগা ষাতির পাইয়ে দিচ্ছে, তার বেশি নয় । জনা কয়েক গ্যাটিং দেখার বাতীকগ্রস্ত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । বাউতুলে খ্যাংপাটে ধরনের মালুম সব । গ্যাটিং আর আর্টিস্ট দেখার নেশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টুডিওতে কাটিয়ে দিত । স্টুডিওর লোকেরা এদের সঙ্গে কিচলেমো করত । নিলয়কে ওরা সে জায়গায় নামিয়ে আনেনি । হয়তো অরুণকুমারের উনিশ-বিশ চেহারাখানা আর সেই সঙ্গে কথাবার্তার পালিশ ঐ লোকগুলোর মতো ভাঁড় বনে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছিল তাকে ।

কিন্তু বেশিদিন বাঁচা যাবে কি ? তাকেও শিগগিরই ওরা অকস্মা বাউতুলে ঠাওরাবে । শুরু করতে হান্সি-মশকরা, পেছনে লাগা । তার আগেই সরে পড়তে হবে । পালানি পালানি করছিল নিলয় ।

এ সময়ে ঘটে গেল একটা অভূত ঘটনা । তার জীবনে মোড় ঘোরার বৃত্তান্তের শুরু সেদিন ।

অল্পদা স্টুডিওর এক নম্বর ক্লোরে দারুণ সেট পড়েছে একখানা । রাজবাড়ির সেট । আর্টিস্টরা তখনো সেটে আসেনি ।

নিলয় বসে বসে দেখছিল সেট সাজানো, আলোর বাহার, কাঠ-কাপড়-বউর

দেয়াল, প্রাক্টিকের ঝাঙলঠন, কুচি-দেয়া কাপড়ের ডিজাইন করা সিলিং। ভাবছিল কি আশ্চর্য ক্ষমতা ক্যামেরার। এইসব জিনিষ, যা সামনাসামনি মেকি বলে চিনতে মুহূর্ত সময় লাগে না, ক্যামেরার চোখ দিয়ে যখন দেখানো হয় দর্শককে তখন সাক্ষার মতোই দেখে সে। আগলে মায়া, বিভ্রম—মায়া তৈরির কারিগর এরা।

হয়তো সেই সময় নিলয়ের আক্ষেশ হচ্ছিল—সে এই মায়ার জগতের একজন হতে পারছে না বলে। ভালোবাসা, ক্রোধ, কামনা-বাসনা, সত্যাসত্য এবং শেখাবধি ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়—মাহুঘের যাবতীয় আবেগকে যারা দোলায় খেলায়, তারা যে কি নিরাবেগ হিসাবের কৌশলে কাজগুলো করে যায় তার খবর তখন জানত না নিলয়। কর্মীদের হুঃখ-হুর্দশা অভাবের টুকরো টুকরো শব্দ কানে আসত। কিন্তু আবেগ নিয়ে খেলা করার বড়দরের কারিগররা যে বঞ্চনারও কত বড় কারিগর তা জানবার সুযোগ তখনো তার হয়নি।

মুখচেনা একটি লোক এসে বলল—এই যে দু'নম্বর, জগদীশদা ডাকছে তোমাকে তিন নম্বরে।

জগদীশদা ততদিনে নিলয়ের চেনা। স্টুডিও পাড়ায় দু'চার দিন ঘোরাঘুরি করলেই তাকে চিনতে বাধ্য হবে যে কেউ। সে শুধু একটা মুখ নয়—মাহুঘ। সবাই তাকে খুঁজছে, ডাকছে, প্রোডিউসার থেকে সাধারণ কর্মী সবাই। জগদীশদার মতো কাক্সের মাহুঘের তার মতো অকস্মিকে কি দরকার পড়ল? ভাবল নিলয়।

—জগদীশদা আমাকে ডাকছে? কেন?

—তা আমি জানি না। বলল তোমাকে পেলো ধরে নিয়ে যেতে একেবারে।

—তিন নম্বরে আজ অরুণকুমার মিত্রা রায়েব শুটিং। বাইরের লোক চুকতে পারবে না।

—সে ভাবনা তোমার নয়—জগদীশদার।

সুতরাং লোকটির পিছু পিছু তিন নম্বর ক্লোবে গিয়ে হাজির হল নিলয়।

জগদীশদা যেন তার জগুই অপেক্ষা করছিল।

—এই যে ছোকরা, কি যেন ডাকে তোমাকে সবাই, দু'নম্বর, না? বেশ, এসো আমার সঙ্গে।

নিরন্তরে জগদীশদার সঙ্গে এগোল নিলয়।

ক্লোর জুড়ে সেট পড়েছে। জগদীশদা নিলয়কে সোজা নিয়ে গেল একটা আঁকা দেয়ালের সামনে। কাঠের ক্রেমে আঁটা মোটা কাপড়ে আঁকা। ছ'সাত ফুট উঁচু হবে।

ওপৰে এক ছুট মতো চণ্ডা কাঠেৰ টানা পাটাতন কৰা আছে। ওখান দিয়ে কেউ হেঁটে গৈলে মনে হ'বে দেয়ালৰ ওপৰে হাঁটছে।

—দেখেছ ? জগদীশদা জিজ্ঞাস কৰল।

—হ্যাঁ।

—কি দেখেছ ?

—দেয়ালটা। আপনি তো সোজা এখানেই নিয়ে এলেন। স্মার্ট হবার চেষ্টা কৰছিল: নিলয়, কিন্তু তার বুকৰ ভেতৰে তখন দাৰুণ কোঁতুহল আৰ উত্তেজনাৰ তোলপাড়।

—চেহারা দেখে মনে হয় বেশ ফিট। দেয়ালটার ওপৰ হাঁটতে পারবে ?

—এ, আৰ কি !

—ওখান থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবে নিচে ?

—যদি বলেন লাফিয়ে দেখাতে পারি।

—দেখাতে হবে না। চল।

কোৱাৰ সময় নিলয় দেখল কোৱে কোনো আৰ্টিষ্ট নেই। সাজানো সেট, আলো তৈৰি, কমীয়াও ছোট ছোট ছুঁতিন জনেৰ জটলায় কিম্ব বলাবলি কৰছে চাপা গলায়। পোলমালৈ গন্ধ পেল নিলয়।

কোৱাৰ থেকে উঠোনে নেমে জগদীশদা বলল—শুনেছি তুমি প্রায়ই স্টুডিওতে ঘূৰে ঘূৰে গুটিং দেখ। কেন ?

—ভালো লাগে, মানে...

—কাজকর্ম নেই বুঝি ?

জগদীশদাৰ গলায় এমন সহজ অন্তরঙ্গতা যে হঠাৎ নিলয়ও মেলে ধরল নিজেকে—
অনেক চেষ্টা কৰেছি জগদীশদা, হল না, তাই...

—তাই বুঝি ভাবলি চেহারাটা যখন অৰুণকুমাৰেৰ মতো তখন স্টুডিওতে ঘূৰে বেড়ালেই তুই আবেকটা অৰুণকুমাৰ হয়ে যাবি। তুমি থেকে 'তুই'-এৰ অন্তরঙ্গতায় চলে এল জগদীশদা।

—না, তা ঠিক নয়।

—তা-ই যে বাবা, তা-ই। আবে পাগল, অৰুণকুমাৰ দুটো হয় না। তার দরকাৰও নেই। ছেলেমাছ! শোন, তোকে কাজেৰ কথাটা বলি এবাৰ। জানিলে তো আজ অৰুণকুমাৰেৰ গুটিং ছিল এই কোৱে ?

—শুনেছি।

—দেয়ালের ওপর হাঁটবে ঠিক ছিল অরুণকুমারই, সেখান থেকে লাকিয়েও পড়বে সেই। সিনটা পড়ে ওর খুব ভালো লেগেছিল। বলেছিল, ট্রিক-শটের ক্যামেরা কববার দরকার নেই। নিজেই করবে। এখন সেটে এসে মাথা গরম। রিক নেয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়...ইত্যাদি...

—তা, উনি নিজেই বলেছিলেন যখন...

—তাতে কি হয়েছে? তখন ঝাঁকের মাথায় বলেছিল, এখন ভড়কে গেছে। কিন্তু অরুণকুমারকে মুখের ওপর বলার সাহস কারো নেই। গুটিং আজকে বরবাদ বলেই সবাই ধরে নিয়েছে। প্রোডিউসারের লস্ হয়ে যাবে বেশ কয়েক হাজার। হঠাৎ আমার মনে পড়ল তোকে। কে একজন বলল তুই স্টুডিওতেই আছিস অগ্নি ফ্লোর। খুঁজতে লোক পাঠালাম। এখন দেখি কি হয়...

বলতে বলতে ওরা চব্বর পার হয় টানা বারান্দায় উঠে এসেছে। এক শারি ঘর।

তাকে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে সেটা জগদীশদার কাছ থেকে জেনে নেবার আগেই সে নিলয়কে দাঁড়াতে বলে একটা ঘরে ঢুকে গেল।

মিনিট দুয়েক পরেই বেরিয়ে এসে ডাকল—আয়।

জগদীশদার শিছু শিছু ঘরে ঢুকে নিলয় দেখল অফিসঘরের মতো ঘরটিতে চারটি চেয়ার দখল করে চারজন লোক বসে আছে। তাদের একজন অরুণকুমার। অগ্নিদের সে চেনে না।

বেশ নাটুকে ভঙ্গিতে জগদীশদা নিলয়কে ওদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল—দেখুন, এরই কথা বলছিলাম তখন। কি অরুণবাবু, নিজেকেই দেখছেন বলে মনে হচ্ছে না?

অরুণকুমার যদিও দেখছিল নিলয়কে এবং যথেষ্ট আগ্রহ ছিল সে দেখায়, তবু সে জগদীশদার উচ্ছ্বাসকে একেবারেই আমল না দিয়ে পাশে-বসা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটিকে (পরে জেনেছিল নিলয় ইনি বিখ্যাত পরিচালক ব্রজেন রায়) বলল ইউজ করতে পারেন। তবে ক্রোজ শট নেবেন না। ডিফার করলে আমি আলাউ করব না।

নিলয়ের কাছে এগুলি সাংকেতিক শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। সে ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছিল।

—তাহলে যেক-আপে বসিয়ে দি। বলে জগদীশদা নিলয়কে হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

সেদিনের ঘটনা ভাবলে আজও নিলয়ের শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। সন্ধ্যাটা কেটেছিল অদ্ভুত আবেশের মধ্যে। তাকে মেক-আপ দেয়া হয়েছিল অরুণকুমারের। মেক-আপ শেষ হতে নিজেকে আয়নায় দেখে সে চমকে গিয়েছিল। তারপর পরিচালকের নির্দেশে দেয়ালের ওপর হাঁটা, দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে পড়া। এবং কাজের পারিশ্রমিক পঞ্চাশ টাকাও তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল জগদীশদা। সেদিনই প্রথম অরুণকুমারের স্মাটিং দেখার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল তার। আশ্চর্য ক্ষমতা কিন্তু লোকটার। কি করতে হবে শুধু একবার বুঝিয়ে দেয়ার ওয়াস্তা। তারপর কত সহজে অল্প একজন মানুষ হয়ে যেতে পারে সে।

স্মাটিং হয়ে যাবার পর জগদীশদা নিলয়কে বলেছিল—আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। একদিন সময় করে আমার বাসায় চলে আয়। দেখি করিস না। বলা বাহুল্য দেরি নিলয় করেনি।

জগদীশদা তাকে ঘরে বলিয়ে চার্টা খাইয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির খবর জেনেছিল।
—স্টুডিওতে ঘুরছিস কাজের খান্দায়, ভালো। কিন্তু কি কাজ করবি বল? অভিনেতা তুই হতে পারবি না।

—কেন ?

—অভিনয় করার ক্ষমতা তোর আছে কিনা জানি না। থাকলেও চান্স পাওয়া শক্ত। তুই তো পারবিই না। ভালো চেহারা, অল্প বয়েস, তার ওপর যদি অভিনয় করার ক্ষমতা থাকে তাহলে চেষ্টা করা যায়। নতুন হিরো দরকারও।

নিলয় বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে জগদীশদা বলল—জানি, তুই কি বলবি। তোর চেহারাখানা, হিরোর মতো, বয়েস অল্প, অভিনয়ও হয়তো করতে পারিস। কিন্তু আশল মুশকিলটা করে দিয়েছে ওপরওলা। অরুণকুমারের সঙ্গে তোর চেহারার গিলটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা।

অবাক চোখে তাকাল নিলয়। যেটাকে সে তার সবচেয়ে বড় সুবিধা বলে মনে করেছে সেটাই জগদীশদার মতে সবচাইতে বড় অসুবিধা।

জগদীশদা হেসে বলল—আরে বোকা, ইনডাস্ট্রি ভালো হিরো পেলে নেবে। কিন্তু অরুণকুমারের মতো দেখতে কোনো অভিনেতার জায়গা হবে না। অরুণকুমারই আপত্তি করবে সকলের আগে। আর, জানিস তো, অরুণকুমারের চাওয়া না-চাওয়ার ওপর অস্ত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না। অরুণকুমার যে ছবিতে আছে সে ছবি ঘার খাবে না। তাকে পাবার জন্তে প্রোডিউসাররা মুখিয়ে আছে। সে কখনো

চাইবে না তার মতো দেখতে আরেকজন হিরো বাজারে আসুক। কারণ সে যদি শত্ৰুই অভিনয়ও করতে পারে তাহলে তার পুল কমে যেতে বাধ্য। তাই প্রথমেই সে বেঁকে বসবে। কোনো প্রোডিউসারও অরুণকুমারকে চট্টিয়ে তাকে চান্দ দেবার রিস্ক নেবে না। কারণ তুই যদি ইমপ্রেস করতে না পারিস তখন তার একুল-ওকুল ছুঁকুলই যাবে।

শুনে নিলয়ের আঁকেল গুডুম। যে চেহারার জগু তার মনে দেমাক ছিল-তার আসল নাম যে নামাশুই তা বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে জগদীশদা। মুখ কালো করে বসে ছিল সে।

—তুই যে একেবারে চূপসে গেলি। শোন, শোন, তোকে এমনি এমনি ডেকে এনে গাঁজাচ্ছি না। বলেছিলাম না আমার একটা আইডিয়া আছে? আজকাল ছবিতে শুধু প্রেমের প্যানপ্যানি থাকলে চলে না—সেক্স চাই, ভায়োলেন্স চাই। মারপিট না থাকলে সে ছবি নিরিমিষ—চলতে চায় না বাজারে। প্রেমের সিন, সেক্সের সিন—অরুণকুমারের জবাব নেই। কিন্তু লাকবাপ ঘোড়নোড় মারপিটের সিন হলেই অবস্থা কাহিল। ডামি দিয়ে শট সাজাতে ডাইরেকটরের বাপের নাম খগেন হয়ে যায়। চেহারা-মেলানো ডামি পাওয়া শক্ত, মেক-আপ দিয়ে আর কদ্দুর হয়। তাই ডামি দিয়ে করানো শটে অ্যান্জেল ঠিক করতেই ডাইরেকটর আর ক্যাথেরাম্যান নাজেহাল হয়ে যায়। তার ওপর ক্যামেরা দূরে রাখতে হয় বলে অনেক শট, তেমন জমেও না। বুঝিস তো আমার মতলবখানা? তুই যদি ঘোড়ায় চড়া, মোটরবাইক চালানো, ঘুঘোঘুঘির কায়দা, ক্যারাটে এইসব শিখে নিতে পারিস তাহলে অরুণকুমারের ডামির কাজ একচেটিয়া পাবি তুই। তৈরি যদি হতে পারিস, বাজারে তোকে চালু করে দেয়ার দায়িত্ব আমার।

—অতসব আমি শিখব কি করে?

—শেখা না কচু। আসল শেখা ঘোড়ায় চড়া আর মোটরবাইক চালানো। বক্সিং ক্যারাটে কি সত্যি সত্যি শিখতে হয় নাকি? শুধু কেতা চাল ঠাট, বাস্। চেষ্টা থাকলে তিন মাসে শিখে নিতে পারবি। খরচ পড়বে। তা, সে ব্যবস্থাও আমি কম-সমে করে দেব।

আর ঝিবা করেনি নিলয়। মাকে চুপি চুপি বলেছিল। মা ছেলের অক্ষমতার হুঁখ বুঝেন। গোপনে একখানা সোনার বালা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—‘এটা দিয়ে যা করবি কর। কিন্তু তুলেও কাউকে বলিস না বাবা...’

তারপর ট্রেনিং শেষ হতে জগদীশদার হাত ধরে রুপালী পর্দাব জগতে তার যাত্রা শুরু। সে যাত্রায় তার নিজস্ব অস্তিত্ব ছিল না, একজন উজ্জ্বল অস্তিত্বের মনুষ্যকে উজ্জ্বলতর করাই ছিল তার কাজ। বিনিময়ে মোটামুটি ভঙ্গভাবে বেঁচে থাকার রসদ মিলত। এমন কি, একটি মেয়েকে ভালোবেসে, তাকে বিয়ে করে ঘরসংসার করাও সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ সেই উজ্জ্বল অস্তিত্বের মাহুষটি...

জগদীশদার দরজায় নিজে থেকে আবিষ্কার করে স্মৃতি ও চিন্তায় ছেদ পড়ল নিলয়ের।

কড়া নাড়তে জগদীশদা নিজেই দরজা খুলে দিল।—আয়, আয়, বোস্।

নিলয় বসতে জগদীশদা বলল—দাঁড়া, তোর বৌদিকে চায়ের ছকুম দিয়ে আঁসি! বলে ভেতরে চলে গেল।

ক্ষিরে এসে চৌকিতে বসল আরাম করে কোলের ওপর পাশ-বাগিশ টেনে নিয়ে।

—আপনার বেকরনের সময় এসে বিরক্ত করছি না তো? নিলয়ের গলায় সংকোচ তার নিজের কানেও বেহুয়ো ঠেকল। জগদীশদার সঙ্গে তার সম্পর্ক এ ধরনের সাজানো ভঙ্গতার নয়।

—হুঁ, বুঝলাম। জগদীশদা হেসে বলল।

—কি বুঝলেন?

—বুঝলাম তুই ঘাবড়ে গেছিল।

—ঘাবড়ে যাবার কি হল? সহজ হবার মিথো চেষ্টা করে নিলয় বলল।

—কালকের ঘটনা নিয়ে তোর চিন্তা নেই বলছিল? নিলয়ের দিকে তাকিয়ে জগদীশদা মিটি মিটি হাসতে লাগল।

নিলয় অশ্রুদিকে তাকিয়ে চূপ করে রইল।

—যাকগে শোন, খানিক পরে জগদীশদা বলল, তোর আমার পক্ষে তো বটেই, এখানকার গোটা সিনেমা লাইনের পক্ষেই ঘটনাটা খুব সিরিয়াস। পনেরো-ষোলটা ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। মোট কুড়ি-একুশটা ছবির শ্যুটিং হচ্ছে, বেশির ভাগেরই হিবো অরুণকুমার। ব্যাপারখানা বুঝে দেখ একবার। তুইও সেই ভয়েই ছুটে এসেছিল—স্বীকার করিস চাই না করিস।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...। অসহায়ভাবে বলল নিলয়।

—ওহ,হো, হঠাৎ যেন জগদীশদা ব্যাশারটা ধরতে পারল, তুই বোধ হয় কালকেব পরে আর জানিস না। জানবিই বা কি করে। খবরটা খুব চেপে-চুপে রাখা হয়েছে। আমি কাল রাতে বাড়ি কিরেছি দুটোয়। প্রোডিউসারের গাড়িতে। অরুণকুমারকে কাল রাতেই ইমার্জেন্সি অপারেশন করতে হয়েছে নার্সিং হোমে।

—সে কি! বিশ্বয়ের সঙ্গে আতঙ্ক চাপা শব্দে বেরিয়ে এল নিলয়ের মুখ থেকে।

—সকালে বেরিয়ে টেলিফোন করেছিলাম নার্সিং হোমে। অবস্থা ভালো না। তিনদিন না যেতে ওরা ভালোমন্দ বলতে পারছে না।

—কি হয়েছিল ওরা বলেছে?

—ডাক্তারী ব্যাশার আমরা কি বুঝব। পেটে চোট লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু পেটের ভেতরের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ ছিল—ডাক্তারদের আলোচনা শুনে এটুকুই বুঝলাম।

—কানসার-ট্যানসার?

—তুই বড্ড বেশি ভাবছিল নিলয়।

একটুকু চুপ করে থেকে বলল নিলয়—হ্যাঁ জগদীশদা, সত্যিই ভয় করছে আমার। সিনেমা থাকলে আপনারা থাকবেন। কিন্তু অরুণকুমার না থাকলে আমি থাকব না। অরুণকুমার মরে গেলে সে হয়তো অনেকদিন মরেও বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমাকে..

—বোকার মতো করিস না নিলয়, জগদীশদা ধমক দিল, ডামি হওয়া ছাড়াও দুনিয়াতে অনেক কাজ আছে।

—আমাকে শাস্তনা দেবার জন্ত বলছেন জগদীশদা, আপনি নিজেও জানেন কাজ কত কম। জানেন বলেই আপনি আমাকে ডামি বানিয়েছিলেন। আমার করার মতো অল্প কাজ থাকলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ডামি হতে বলতেন না।

—তোরা মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। ওঃ দাঁড়া..। বলে জগদীশদা ভেতরের ঘরে চলে গেল।

থালায় ছুঁপেয়ালা চা আর ছুঁবাটি মুড়ি-মাখা নিয়ে ঘরে ঢুকল মণি বৌদি। চোকির ওপর নিলয়ের সামনে মুড়ি চা রেখে বলল—নাও, চা খাও।

মনের অবস্থা তারিয়ে তারিয়ে মণি বৌদির হাতের মুড়ি-মাখা খাওয়ার মতো নয়। কিন্তু আপত্তি করেও লাভ নেই। যেমন দেবা তেমনি দেবী। কাছের মানুষ না ভাবলে সামান্য মুড়ি-মাখা আর চা কেউ অতিথিকে ধরে দিতে পারে না। যেখানে দেয়া লৌকিকতা, আপত্তি করাও লৌকিকতা—এটা সে জায়গা নয়।

—বহন, এক মুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে নিলয় বলল, আপনার রান্নার তাড়া আছে নাকি ?

—আমাদের আবার তাড়া কি, চৌকির এক কোনায় বসে মণি বৌদি বলল, দু'জনের ভো রান্না। তার ওপর ওর যেমন কাজের বাধা সময় নেই আমারও তেমনি রান্নার নিয়ম-করা সময় নেই। বেশির ভাগ দিন রাতে ছাড়া বাড়িতে খায় কই। একার জন্তে রাখতেও ইচ্ছে করে না।

—তার মানে এক বেলা প্রায়ই উপোস ?

—উপোস দিতে যাব কোন্ হুখে। বেঁচে থাক আমার চা।

চায়ের মণি বৌদির অচলা ভক্তির খবর জগদীশদার মহলে সকলেরই জানা। জগদীশদাও কম যায় না।

—তা বলে শুধু চা খেয়ে দিন কাটানো... লিভারের বারোটো বাজবে।

—শুধু চা নয়, চায়ের যদি তোমার টান থাকে, তাহলে জলটাও খাবে বেশি করে, আর পান। একেবারে বাজে কথা, চায়ের লিভারের কোনো ক্ষতি হয় না। আমাদের দেখে বুঝ না। পক্ষাশ হল, কষ্টও কম করিনি জীবনে, লিভার খারাপ মনে হচ্ছে আমার ? কই গো, তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে...

—আসছি। বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এল জগদীশদা—হাতে এক টুকরো কাগজ আর খান কয়েক নোট।

জগদীশদা চায়ের লম্বা চুমুক দিয়ে বলল—মণি, আজ বাড়িতেই খাব। ডিমের ডালনা কর দিকি মারাত্মক করে, আর চালতার অম্বল। তিনদিন টানা ছুটি। অরুণকুমারকে নিয়ে কাজ ছিল। অরুণকুমার চিংপাত, শুটিং ক্যানসেল, আমারও ছুটি।

মণি বৌদি উঠতে উঠতে বলল—তুমিও দু'টি খেয়ে যাও না ভাই।

—না বৌদি, আজ থাক, নিনা ভাববে।

—কেন, নিনা জানে না তুমি এখানে আসবে ?

—জানে, কিন্তু গতকালের ব্যাপারের পর...

—আচ্ছা, থাক তাহলে, মণি বৌদি বলল, তুমি কিন্তু ভাই বড় বেশি ভাবছ...

—আপনি ভাবেন না বৌদি ?

—না ভাই, আমি ভাবি না।

—না ভেবে পারেন কি করে ?

—আমি বিশ্বাস রাখি, তাই ভাবনাচিন্তা আমার তেমন হয় না।

—আপনার বিশ্বাসের পাত্রটি কি ভগবান ?

—না, উনি। হেসে মণি বৌদি তাকালেন জগদীশদার দিকে।

—তার মানে ছ'জনের ভাবনা একজনের ওপর চাপিয়ে আপনি নিশ্চিত আছেন। কিন্তু জগদীশদাকে দেখেও মনে হয় না এত ভাবনার ভার ঔঁর ওপর চেপে আছে।

মুখ টিপে হেসে মণি বৌদি বলল—সে ভাই তুমি ঔঁর সঙ্গে বোঝ। আমি দেখি রান্নার কি করা যায়।

পেশালায় শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে নিলয় বলল—আচ্ছা জগদীশদা, ভাবনা তাড়ানোর উপায় কি ?

—হঁ, কঠিন প্রশ্ন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই বলতে পারি। বই পড়ে এসব জানা যায় কিনা জানি না, বইপড়া বিচ্ছেদ আমার খুব কম। ভাবনা মাহুষের থাকবেই। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে আস্থা থাকলে ভাবনার অন্তর্থে ভুগতে হয় না।

—আস্থা ? কার ওপর ? ভগবান ছাড়া আর কার ওপর এত আস্থা রাখা যায় ?

—ভগবানের সন্ধান আমার জানা নেই। আমার আস্থা নিজের ওপর, আর মাহুষের ওপর। জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের যে আস্থা বা রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সাধারণ মাহুষের যে আস্থা আমি কিন্তু সে আস্থার কথা বলছি না। ওটা নেহাতই ফয়দা তোলায় ভাষা। অমুককে ভোট দিলে আমার আশু ফয়দা, দাও গুকে ভোট। আমি ভোট চাইতে এসেছি, অতএব ভোটারদের প্রতি আমার যে কত আস্থা তা বলতেই হবে। ওসব নয়...

বলতে বলতে হঠাৎ যেন অগ্রমনস্ক হয়ে চুপ করে গেল জগদীশদা।

—তাহলে কি ? নিলয় প্রশ্ন করল।

—ঠিক বোঝাতে পারব না। অনেক মাহুষের আমি একজন, অনেক মাহুষের মধ্যে তাদের ভালোবাসার ভাগ দিয়ে নিয়ে আমি বেঁচে আছি...এ রকম একটা চিন্তা...বলে বোঝানো শক্ত...। যাকগে, পাঁচশো টাকা এখানে আছে। টাকা নিয়ে ভাউচারে কালকের ডেট দিয়ে সই করে দে।

অবাক হয়ে তাকাল নিলয়।

—কি হল ? দে, সই করে দে। তাড়া দিল জগদীশদা।

—দিচ্ছি। নিলয় টাকা পকেটে রেখে ভাউচারটা তুলে নিল।

—কাল প্রোডিউসারের চামচাটা আসেনি। আমি আছি সর্বঘণ্টে কাঁটালি কলা।

আমাকে দু'হাজার টাকা দিয়ে বলেছিল দরকারী পেমেন্টগুলো করে দিতে। তা-
 অরুণকুমার যা কাণ্ড বাধাল, পেমেন্ট দেয়া মাথায় উঠে গেল। আমি বেরুনোর
 সময় বৃদ্ধি করে খান কয়েক ভাউচার কর্ম নিয়ে এসেছিলাম। যে ক'জনকে পারি
 কালকের তারিখে সই করিয়ে টাকা দিয়ে দেব। এরপর ছবির হাল কি হবে কে
 জানে। টাকাপয়সা পেতে কালঘাম ছুটে যাবে লোকের। ইঁা, তোকে জিজ্ঞেস
 করলে বলবি টাকা কালই পেয়েছিলিস স্টুডিওতে। নইলে আমাকে বলবে পরে কেন
 দিতে গেলাম। শালাদের শুধু না দেবার ফিকির। অরুণকুমার স্বস্থ না হতে
 কাউকে পেমেন্ট পেতে হবে না।

—নি, সই-করা, ভাউচার জগদীশদার হাতে দিয়ে নিলয় বলল, কি বাঁচান যে
 বাঁচালেন জগদীশদা। আমি ভাবতেও পারিনি...

—ঠিক আছে। শোন, তুই ছ'শিয়্যার থাকিস, কারো কাছে অরুণকুমার দশকে
 মুখ খুলবি না।

—তা নিশ্চয়ই থাকব। কিন্তু গোলমাল ঠেকছে যে...বিশেষ করে যেন আমারই
 ছ'শিয়্যার থাকা দরকার।

—ইঁা, বিশেষ করে তোকেই বলছি।

—আমি আবার কি করলাম ?

—কিছুই করিননি। কিন্তু কিস্তী দুনিয়ার মতো কেছার জায়গা আর কোথাও
 নেই। শুধু ফালতু কেছা বানাবার ফিকির। কেউ কেউ শুধু কেছার কারবার করেই
 পেট চালাচ্ছে।

—আমার তাতে কি ? আপনি আঁচ পেয়েছেন কোনো ?

—না, তা পাইনি, চিন্তিতভাবে জগদীশদা বলল, কিন্তু বলা যায় না ভাই। তুই
 সিনে ছিলি অরুণকুমারের সঙ্গে। কত রকম গল্প ছড়াবে দেখবি বাজারে। তুইও
 বাদ যাবি বলে মনে হয় না।

—ভালোই, এতদিন কেউ আমাকে চিনত না। এখন তবু বিখ্যাত হওয়ার
 একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

—বিখ্যাত হওয়ার জালা অনেক। ওটা সকলের পোষায় না।

—জগদীশদা, আম্র উঠি তাহলে। আচ্ছা, আমি কি একবার নার্সিং হোমে
 গিয়ে অরুণকুমারকে দেখে আসব ?

—না, কক্ষনো না। আমি না বলতে ওমুখে হবি না। আদেশের স্বর জগদীশদার
গলায়।

নিলয় কোতুহল চেপে রাখল। এত আপত্তি কেন জগদীশদার? কারণ
নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা নিলয়ের ভালোর জন্তই। তাই প্রশ্ন না করাই বুদ্ধিমানের
কাজ।

—তাহলে চলি, বৌদিকে বলে দেবেন, না, না, এখন আর ডাকবেন না গুঁকে।
জগদীশদা ঘুরে দাঁড়াল।

—নিনাকে বলিস যাব একদিন চা খেতে।

—আপনি বলেন, যান খোড়ি...

—দেখিস, ঠিক যাবো শিগগিরই একদিন। বাবুসোনা কেমন আছে?

—ভালো।

—আচ্ছা, আসিস আবার। এখন আমাদের অটেল সময়।

—আপনার নয়, আমার। চলি—

৪

সাংবাদিক পরিভাষায় খবরের আরেক নাম গল্প—নিউজ—নিউজ-স্টোরি। খবর
কি করে গল্প হয় বা গল্প কি করে খবর হয় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার অবকাশ আছে।
পাঠকের মনস্তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা হয়ে পারে ঢের। মোক্ষা ব্যাপারটা এই, মানুষ
গল্প চায়, গল্প দিতে হবে তাকে—তার মনের খোরাক। তাই খবরের গুরুত্ব
ছোটখাট মামুলী খবরেই থাকে। খবর বড় বকমের হলে বা বড় মানুষকে নিয়ে
হলে তাতে গল্পের মশলা না দিলে কাগজের বাজার জমে না। খবরের কাগজের
খবরে খবর বেশি, গল্পের মিশেল কম। বিনোদন পত্র-পত্রিকায় একই খবরে খবরের
তুলনায় গল্পের গরম মশলা অনেক বেশি। একেই হয়তো হলুদ সাংবাদিকতা বলে।
তা হলুদ গোলাপী যে নামই দেয়া হোক না কেন, আসল বস্তু পয়সা, পয়সা এতেই
আসে।

অরুণকুমার নিঃসন্দেহে বড় মানুষ—সুপার-স্টার—আসমুদ্র-হিমাচলের স্বীকৃতিপত্র।
নায়িকার সঙ্গে তার নাচে গানে লক্ষ নায়িকার হৃদয় নাচে গায়, লক্ষ নায়কের হৃদয়
অভিসারে উদ্বেল। তার প্রাণখোলা হাসিতে বিবাদ হয় দেশান্তরী। অত্যায়ে

বিকল্পে তার অনিবার্ধ পরাক্রম আইকাস-মার্ক। তুমুল উচ্ছ্বাস আর হাততালিতে অভিনন্দিত। মুহূর্তের মাণেও এসব ছলভ বস্ত্র বে দিতে পারে মাহুযকে তার বড়ামাহুয স্ব জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে প্রমাণিত। অতএব প্রতিদিনই সংবাদপত্রের বিনোদন-পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন ছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে, চিত্রে, সচিত্র সংবাদ-গল্পে তার অঙ্গ উপস্থিতি। স্বাভাবিক। এহেন ব্যক্তি যখন কোনো অস্বাভাবিক বা বিশেষ ঘটনার কেন্দ্রে তখন সমস্ত সংবাদমাধ্যমগুলির অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠার মধ্যেও আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ নেই।

প্রতিদিন প্রতিটি প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অরুণকুমারের স্বাস্থ্য-বুলেটিন যথায়থ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতে লাগল। জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি নিতে কেউ রাজী নয়। অরুণকুমার এখন মাহুযের সংবাদ-আকাজ্জার শীর্ষে, অতএব যতদূর সম্ভব সে আকাজ্জা মেটাতে হবে।

অরুণকুমারের চিকিৎসকদের দৈনিক বুলেটিন ছাড়াও চিকিৎসা সম্পর্কে অগ্ন্যান্য নামী-দামী চিকিৎসকদের অভিমত ছাপা হতে লাগল। তাঁরা অবশ্য 'টাচি ইহা'তে খুব সতর্ক হয়েই মতামত দিলেন। একজন স্বভাব-রাগী চিকিৎসক শুধু পরিষ্কার বলে দিলেন—অরুণকুমারের চিকিৎসা নিয়ে তাঁর চিকিৎসকদের রেখে-ঢেকে কথা বলা তিনি পছন্দ করছেন না, তাঁর দাবি অবিলম্বে জনস্বার্থে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সেই কমিটির হাতে অরুণকুমারের চিকিৎসার ভার দেয়া হোক। তাঁকে কমিটিতে নেয়া হলে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী আছেন বলেও জানিয়ে দিলেন।

একটি সংবাদপত্র স্থপ-নিউজ ছাড়ল নিউইয়র্ক থেকে হু'জন বিশ্বখ্যাত চিকিৎসককে আনানোর বাবস্থা হয়েছে। এ বাবদে সমস্ত ব্যয় বহন করতে এগিয়ে এসেছে মহাশুষ্ক হু'জ্ঞাণ সংস্থা। অরুণকুমার এই সংস্থার অঙ্গতম পৃষ্ঠপোষক। প্রয়োজনীয় করেন-এক্সচেঞ্জের জ্ঞান অনুমোদনও চাওয়া মাত্রই পাওয়া গেছে বলেও জানা গেল।

বেতার ও দূরদর্শনে নিয়মিত অরুণকুমারের শারীরিক অবস্থার খবর পরিবেশিত হতে লাগল—অবশ্য যথেষ্ট পরিমিত বজায় রেখে। কারণ বেতার-দূরদর্শনকে পত্র-পত্রিকার মতো পাঠক ধরার প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না।

বিনোদন পত্র-পত্রিকাগুলির প্রচ্ছদে পাতায় পাতায় শুধু অরুণকুমার।

ফিল্মী ছনিয়ার রসালো খবরগুলো সংক্ষিপ্ত গুরুত্বহীন হয়ে আনাচে-কানাচে ঠাই পেল। 'প্রকাশ কি স্মৃতিকে ছেড়ে বিজ্ঞানকেই বিয়ে করবে', 'আমার সৌন্দর্য বজায়

রাখতে পুরুষমানুষের প্রয়োজন—স্বলেখার দুঃসাহসিক স্বীকারোক্তি’, ‘বিলিকে নিয়ে রাজ আর স্বরেশে একহাত হয়ে গেল’, ‘গোপনে কর্মেজ-প্রেমার অভিসার’ জাতীয় চিন্তাকর্ষক খবরের আর বিশেষ গুরুত্ব রইল না। ক’দিন আগেও এইসব পত্র-পত্রিকার অচুরাগী বসিক পাঠকেরা খররগুলির জন্ত হা-পিতোশ হয়ে বসে থাকত।

এখন এক এবং অধিতীয় আকর্ষণ অরুণকুমার। প্রচ্ছদে অরুণকুমার, সংবাদে অরুণকুমার, সংবাদ-গল্পে অরুণকুমার। পাঠকের চাহিদা মেটাতে প্রতিটি বিনোদন পত্রিকার নব্বই শতাংশ জায়গা জুড়ে শুধু অরুণকুমার। কিন্তু এতখানি জায়গা শুধু অরুণকুমারের শারীরিক অবস্থা, নানান জন্মনা-কল্পনা, বিশেষজ্ঞদের অভিমত ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করা অসম্ভব। করলেও তাতে আসবে একঘেয়েমি, অথচ অরুণকুমার ছাড়া খবরের অল্প শিরোনাম এ মুহূর্তে অচল। তাই ধুরন্ধর সম্পাদকদের মাথা থেকে বেরুল অজস্র কিচারের পরিকল্পনা। ‘পরিচালকের চোখে অরুণকুমার’, ‘অরুণকুমারের নায়িকার’, ‘টেকনিসিয়ানদের আপনজন অরুণকুমার’, ‘রূপালী পর্দার বাইরে অরুণকুমার’, একজন সম্পাদক ‘জনগণের অরুণকুমার’ নামে একটি কিচার চালু করে দেখাতে চাইলেন অরুণকুমার রূপালী পর্দায় জনচিত্ত জয় করেই থেমে থাকেনি, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও আছে তার নাড়ির টান। বিনোদন পত্র-পত্রিকার বাঞ্ছা কৈ দারুণ বাণিজ্যের জোয়ার।

অরুণকুমারের অপূর্ব উজ্জ্বল নানা ছবির আলবাম বেরিয়ে গেল। ক্যামেরা বেকুল তার নির্বাচিত সংলাপের সংকলন। অরুণকুমারের সাময়িক অকর্মণ্যতা এনে দিল অনেকের বিরাট কর্মবাস্ততার ডেউ।

বিনোদন-বার্তার সম্পাদক প্রকাশ চৌধুরীর মেজাজ বেজায় গরম। ঘণ্টা খানেক আগেই মালিক স্বদেব সরকার টেলিফোনে তাকে একহাত নিয়েছে। অকারণে নয়, উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে লতাই।

বিনোদন-বার্তার বিক্রি এককাল ছিল সবার ওপরে। ‘ও স্টার, মাই স্টার’ বিস্তর কায়দাকাহ্নন করেও বিনোদন-বার্তার চেয়ে পঁচিশ হাজার নিচেই থেকেছে। সে-ই কিনা এই মগকায় টপকে গেল দশ হাজারে। বিনোদন-বার্তারও বিক্রি বেড়েছে আট হাজার। ‘ও স্টার, মাই স্টার’ বাড়িয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার। ভাবা যায়!

এরপরে মালিক থিক্তি করবে না তো কি পুজো করবে! ‘ও স্টার, মাই স্টারের’

অফিসে প্রকাশের চর আছে। সে মাঝে মাঝে মন্ত ও একটি আত্মবিশ্বাসের বদলে প্রকাশকে ভেতরের খবর দিয়ে যায়। প্রকাশ মালিকের কাছে সূত্রটি গোপনই রেখেছিল। তার 'ব্যবসায়িক দূর্বদৃষ্টি'র ভেতরের রহস্যটি ফাঁস করার মতো বোকা সে নয়। সেই চর যখন তাকে 'ও স্টার, মাই স্টার'র বিক্রির লাফ মারার খবর এনে দিল তখন প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও সে বেমানুম ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। এ কি লোকের কাছে বলে বেড়ানোর বিষয় ?

কিন্তু হৃদেব সরকার যে কত বড় ঘোড়েল তার প্রমাণ সে কিছুক্ষণ আগেই দিয়েছে টেলিফোনে। দেখা যাচ্ছে প্রকাশের চাইতে তার গোপন সূত্রও কম জোরদার নয়।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অবিশ্রান্ত সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তুরূপ সেন আর জ্যাকি খাষাটার জন্ত অপেক্ষা করছিল প্রকাশ। এদের দু'জনের ওপরই দায়িত্ব ছিল অরুণকুমারকে কভার করার।

বিনোদন-বার্তার এক নম্বর সাংবাদিক তুরূপ সেন। বাঘা সাংবাদিক। ম্যাঙ্গিন্সিয়ানের মতো শূণ্ণ হাত ঘোরালেই খবর। তার কলমে আছে জাহু। হুঁচারটে শব্দ এখানে-ওখানে কেটে-ছেঁটে জুড়ে দিয়ে যা-চাই-তাই বানাতে তার জুড়ি মেলা ভার। আর খাষাটাকে সবাই আদর করে ডাকে বোম্বটে খাষাটা। ছোটখাট চূপচাপ মানুষ। মিটিমিটি হাসে আর যত্ন করে ছাঁটা কাঁচাশাকা ফ্রেঞ্চ-কাটে হাত বুলোয়। কিন্তু তার গলায় সর্বক্ষণ ঝোলানো ক্যামেরাটি বড় মারাম্বক। গুটা দিয়ে খাষাটা যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে তা ভাবা যায় না। সাদামাটা ছবিতেও সে নিয়ে আসতে পারে স্টাণ্ট। মানুষের দুর্বলতার মুহূর্তগুলো যেন ভগবানের মতোই ব্যাটার জানা। ঠিক মুহূর্তে ঠিক অ্যাঙ্গেল থেকে শাটার টিপে ধরে রাখে। ক্যামেরা-দস্যু!

বিনোদন-বার্তার এহেন দুই খুঁটির ওপরও মনে মনে গজরাচ্ছিল প্রকাশ চৌধুরী। শালা কাণ্ডজে বাঘ সব। চ্যালেঞ্জিং জব পড়লে এলেম বোঝা যায়। শেষ হয়ে আসা সিগারেট ঠোঁটে চেপে রেখে আবেকটা ধরানোর জন্ত প্যাকেট খুলল প্রকাশ। প্যাকেট খালি।—ধেস্তেরি।

সিগারেট আনানোর জন্ত কলিংবেল টিপতে যাবে এমন সময় ঢুকল তুরূপ আর খাষাটা।

বোতাম টেশা হল না প্রকাশের, হাত সরিয়ে নিয়ে কটমট করে তাকাল দু'জনের দিকে।

তুরূপের আনমনা ভঙ্গি বা খাষাটার মুখটেপা হালির ওপর এতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হল না।

দু'জনে বসল চেয়ারে। তুরূপ আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। খাষাটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিজে ধরাবার আগে প্রকাশকে অফার করল।

—থাক। প্রকাশের স্বর রীতিমতো রুক্ষ।

—থচে আছ মনে হচ্ছে। প্রকাশের দিকে বাড়ানো প্যাকেট থেকে তুরূপ একটা সিগারেট তুলে নিল।

—না, থচে থাকবে না, প্রেমের সাগরে ভাসবে। আমার কপালে জুটেছে ষত শালা পন্নমাল। ধাধ-ধেবে খবর, ডালভাত-মার্কী ছবি। লোকে কেনে ?

—কেয়া, সেল পড়ে গেল ? খাষাটা সেমি-সার্কেল গৌক আর ব্রেক-কাটের ফাঁক দিয়ে টুক করে বলল।

খেকিয়ে উঠল প্রকাশ—না, পড়ে যাবে না, উঠবে। কি মাল ছাড়ছ তোমরা জান না ?

নাকমুখ দিয়ে বগবগ করে ধোঁয়া ছেড়ে তুরূপ বলল—ভাল্লাগে না মাইরি। সোজাসুজি পয়েন্টে চলে এসো দাদা, ঘুরিয়ে নাক দেখাতে হয় সে শালা কাগজের পাতায়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা হবে সিধে, সাক্ষরক।

প্রকাশের সঙ্গে তুরূপের অনেকদিনের বন্ধুত্ব। তাছাড়া তুরূপ নিজের এলেম সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন। তুরূপ-খাষাটা জুটিকে লুফে নেবার জন্তে বহু কাগজ হাত বাড়িয়ে আছে। প্রকাশও জানে নিউজ-স্টোরি তৈরি করতে এই দু'জনের মতো পাখোয়াজ লাইনে আর নেই। অমনি অমনি স্বদেশ সরকার মাসে মাসে আড়াই হাজার করে ঢালছে না দু'জনের পেছনে। উপরি বায়নাক্সাও কম না। ওরাই বিনোদন-বার্তার আসল মূলধন।

মিনিট খানেক গুম হয়ে বসে থেকে প্রকাশ বলল—দে, সিগারেট দে।

খাষাটা প্যাকেট এগিয়ে ধরল।

—এবার বল দিকি কি ব্যাপার। তুরূপ বলল।

—ব্যাপার আবার কি। ‘ও স্টার, মাই স্টার’ সেল পক্ষাশ হাজার বাড়িয়ে ফেলেছে। আমরা ওদের পেছনে চলে গেছি।

—তাতে কি ঘোড়ার কচু হয়েছে, তুরূপ আমলই দিল না, দেখ প্রকাশনা—তিনটির একটা হবে। অরুণকুমার ফুটে যেতে পারে, অল্পদিন ভুগে স্বস্থ হয়ে উঠতে

পারবে, বেশ কিছুদিন চিৎপাত হয়ে থাকিও সম্ভব। যে হাওরায় স্টার সেল বাড়িয়েছে সেটা কদিন থাকবে বল তো? অরুণকুমার ফুটে বাওয়া বা স্নহ হয়ে ওঠা পর্যন্ত। বেশিদিন পড়ে থাকলেও হাওরা হাওরা হয়ে যাবে। তখন শালারা কি করবে? কিন্তু এখনো আমরা আছি, তখনো থাকব।

—হৃদেব সরকারকে কে বোঝায় বল। কি খিস্তি করল আমাকে টেলিফোনে!

—বুঝতে না চায় বসে বসে নিজেয় যা-ইছে ছিঁড়তে বল।

—তুই তো ওকে জানিস তুরূপ, 'ও স্টার, মাই স্টার' নতুন কিছু করলেই ওয় মাথা গরম হয়ে যায়।

—আমরা বেস্ট কভারেজ দিয়েছি—কি স্টোরি, কি ছবি। স্টার শুধু অরুণকুমার-স্বলক্ষণার সম্পর্ক নিয়ে স্ক্যাণ্ডাল ছেপে ফয়দা তুলেছে—টেম্পোরারি ফয়দা। ওটা কি একটা স্টোরি হয়েছে? আসল জিনিস সেক্স-অ্যাঙ্কেলটাই জমাটি করে আনতে পারেনি। তার ওপর ধান ভানতে শিবের গীত—যেসব জিনিস এ ধরনের স্টোরিতে ছুঁতে নেই—মর্যাল বা লিগ্যাল সাইড—তা নিয়েও শালারা ভানতারা করেছে। সেক্স ছড়াও, রিডার খুশি পড়ে, আর্টিস্ট খুশি তার সেক্সবন্ড বা হি-ম্যান ইমেজ বাড়ছে দেখে। হিউমান অ্যাঙ্কেল পর্যন্ত ওরা খুশিমনে নেবে। কিন্তু মর্যাল লিগ্যাল ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করলে ওরা বরদাস্ত করবে না। তুমি কি ভাবছ এই ব্যাপারের পর স্টার কখনো অরুণকুমার-স্বলক্ষণার কো-অপারেশন পাবে?

নাক দিয়ে অল্প অল্প ঘোঁরা ছাড়তে ছাড়তে শুমছিল প্রকাশ। মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে এতক্ষণে।

—আরে বাব, আমি না হয় বুঝলাম। তুই কি ভেবেছিস আমি এসব বুঝিনা, না ওকে বলিনি?

—তবু? খাওয়াটা প্রব্ব রাখল।

—ও যা বলছে সেটাও একেবারে কেলে দেবার মতো নয়। স্বলক্ষণা 'অটেল ব্লক'র সম্পাদককে বলেছে অরুণকুমার স্নহ হয়ে উঠলে ওরা 'ও স্টার, মাই স্টার'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবে, অন্তত দশ লাখ টাকার ডামেজ স্টাট। 'অটেল ব্লক' সেটা আবার নিউজ করে দিয়েছে। ঘোঁট কন্দু'র গড়াচ্ছে বুঝছিস?

—তবে তো হয়েছে গেল, স্টারের বারোটা এমনিই বেজে যাবে। তুরূপ ভুড়ি দিয়ে লিগারেটের ছাই ছড়িয়ে দিল।

—বড় সোজা, না? প্রকাশ তুরূ কুঁচকে চোখ ছোট করে তাকাল, দেখ, তুরূপ-

তুই আমাকে আণ্ডার-এস্টিমেট করিস, আমি স্বদেশ সরকারকে আণ্ডার-এস্টিমেট করি। তাতে সরল সত্যটা পালটে যাচ্ছে না। আমাদের মধ্যে তফাত আছেই। তুই ভালো নিউজম্যান, কিন্তু এডিটর হওয়ার ক্ষমতা তোর নেই। আবার স্বদেশ সরকার নিউজম্যানও নয়, এডিটরও নয়, কিন্তু বাবসা আমাদের চোক্ষ পুরুষকে কান ধরে শেখাতে পারে। আচ্ছা, তুই ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবি অরুণকুমার-স্বলক্ষণার ক্ষমতা নেই স্টারের বিরুদ্ধে মামলা করবার। একই ফ্ল্যাটে ওরা থাকে, বাট দে আর নট ম্যারেড, কোনো হিঁহু এক বোঁ থাকতে আরেকটা বিয়ে করতে পারে না. অত-এব...

—অতএব তোমার মাথা। ওরা কোর্টে দাঁড়িয়ে হালফ করে বলবে এক বাড়িতে থাকলেই যে বাড়িচারের সম্পর্ক হবে তার কোনো মানে নেই। দে লিভ লাইক ফ্রেন্ডস্। এবার ?

—এবার ? অসীম তৃপ্তির হাসি মুখে ছড়িয়ে দিল প্রকাশ, এবার তোর মাথা। এ পর্যন্ত অন্তত কয়েকশো বার পত্রিকার সঙ্গে ইন্টারভিউতে স্বলক্ষণ অরুণকুমারকে উল্লেখ করেছে আমার স্বামী বলে। কই, ছাপানো ইন্টারভিউর কোনো প্রতিবাদ তো ওরা করেনি। কি দাঁড়াল তাহলে, চমৎকার একখানা কেছা তৈরি হল। স্টার ফয়দা তুলে চলবে বেশ কিছুদিন, 'অটেল রক'র মতো ছুটকোগুলোও আশপাশ থেকে মধু খাবে। আমরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাব। আমাদের প্রেস্টিজ আছে. স্টারের তৈরি ইন্ডা থেকে আমরা ফয়দা গঠাতে পারি না।

তুরুপের মুখ থেকে আনমনা নিজের-মধ্যে-ডুবে-থাকা ভাবটা সরে গেল, মুখ লাল করে সে বলল—হোকগে যা খুশি। প্রফেশনাল এটিকেট আমি বিসজ্ঞ দিতে পারব না। প্রফেশনাল এথিক্স তুমি মান কি মান না ?

—বাতেলা ছাড়, তুরুপ, এটিকেট-এথিক্সের ওকম আমরা বহুকাল করে দিয়েছি। এনটারটেনমেন্ট জার্নালের কথা ছেড়েই দে, খবরের কাগজে কি হচ্ছে আনকাল ? একটা নিউজ অনেস্টলি প্রেসড হয় ? যেভাবে ছাপলে, ডিসটর্ট করলে কাগজের আখের তৈরি হবে, সেইভাবেই ছাপে। আমরা তো—। তার প্রিয় একটা অশ্রাব্য বিশেষণ নিজেদের সম্পর্কে প্রয়োগ করে প্রকাশ থামল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ তিনজনই। অস্বস্তিকর অবস্থা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া।

প্রকাশ তুরুপের মন পড়তে জানে। তুরুপের সামনে সে ঠিক চ্যালেঞ্জটি ছুঁড়ে দিয়েছে। ও বুঝতে পারে তুরুপের নাছোড়বান্দা মনটা এখন রাস্তা খুঁজছে। এক

নবম্বের আয়গা থেকে হবে গিয়ে সরে যেতে সে নারাজ। ওর সাংবাদিক মগজে আইডিয়ায় তোলপাড় চলছে। প্রকাশ ওকে সময় দেবার জন্য চূপ করেই রইল।

—ঠিক আছে। খানিক পরে আলতো করে বলল তুরূপ।

—এনি আইডিয়া? প্রকাশের মুখ চকচক করে উঠল।

—আলবৎ আইডিয়া, তুরূপ সেনের পা ছুটো নাচতে লাগল, তুরূপের তাস শেষ পর্যন্ত তুরূপ সেনের হাতেই থাকে। তুমি একটি নম্বরী মাল প্রকাশনা, ঠিক জান কি করে স্বরূপে আমার ভ্যানিটিকে যা দিতে হয়।

—কি যে বলিল তুরূপ।

—ন্যাকামো রাখ।

—মডলবটা বলবি?

—তুমি অর্ডার করলে বলতে আমি বাধ্য।

—ছি, ছি!

—স্যাটিংয়ের সময় অরুণকুমারের চোটি লাগার ঘটনাটা খতিয়ে দেখতে গিয়ে আইডিয়াটা প্রথমেই আমার মাথায় এসেছিল। একটা হতভাগা লোকের ক্ষতি হয়ে যাবে ভেবে আমি ওদিকটা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন স্বদেশ সরকার আর তুমি মিলে যা আরম্ভ করেছ তাতে ওটা দিয়েই আমাকে বাজার কাটাতে হবে। কার কি ক্ষতি হল না হল...ঠিক আছে...আজ এই পর্যন্ত। আগে কয়েকটা এনকোয়ারি করে নিয়ে তারপর একটা ইন্টারভিউ নেব। তারপর পাবে তোমার মাল। ডিটেলস জানা কি এক্ষুনি দরকার?

—মোর্টেই না, মোর্টেই না। তোকে আমি সেন্ট পায়লেন্ট বিশ্বাস করি। আমাকে স্যারপ্লাইজ দেয়ার প্রেমার থেকে তোকে বঞ্চিত করার মতো নিরেট আমি নই।

—ও কে। কিছু খরচাপাতি লাগতে পারে। তুরূপ বলল।

—সে তুই যা বলবি। প্রকাশ গদগদ।

—ঠিক আছে। চল্ খাওয়াটা। তুরূপ উঠে দাঁড়াল।

৫

বিলয় বেকনোর জন্য তৈরি হচ্ছিল। নিনাকে বলে রেখেছিল স্টুডিওতে যাবে।

খেয়ে-দেয়ে জামা-প্যাণ্ট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিকঠাক করে বসেছিল। অরুণকুমারের মতো করেই ছাঁটা চুল। গৌরুটাও একই রকম। এভাবে

চুল-গৌক রাখা নিলয়ের পছন্দ নয়। মেক-আপের হুবিধার জগত রাখতে হয়েছে। পরিচালকদের নির্দেশ। নির্দেশ মেনে কর্তব্যাক্তিদের খুশি রেখে তাকে চলতে হয়। সে অরুণকুমারের মতো বড় আর্টিস্ট নয়—আর্টিস্টই নয়। চিরকনিটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল নিলয়।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে পার্স বের করল। তিনখানা ছুঁটাকার নোট, এক টাকার মতো খুচরো। পথে-ঘাটে এত কম পয়সা নিয়ে বেরনো ঠিক নয় আজকাল, কখন কোথায় আটকে পড়তে হবে বলা যায় না। নিনাকে ডেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিলে হয়। নিনার ভাঁড়ারের অবস্থা ভেবে চাইতে পারল না। জগদীশদার কাছ থেকে সেই পাঁচশো টাকা নেবার পর পনেরো দিন কেটে গেছে, একটা পয়সাও রোজগার হয়নি তারপর। অরুণকুমার পড়ে না থাকলে এর মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছটা গ্যাটিং ডেট নিলয়ের থাকত। মানুষ নানাভাবে মানুষের অধীন। কিন্তু এমন আশ্চর্য অধীনতা আর কারো আছে কি ?

পনেরো দিন বসে থাকতে থাকতে আর খবরের কাগজে অরুণকুমারের খবর পড়তে পড়তে নিলয় ক্লান্ত। আজ যে সে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্টুডিও পাড়ায় যাচ্ছে, তা নয়। কাজ পাবার আশায় তো নয়ই। অরুণকুমার ফ্লোরে না আসতে তাঁর আবার কাজ কি ? সাধারণ কাইটিং সিনে তাকে কেউ নিতে চায় না। অরুণকুমারের ডায়িকি সামনে না আনার একটা অলিখিত চুক্তি পরিচালকদের মধ্যে আছে। কেউ তাকে নিলেও অরুণকুমারের সঙ্গে তার মিলটাকে অ-মিল করার জগত মেক-আপে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কাইটিং সিনের একজন এন্সট্রার জগত এত পরিশ্রম আর ঝামেলা পোয়ানোর কোনো যুক্তি নেই।

পার্সটা পকেটে রেখে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিলয় অক্ষুট শব্দ করল—হুঁ।

—স্টুডিওতে যাচ্ছ কেন ? গ্যাটিং আছে নাকি ? নিনা জিজ্ঞেস করল।

—নাঃ, মহাপ্রভু হুঁহু না হতে ..ও, আজ দশ তারিখ থেয়াল আছে ?

—কি বল তো ?

—বাঃ, মাসের প্রথম হস্তায় তুমি বাবা-মা'র কাছে যাও না ?

নিনা নিরুত্তরে আঁচল দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়না পরিষ্কার করতে লাগল।

—কি ? নিনার উত্তর না পেয়ে নিলয় বলল। কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে নিনাকে বুকের কাছে টেনে আনল নিলয়।

—এই, কি হচ্ছে ! বিষন্নতা ছাপিয়ে নিনার চোখে ঝঁক হাসি।

—হবে আবার কি। কথার উত্তর দিচ্ছিলে না কেন? নিনাকে টেনে নিয়ে গাটের কিনাৰে বল নিলয়।

—কই, বল।

—কি বলব বল।

—রাবা-মা'র কাছে যাওনি কেন?

নিলয়ের বৃকে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে নিনা বলল—তুমি জান ওদের অবস্থা। তোমার দেয়া একশো টাকার দান ওদের কাছে অনেক। খালি হাতে যাই কি করে বল?

—কে বলেছে তোমাকে খালি হাতে যেতে?

—পাঁচশো টাকার শ'দেড়েক হাতে আছে। ব্যাংকে আছে বেশি হলে চারশোর মতো। এ মাসে তুমি কি আর পেমেণ্ট পাবে?

—না-ই যদি পাই আমরা কি মরে যাব? তুমি কি ভাবছ অরুণকুমার যদি আর না ফেরে তাহলে আমাদেরও এখানেই শেষ? তা-ই যদি হয়, তোমার বুড়ো বাবা-মাকে একশো টাকা না দিলেই আমাদের সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে? তুমি হয়তো ভবেছে টাকা দিলে আমি রাগ করব।

—ছি, ছি—

—তবে আর বাজে চিন্তা নয়। টাকাটা আজই দিয়ে এসো।

এই মুহূর্তে নিনার মুপের আশ্চর্য নীরব ভাষা এমন করে বৃকের ভেতরে ঢেউ তুলল নিলয়ের যে সে হ'হাতে নিনাকে একেবারে বৃকের সঙ্গে মিশিয়ে নিল।

পায়ের বাবুসোনার কচি হাতের চড়-চাপড়ে ছ'শ ফিরল নিলয়ের। মাকে আদর করার অধিকার একমাত্র তারই, সেখানে বাবার অনধিকার প্রবেশ সহ করতে বাবুসোনা নারাজ।

—ওরে ছুই, নিনাকে সরিয়ে বাবুসোনাকে কোলে তুলে নিল নিলয়, মা শুধু তোর একলা, নারে ব্যাটা!

বাবুসোনাকে খানিক আদর করে, নিনাকে আবার বাবা-মা'র কাছে যাবার জন্ত বলে নিলয় বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

ঘরের কাজ করতে করতে কেবলই অশ্রমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল নিনা।...

দুঃখকষ্ট অভাবে নিনা অভ্যস্ত জন্ম থেকেই। নিনা নয় স্বয়মা—স্বয়ো। নিনায় রূপান্তর পবে।

দেশভাগের পর বাবা-মাকে এক বস্ত্রে এপার বাংলায় চলে আসতে হয়েছিল। সঙ্গে ছোট ছোট দুই ছেলে। স্বরোর জন্ম এখানে।

বাবা সোজা সরল নিরীহ মানুষ। অনেকের সঙ্গে দলে পড়ে একটাই সাহসের কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। খাসজমি জবরদখলের অভিযানে তিনিও এক টুকরো জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে সেখানে মুলিবাঁশের বেড়ার ছ'খানা ঘর তুলেছিলেন। নইলে আজ ওরা কে কোথায় ভেসে যেত কে জানে। কিন্তু কলোনির আরো অনেকের মতো বাবার কৃতিত্বও ঐ পর্যন্তই। দেশে ছিলেন ম্যাট্রিক-পাস ইস্কুল মাস্টার। নিচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতে। এখানে তার দাম কি? মনে শিক্ষিত মানুষের অহংকার, অথচ শিক্ষাটা এমন নয় যে তা দিয়ে এখানে ইস্কুল মাস্টারি দ্বন্দ্বস্থান, মুক্কাবী ছাড়া ছোটখাট একটা চাকরিও পাওয়া যেতে পারে।

ষাদের মুক্কাবী ছিল তারা কেউ কেউ কাজকর্ম জুটিয়ে নিল। ষাদের জুটল না বাচার তাগিদে কালো-সাদা ছ'রকম পথেই পা বাড়াল তারা। ইজ্জতের র্ত্নকো ধারণাগুলো পেটের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরই মধ্যে বহু নকল উদ্বাস্তও আখের তৈরির আশায় এসে বাসা বাঁধল কলোনিতে। বাবা এই নতুন পরিবেশে, বিরাট ভাঙচুরের মধ্যে মানুষের নতুন করে গড়ে-তোলার সং-অসং অদ্ভুত প্রয়াস, পুরনো ধান-ধারণার শিকড় উপড়ে মুখ খুঁড়ে পড়া কি রকম যেন ভাষাচালাকা খাওয়া চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন, আজও দেখেন। কিন্তু পাঁচটা মানুষের পেটে দানাপানি দেবার দায়িত্বও তাঁরই, তাই শুধু তাকিয়ে থাকলেই চলবে না, তাঁকেও বেরতে হত সং উল্লেখ্যবৃত্তিতে, এখনো হয়।

অদ্ভুত ভালোমানুষ বাবার চোখের অসহায় মার-খাওয়া দৃষ্টি অনুভব করবার মতো বয়েস হওয়ার সময় থেকেই স্বরো বাবার জন্ম হুঃখবোধ থেকে তাঁর সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করত। সময়ে বুঝেছিল। বুঝেছিল মাটি থেকে ওপড়ানো গাছের স্বপ্ন। বাবার সংস্কারগুলোকে স্বরো মানতে পারত না, কিন্তু হারিয়ে-যাওয়া মূল্যবোধগুলোর জন্ম তাঁর নিঃসন্দেহ হাহাকার স্বরো বুঝতে শিখেছিল, কারণ স্বাভাবিকভাবেই এগুলো তার মধ্যেও ছিল। শুধু বাবার মতো গোড়ামিগুলো ছিল না। সাধু হতে গেলে গেরুয়া পরতে হবে এমন চিন্তায় স্বরোর মনের সায় ছিল না। সং-অসং মানুষের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। অস্ত্রের বিচারে সত্য বড়ই কম। একেবারে নিরপেক্ষ শুদ্ধ মন নিয়ে ক'জন পারে মানুষের বিচার করতে? ইস্কুল-কলেজে না পড়েও স্বরো এভাবে ভাবতে পারত অল্প বয়সেই। লেখাপড়া তার সামান্য, বাড়িতে, বাবার কাছে।

দাদাদেরও লেখাপড়া হল না, হওয়া সম্ভব ছিল না। সাবালক হতেই এমন সব সঙ্গী জুটেছিল ওদের যারা বাঁকা পথে জীবনটাকে সরল করার চেষ্টা করত। বাবা অসহায় নীরব দর্শক। মায়ের কান্না, ঠাকুরের কাছে মাথা কোটা ছুঁখের সাময়িক শান্তি, তাতে অভাব ঘোচে না, সম্ভানের বিপথে যাওয়া ঠেকানো যায় না।

বড় ছুই ভাইয়ের মতিপতি, সংসারের চূড়ান্ত দুর্দশা স্বরোকে ভাবাত। সংসারের হাল ফেরানোর জগ্ন ওর সর্বক্ষণ চিন্তা, কিন্তু সব চিন্তাই নিজের অযোগ্যতার পাহাড়ের সামনে থমকে দাঁড়াত একসময়। অক্ষমতার অস্থিরতা লুকিয়ে রাখার জগ্ন ও নিজেকে অকারণে ব্যস্ত রাখত সর্বদা। সে যে কি জ্বালা!

এ সময় হঠাৎ একদিন পাশের বাড়ির বাসি খবরের কাগজে চোখে পড়ল একটা বিজ্ঞাপন—সিনেমায় অভিনয়ের জগ্ন নতুন মুখ চাই। কাগজের পাতাটা চেয়ে নিয়ে এল। মনে স্বপ্ন প্রচুর, ভয়ের অবধি নেই। সম্পূর্ণ অচেনা জগতে একেবারে একা হানা দেয়ার কি যোগ্যতা আছে তার? একটাই মাত্র যোগ্যতার ভরসা শেষ পর্যন্ত মনকে দিতে পেরেছিল। লোকে তার চেহারার প্রশংসা করে, মায়ের বন্ধুরা বলে গড়ন ভালো, মুখে লক্ষ্মীশ্রী আছে। ফিগারের অশালীন প্রশস্তিও পাথে-ঘাটে যেতে-আসতে শুনতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চেহারার ভরসাতেই মরিয়া স্বরো গিয়ে হাজির হয়েছিল বিজ্ঞাপনদাতার অফিসে।

বাড়িতে অবশ্য প্রথমে গোপন রেখেছিল। আপত্তি আসবেই সে জানত। স্বযোগ পেলে আপত্তি-নিন্দার পরোয়া সে করবে না তাও ঠিক করে রেখেছিল। সমাজ-সংসার তাদের বিশ্বর দিয়েছে, অতএব সমাজ-সংসারের কাছে কৈকিন্মত দেবার দায়ও তাদের নেই। স্বরোর দায় শুধু নিজের কাছে, লেখানে সে ঠিক ছিল।

ভিড়ে ভিড়। নানান বয়সের নানান ধাঁচের মানুষ—ছেলে মেয়ে বৃড়ো। মানুষের সংখ্যাই স্বরোকে হতাশ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর চলন-বলন-কান্নাদায় এমন অনেক চটপটে ছেলেমেয়ে ছিল ওখানে যে ওদের তুলনায় নিজেকে নিতান্তই আটপোরে মনে হওয়ায় ফিরে আসার তাগিদটাই জোর হয়ে উঠছিল মনে। তবু শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল।

কি জানি কেন, যে ভত্রলোক ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি ওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, আবার আসতে বলেছিলেন। স্বরো ভ্রেনেছিল ভত্রলোকের নাম—মহুজের সেন—বিখ্যাত পরিচালক। নতুন মুখ নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। সেই ছবিতে স্বরো অপ্রত্যাশিত কাজও পেয়েছিল—গ্রামের মেয়ের দু'লাইনের পাঠ!

দারুণ উৎসাহ আশা। কিন্তু নিভে যেতেও সময় লাগেনি। ক্যামেরায় চোখ ওকে তেমন স্থল্লর দেখেনি। উচ্চারণে পূব বাংলার সামান্য টান—জয়-স্বরে পাওয়া। অভিনয়ের অ-জ্ঞানও নেই। তবু হয়তো খানিকটা এগনো যেত। কিন্তু ভেতরের প্রবল বাধাই ওকে এগোতে দেয়নি।

আধুনিকা সাজল বাইরের চেহারায়, সজ্জায়। একজনর উপদেশে সেকলে স্থরমা রায় নামটাকেও পালটে নিনা রায় করে নিল। তার বেশি আর পারেনি। চোখের সামনেই দেখত যারা পারছে তাদের ছোটখাট কাজ ভালোই জুটে যাচ্ছে, তাদের শিথিয়ে-পড়িয়ে নেবার দায়িত্বও সানন্দে নিচ্ছে দরকারী লোকেরা। কিন্তু স্থরো পেশার খাতিরেও, ফিল্মী ছুনিয়ার লোকেরা মেয়েদের সম্পর্কে যাকে বলে গৌড়াম, সেই স্চিততার বোধটাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারেনি।

শক্ত বেড়ায় ও ঘিরে রাখত নিজেকে। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে একটু-আধটু বাচালতা পর্যন্ত ও মেনে নিত, তার বেশি নয়। এতে কি বাজার তৈরি হয়? বিশেষ করে যে মেয়ে নিতাস্তই সাধারণী?

দু'কথার হলেও চরিত্র বলতে সেই প্রথম ছবিতেই। তারপর সবই ভিড়-বাড়ানো ভূমিকা। তবু তো মাঝে-মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা পাওয়া যায়। স্থরো লেগে রইল। রাখ-রাখ-টাক-টাকের ব্যাপার নয়, বোকার মতো সে চেষ্টা করেধনি স্থরো। সারা শহর হাজার বার ঘুরে এলেও যে মুখ দশজন মানুষের মনেও দাগ ফেলে না সেই মুখই সিনেমার পর্দায় আধ মিনিটের তবে হাজির হলেও হাজার মানুষের চেনা হয়ে যায়। কি জাহু সিনেমার! তিন-চারটে ছবিতে মুখ দেখানোর পরই স্থরো ঐ অঞ্চলে রীতি-মতো পরিচিত হয়ে গেল।

যথারীতি পরিচিতির সঙ্গে উপরি পাওনা কুখ্যাতি। সিনেমার এন্সট্রী মেয়ে কি ভালো হয়? স্থরো বাবা-মা'র কাছে তার কাজের কথা গোপন করেনি। মেয়ের কাজের অঙ্ককার দিকটা ভেবে দেখবার অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। ছিল সাধারণভাবে মেয়েদের কাজ করায় বাবা-মা'র আপত্তি, যেটা মেয়ের এনে দেয়া দু'দশ টাকার বিরাট সাহায্যের সামনে মোটেই জোরালো হতে পারেনি। কিন্তু কেছা যখন লোকের মুখে-কানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের কানেও এসে পৌঁছিল তখন তাঁদের আপত্তি রীতিমতো সরব হল।

—ভুই আমাগ মানসন্মান বংশমর্ষাদায় কালি দিতে আছল।

—ক্যান্, কি করছি আমি?

—তুই জানগ না কি করতে আছস ?

—খাইটা পয়সা আনি, চুরি ত করি না।

—পোলাপান মাজনের চেষ্টা করিল না স্বরো। তোরে কেউ চোর কয় নাই।

—তয় ?

—মাইয়ারে লোকে নষ্টচরিত্র কহিলে হেইডা বাপ-মা'র বৃকে লাগে।

—মা!

—হ, লোকে হেই কথাই কয়।

—আমার আর জাননের বাকি নাই। এইখানে হগলেই সাধু, হগল মাইয়ারপোলাই সতী। আমার সারু' কথা শুইনা রাখ। না আছে বিঘা, না জানি কোনো কাম। মংভাবে খাইটা দুইটা পয়সা আনি। লোকে কি কয় আমি জানি, পথে-ঘাটে টিটকারিও দেয়। কিন্তু কাম আমি ছাড়ুম না। কওনের বাকি আর কি আছে। আমারে বিয়া কইরা রাজরানী বানাইতে কেউ আহে নাই। আমারে ঘাটাইও না, তোমাগ থেইকা সংসারটারে আমি ভালো চিনছি।

মাতাও এবং এরই মধ্যে নানা দুর্ভর্মে পাকাপোক্ত দুই দাদার আপত্তির ভাষা ছিল আরো তীব্র, কুৎসিত। কারণও অবশ্য ছিল। স্বরোর কষ্টের রোজগার থেকে একটা পয়সাও ওরা চেয়ে পের না। স্বরোর স্পষ্ট জবাব ছিল—‘তোগরে মদ খাওয়ানের লাইগা আমি খাটি না।’ আপত্তি ছিল মা-বাবা দুই দাদা সকলেরই। কিন্তু সেই আপত্তি কটু-কাটবোর বেশি নয়। অভাবের সংসারে পয়সা এমনই বস্তু।

স্বরো জেদ বড়ায় রেখেছিল। সর্বদ্য খুইয়ে আসা মানুষদের জীবনে অচেনা হাজারো নতুন সমস্যা, কেছা নিয়ে মাতামাতি করার বেকার মন বা অটেল সময় তাদের ছিল না, সকলেরই ধান্দা আছে জীবন ও জীবিকার এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো সাদা সরল নয়। কেছার হিলহিলে জিতগুলো অল্পদিনেই তাই নিশ্চিন্ন হয়ে গেল।

তবু স্বরোর মনটাকে আন্তে আন্তে ছেয়ে ফেলছিল গাঢ় মেঘের মতো হতাশা। এভাবে কতদিন চলবে? চলে লাভই বা কি? দারিত্র্য থাক আপত্তি নেই, জন্ম থেকেই দারিত্র্যের অভ্যাস। কিন্তু মর্ষাদাহীন কাজের জগতই যত বন্ধনা স্বরোর। কাজের বিনিময়ে পয়সা, না ভিক্ষা? একটী মেয়ে বেশি সংখ্যায় দরকার হলে জোগাড় করে দালালরা। দোরে দোরে যুবে এ কাজ সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ পাড়ায় দালালদের যোগাযোগ থাকে। একটা চক্র দিয়ে এলেই হল। মেয়েরা দল বেঁধে এলে হাজির

হত। কথাবার্তা, চলন-বলনই বলে দিত তাদের পেশা। এদের সাধারণত দরকার হত বিয়েবাড়িতে মেয়েদের ভিড় দেখাতে বা ঐ রকম কোনো দৃশ্যে। স্বরো ছিল এদের এক ধাপ ওপরে। বড় হোটেলের ক্যাবারে নাচের আগের হাই সোসাইটির মহিলায় হাতে মদের গ্লাস বা একাকী একটি ছিমছাম মেয়ের হেঁটে যাওয়া—এইসব দৃশ্যে স্বরো স্বেযোগ পেত।

কিন্তু যখন কাজ থাকত না জুটিয়ে-আনা মেয়েদের ভিড়েও নাম লিখিয়ে দু'পাঁচ টাকা যা পেত নিয়ে নিত। নাচতে নেমে আবার লজ্জা কি? মাঝে-মধ্যে কিন্তু হঠাৎ দু'একটা কথা বা ব্যবহার খচ্ করে বুকে বিঁধত। একদিন একটি মেয়ে তাকে বলেছিল—‘তোমার কোন্ পাড়ায় ঘর ভাই? সোনাগাছি? আমাদের হারকাটাঘর তো তোমায় দেখিনি।’ জায়গা দুটোর নাম স্বরো শুনেছিল আগেই, উত্তর না দিয়ে সরে এসেছিল। আরেকদিন একটি মেয়ে ওকে একপাশে ডেকে বলেছিল—‘শোনো ভাই, তোমাকে না আমার ভারি ভালো লাগছে। আমাদের বাড়িতে না ভাই, সব তোমার আমার মতো ফাস্টো কেলাস। বাড়িউলি লক্ষ্মীমাসির নজর উঁচু। তা ভাই যা বলছিলাম, আমাদের বাড়িতে একথানা ঘর খালি হয়েছে। মাসিই তাড়িয়ে দিয়েছে রীতাকে, ও বড় শুকিয়ে যাচ্ছিল। তোমার ছিরিছাঁদ ভালো, তুমি চাইলে মাসি ঘর দেবে। আমাদের বাড়িতে ভাই ভগমানের ইচ্ছেয় কারো ঘরেই রোজ তিন-চারখানার কমে খন্দের হয় না। তুমি এখন আছ কোন্ বাড়িউলির বাড়িতে?’ ‘আচ্ছা, ভেবে তোমায় বলব’ বলে স্বরো সরে এসেছিল এবং আড়ালে গিয়ে বুকের চাপ হালকা করেছিল কেঁদে।

নর্দমা থেকে খুঁটে খেতে গেলে গায়ে ময়লা লাগবেই। মন যে মানে না তবু। বর্তমানই নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা কিন্তু ছিল তা সন্দেহও। ক'বছর পরে বয়েস থাকবে না, শরীর ভাঙবে। সে অভিনেত্রী নয়, এক্সট্রা। তখন কি দাম থাকবে তার? অথৈ নিরাশায় তলিয়ে যাচ্ছিল স্বরো।

এ সময় নিলয়ের সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ না হলে কি হত ভাবতেও আজ ভয় হয়।

জগদীশদার বাড়িতে প্রথম পরিচয়। জগদীশদা-মণিবৌদি ওকে স্নেহ করত। মাহস দিত। যেখানেই স্বেযোগ পেত জগদীশদা স্বরোকে কাজে লাগিয়ে দিত। আগলে আগলে রাখত ওকে নিজের বোনের মতো। স্বরোও মনের ভার হালকা করতে ছুটে ছুটে যেত ওর বাড়িতে।

সেখানেই নিলয়ের সঙ্গে একদিন দেখা। দেখে চমকে উঠেছিল স্বরো—হুবহু

অরুণকুমার। জগদীশদা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল—‘তোমরা একই লাইনের লোক।’ কার যে কি কাজ লেটা পরিষ্কার করে বলেনি, বোধ হয় এই ভেবেই যে সে তো ওরা জানবেই। আরো একটা কথা বলেছিল সেদিন জগদীশদা বা আজও মনে আছে স্মরোর—‘নিলয়, এ মেয়েটা তোরাই মতো ভালো। তোরা দু’জনেই বেখান্না জায়গায় এসে পড়েছিল।’

তারপর পরিচয় একদিন মন-জানা জানিতে পৌঁছল। স্মরো আবিষ্কার করেছিল নিলয়কে। ওর মনের মধ্যে যেন নিজেই মনের ছায়া দেখতে পেত। একদিকে স্মথের রোমাঞ্চে মন ভরে থাকত, আরেকদিকে ডয়ে কাঁটা হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। নিজেই নিয়ে তখন ভাবত না স্মরো, শুধু মনে হত এই ভালোবাসা নিলয়ের সর্বনাশ ডেকে আনবে না তো।

তাই যেদিন ঘর বাঁধার প্রস্তাব নিয়ে এল নিলয় সেদিন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল স্মরো।

—কি, কথা বলছ না কেন? আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে তোমার?

—ছি, ছি...

—তবে? একাই বকে যাচ্ছি, তুমি জবাব দিচ্ছ না।

—ভাবছি আমাকে বিয়ে করে তোমার জীবনটাও নষ্ট হবে।

—থাক নিনা, ও ভাবনাটা না ভাবলেও চলবে। আমরা জীবনে পেয়েছি কি যে হারাবার ডয়ে মরে থাকব? বরং এটুকুই তো পাওয়া, এ আমি ছাড়তে পারব না।

—আমাকে বিয়ে করলে লোকের ষেয়াই পাবে শুধু।

—কার ভালোবাসা পেয়েছি? কতটুকু পেয়েছি?

—তোমার ভবিষ্যত?

—ভবিষ্যত? ওটা আমাদের দু’জনের কারোই নেই। তোমার চাইতে পয়সা আমি বেশি রোজগার করি। কিন্তু এক্সট্রার ভবিষ্যত আর ডামির ভবিষ্যতে তফাত নেই কোনো।

—কেন বলছ এসব? অরুণকুমার ষতদিন আছে...

—হ্যাঁ, তোমারও চেহারা ষতদিন আছে...বুঝছ না কেন আমাদের এমন কোনো সত্যিকারের জোর নেই ষার ভরসায় মানুষ ভবিষ্যত তৈরি কববার কথা ভাবতে পারে। তাই ভবিষ্যতের ভাবনা আমি করি না। আজকের দিনটাই আমার কাছে বড়।

কাল যে সমস্তা আসবে তার চিন্তা কাল করব। তুমি তর্ক বাড়িও না নিনা, আমাদের
বিষয়ে হচ্ছে, এর কোনো নড়চড় হবে না।

—আমার বাবা-মা ?

—তারা আপত্তি করবেন ?

—আপত্তি হবে কিনা জানি না, হলেও মানব না। কিন্তু...

—বুঝেছি। তুমি কত টাকা ওদের দিতে পার তা আমি জানি। ওদের মাসে
মাসে একশো টাকা আমি দেব। আর, বিয়ের পর সিনেমার কাজ তোমাকে ছাড়তে
হবে।

—আমিও ছাড়তেই চাই।

—লক্ষ্মী মেয়ে।

জগদীশদাকে বলতেই সে লাক্ষিয়ে উঠল—‘এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ
করছিল তোরা। দেখিয়ে দে মাহুশকে...।’ সমস্ত ব্যবস্থা জগদীশদাই করে দিল।
রেজিস্ট্রার ডেকে তার বাড়িতেই বিয়ে হল। ছুঁতরফের কেউ এল না বিয়েতে। বেছে
বেছে জনা দশেক কাছের মাহুশকে শুধু নেমস্তন্ন করেছিল জগদীশদা। তদবির করে
সরকারী ক্ল্যাটের ব্যবস্থাও তারই দৌলতে। ঘর সাজিয়ে সংসার পেতে দিয়েছিল,
হাতে ধরে সংসার করতে শিখিয়েছিল ছ’জনকে। বাইরের অঙ্ককার কুশ্রীতা পেছনে
ধেলে প্রাণের আলোয় বলমলে ঘরে এসে দাঁড়াল স্বরো। শুধু স্মৃতি হিসেবে রয়ে
গেল নিনা নামটা। পুরনো নামে কিরে যাবার বাসনা নিলয়কে বলতে গিয়েও বলতে
পারেনি নিনা, এ নামেই যে তাকে প্রথম ডেকেছিল নিলয়।...

খেলতে খেলতে মেঝেতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বাবুসোনা। খেয়াল হতে নিনা
ওকে কোলে নিয়ে খাটে গুইয়ে দিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলে।

একমাথা কালো নরম চুল। এলোমেলো হয়ে এসে পড়েছে কপালের ওপর।
নিনা আলতো আঙুলে চুলগুলো সরিয়ে দিল। তাকিয়ে রইল বাবুসোনার মুখের
দিকে। নিলয় মনে হয় ছেলেবেলায় ঠিক এমনটিই ছিল দেখতে। অবিকল নিলয়ের
মুখ। শিশু নিলয়। নিনার হৃথের পূর্ণতা। প্রতিক্ষণে নিলয়কে কাছে পাবার
বাসনাই বোধ হয় বাবুসোনা হয়ে এসেছে নিনার কোলে।

নিলয়, নিলয়! রূপকথার রাজপুত্রের মতোই সে নিনাকে অঙ্ককারের প্রেতপুরী
থেকে উদ্ধার করে স্বপ্নের বাস্তব জগতে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীতে যে এত আনন্দ
আছে, ছোট্ট ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে যে নীল আকাশের মুক্তির আনন্দ এনে দেয়া

যায়, সে সংবাদ নিলয় যদি তার জীবনে না আসত তাহলে কি কোনোদিনই জানা হত নিনার! কোনো খেদ নেই তার, নেই কোনো দুঃখ। জীবনের শুরু থেকে অনেকগুলো বছর সময়ের কাছে যে নির্ভম বঞ্চনা পেয়েছে নিনা মাত্র চার বছরের অকুপণ দানে সে ঋণের কিছু আর বাকি নেই, বরং জমা-খরচের খাতায় এখন যেন জয়ার দিকটাই ভারি। নিলয় জানে না নিজের ওপর আজ কি দারুণ আস্থা নিনার। সে জানে পৃথিবীতে মানুষ আছে, বিশ্বাসের ভূমি আছে, অন্ধকারের শেষ আছে, আলো আছে। নিত্যদিনের সমস্তাগুলোকে সে আর ভয় পায় না।

শুধু একটা মাত্র ভয় তার নিলয়কে নিয়ে। যে বিশ্বাস সে নিনাকে দিতে পেরেছে তা কিন্তু দিতে পারেনি নিজেকে। দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে নিলয় কি নিজেকে এক ভাবে? অভাব আছে, থাকবেও। গত কয়েকটা বছর বাদ দিলে নিনার জীবনের সবটাই চূড়ান্ত অভাবের ইতিহাস। তার তুলনায় নিলয় বরং সচ্ছলতার মুখ দেখেছে—ষদিও ষৎসামান্ত। নিশ্চয়তাই বা কবে ছিল তাদের জীবনে? তবে কেন নিলয় এত অস্থির? বোধ হয় নিজের কাজটাকেই নিলয় মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। নিলয়ের মানসিক সংকট আঁচ করতে পারে নিনা। সন্তানের জন্ম দিয়েও তার পিতৃহ থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ যেমন হয়। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা চলে না, বোঝানো চলে না, ব্যথা তীব্র হলে নরম হাতের স্পর্শও আরাম না দিয়ে কষ্টই বাড়িয়ে দেয়। শুধু মনে মনে দুঃখ ভাগ করে নেয়।

বাবুসোনার কপালে আস্তে ঠোঁট ছোঁয়াল নিনা।

কলিং বেলের টুংটাং।

দরজা খুলে অবাক নিনা। নিলয়ের মামাতো বোন পুনি, সঙ্গে নিলয়ের মা-পুত্রির হাতে ছোট স্ন্যটকেস।

--আরে পুনি, তুমি! মা, এ কি চেহারা হয়েছে আপনার! আহ্নন, ভেতরে আহ্নন।

নিলয়ের দিককার কোনো আত্মীয়স্বজনই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। কারণ নিনার অজানা নয়। ব্যতিক্রম নিলয়ের মামাতো বোন পুণ্যলতা—পুনি। একমাত্র ও-ই মাঝে-মধ্যে আসে। গুর কাছ থেকেই নিলয় বাবা-মা'র খবর পায়।

পুত্রিই একবার কাউকে না জানিয়ে মাকে নিয়ে এসেছিল এখানে। নিলয়ের সংসার একবারটি নিজের চোখে দেখার গোপন ইচ্ছা মা পুত্রিকেই জানিয়েছিলেন। সে ইচ্ছা পুত্রি পূরণও করেছিল। ও যেমন হাসিখুশি তেমনি বেপরোয়া কে।

ভাবল না-ভাবল তার পরোয়া করে না। তবু আত্মীয়স্বজনরা ওর তোয়াজ করে, পুত্রি খোলাখুলি নিনাকে বলেছে—‘জান বৌদি, আমিও ছোটজাতের ছেলেকে বিয়ে করেছি, বিয়ের আগে বরের আমার গুণের ঘাটতি ছিল না। দাদাভাই তোমাকে বিয়ে করে অচ্ছুৎ হয়ে গেল, আমি কিন্তু হলাম না। কেন জান? যেভাবেই হোক আমার বরের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। টাকা না থাকলে ভালো মন্দ হয়ে যায়, টাকা থাকলে মন্দকেও মন্দ বলতে নেই।’ পুত্রি সম্পর্ক রাখে, শুকে ভালো লাগে নিনার। কিন্তু এ সময়ে পুত্রির সঙ্গে শান্তডিকে দেখে ব্যাপারটা গোলমালে ঠেকছিল।

ছোটকেসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে পুত্রি বলল—‘পিসিমা, তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসে বসো। এই বৌদি...’

নিনার হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গেল পুত্রি।

—ডাকাতটা কই? ও মা, ঘুমোচ্ছে! জাগাব বৌদি?

—সে তোমার ইচ্ছে। কাঁচা ঘুম ভাঙালে ভীষণ গোলমাল শুরু করবে। তোমাকেই সামলাতে হবে কিন্তু। নিনা হেসে বলল।

—তবে থাক।

—কি ব্যাপার? চাপা গলায় শুধোল নিনা।

—বড়দাকে তুমি দেখনি, ও যে কেমন মানুষ আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। তোমাদের বিয়ের পর থেকেই পিসিমা-পিসেমশায়কে চাপ দিচ্ছিল একজনকে অন্তত তোমাদের কাছে এসে থাকতে। ওর ধারণা দাদাভাই মোটা রোজগার করে। শুধু খিচখিচ করত। বৌদি দাদার এক কাঠি ওপরে।

—তুমি তো বলনি আমাদের।

—বলে তোমাদের কষ্ট বাড়াতে চাইনি। তোমাদের অবস্থা আন্দাজ করতে পারি। দাদাভাই হাতিঘোড়া রোজগার করে না নিশ্চয়ই। দু’তিন মাস ধরে পিসিমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। চিকিৎসা করাচ্ছে হোমিওপ্যাথি, তাও পাড়ার ক’আনাড়ী ডাক্তারের কাছে। আজ বলতেই বড়দা আমার সঙ্গে চোটপাট শুরু করে দিল। আমিও একচোট গুনিয়ে দিয়ে পিসিমাকে নিয়ে চলে এলাম। ওখানে কলে পিসিমা বাঁচবে না। দাদাভাইকে বলো ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। দবকার হলে লজ্জা করো না যেন, আমাকে বলো, আমি টাকা দব...

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দে পুত্রি চুপ করে গেল।

না এ ঘরে আসছিলেন। পুষ্টি বলল—শিসিমা, তুমি ও ঘরে বসো। আমরা আসছি।

মা বুঝলেন ওদের আলোচনার তাঁর থাকা উচিত নয়। একবার অসহায় চোখে তাকিয়ে বাইরের ঘরে ফিরে গেলেন।

নিনা ভাবছিল ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এ দায়িত্ব তাদের নিজেই হবে। মাকে নিলয় ফেলতে পারবে না। শুধু মা বলেই নয়, নিলয়ের ছুঁতিনে একমাত্র মা-ই তাকে গোপন সহানুভূতির আশ্রয় দিয়েছিলেন, গল্পনার সামান্য সঙ্কল্প থেকে একটি ভারি বালা ওকে দিয়েছিলেন ট্রেনিংয়ের খরচ চালাবার জন্ত। স্বামী বড়ছেলে আর বড়ছেলের বোঁকে লুকিয়ে ছোটছেলের সংসার দেখে গিয়েছিলেন। স্বামীর ঘর করতে গিয়ে মেয়েরা যদি শব্দ-শাওড়ির স্বীকৃতি না পায় তাহলে সে বড় বিষম জালা। সে জালা শাওড়ি কিছুটা দূর করে দিয়েছিলেন একদিন নিনার ঘরে এসে। সংস্কারের ওপরে পুঞ্জস্নেহকে জায়গা দিতে পেরেছিলেন। নিনাকে আশীর্বাদ করেছিলেন সোনাবাঁধানো নোয়া দিয়ে। এ প্রাপ্তি কম নয় নিনার কাছে।

—কি ভাবছ এত ? পুনি জিজ্ঞেস করল।

মান হেসে নিনা বলল—তোমার কাছে ভাই লুকনোর কিছু নেই। তোমার দাদা-ভাইয়ের কাজকর্ম নেই। হাত প্রায় খালি। তবু মাকে আমরা দেখব, গঁর অঘটন হবে না। ভাত মনে হচ্ছে ফুটে গেছে, তুমি বসো, আমি আসছি...

পুনি গিয়ে শিসিমার পাশে বসে বলল—তুমি অমন কাঠ হয়ে আছ কেন শিসিমা ? এ তোমার ছেলের বাড়ি...

—যেখানে ছিলাম সেও ছেলের বাড়িই পুনি।

—হ্যাঁ, তোমাদের ভালো ছেলের বাড়ি। দেখে-শুনে জাত মিলিয়ে ভালো বোঁ এনেছ। এ তোমাদের খারাপ ছেলের বাড়ি। এ বোঁয়ের নামেও কত নিন্দেহমন্দ। কিন্তু দেখো মন্দ ছেলে আর ছেলের বোঁ-ই তোমায় মাথায় করে রাখবে।

পুনিয়ার পিঠে হাত রেখে মা হাসলেন।

—হাসছ যে বড় ? পুনি গলায় নকল ঝাঁজ এনে বলল।

—তোর জালা আমি বুঝি পুনি। কিন্তু আমার ওপর রাগ করা মিথ্যে। তোর বিয়েতে বল, নিলয়ের বিয়েতে বল, আমার মনে খটকা থাকলেও আশান্তি করিনি। ভেবেছি, আমরা পুরনো মাছঘর, নতুন কিছু দেখলে মেনে নিতে পারি না বলেই যে শেটা তুল তা কি জোর দিয়ে বলা উচিত। চুপ করে থেকেছি। পরে বুঝলাম তোরা

ভুল করিনি। কিন্তু যারা দেখেও শিখবে না, শিখলে যেন তাদের হার হয়ে যাবে, তাদের কে বোঝাবে বল ?

—মন থেকে বলছ না ঠেকে বলছ ? পুনিয়া হেসে বলল।

—শুধু ঠেকে বলছি না, ঠেকে শিখে বলছি। মার গুজনো মুখে নরম হাসি।

—ওঃ, বুড়ি তর্কে গুস্তাদ।

নিনা এসে শাস্ত্রিকের প্রণাম করল। অসময়ে আচমকা শাস্ত্রিকের দেখে প্রথমে প্রণাম করার কথা গুর মনেই আসেনি।

মাথায় হাত বুলিয়ে গুকে আশাবাদ করলেন মা।

—মা, নিনা বলল, আমি একটু বেরুব। বাবার কাছে যাব। এঙ্কুনি না বেরুলে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে। আপনার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গেলাম, খেয়ে নেবেন।

—তুমি খাবে না বৌমা ?

—আমি গুখানে খেয়ে নেব।

—নিলয় ফিরবে কখন ?

—ও খেয়ে বেরিয়েছে। ফিরতে দেরি হতে পারে। আপনি বিশ্রাম করুন। ...না, নিনা কোমল গলায় বলল, আপনি আমাদের কাছেই থাকবেন...কোনো চিন্তা করবেন না...

মায়ের চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠল। নিনা সেটা লক্ষ্য কবল।

৬

স্টুডিও পাড়া। বাংলা সিনেমার রমরমার দিনে পাঁচ-ছ'টা স্টুডিও গড়ে উঠেছিল এখানে। উঁচু উঁচু গুদামঘরের মতো বাড়ি। টিনের চাল। বয়সের ছাপ এখন তাদের সর্বাস্থে।

নতুন স্টুডিও আর তৈরি হচ্ছে না। প্রতিদান সব স্টুডিওর ফ্লোরে কাজই থাকে না, নতুন স্টুডিও তৈরি করতে আসবে কে।

ব্যবসার হাল ভালো না। হিন্দি ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হালে পানি পাচ্ছে না বাংলা ছবি। বাংলা ছবির মান বাড়ছে, বাণিজ্য কমছে। হিন্দি ছবির প্রযোজকদের টাকা অভ্র, বাণিজ্যের উপকরণ তারা ঠেসে দিচ্ছে ছবিতে। বাঙালী

প্রযোজক-পরিচালকের পকেটে নেই অত টাকা, মগজে নেই অত বাণিজ্য। ফলে হিন্দি ছবির মতোতে তৈরি লাখে-লাখ নতুন দর্শকের চাহিদামতো ছবি তারা তৈরি করতে পারছে না।

তবু টিকে থাকার লড়াই চলছে, চলবে। সে লড়াইতে অরুণকুমার মস্ত সহায়। সে থাকলে ছবি অন্তত পড়ে পড়ে মার খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। নিজেব একটা আশ্চর্য ইমেজ সে তৈরি করে নিতে পেরেছে। হিন্দি ছবির একরোখা বাঙালী ভক্তও অরুণকুমারের ছবি হলে দেখতে যায়। অবিখ্যাত টাকা নিয়ে না নামলে হিন্দি ছবির মতো বেআক্কেলে তাণ্ডবের ছবি বানানো সম্ভব নয়। বাংলা ছবির ছোট্ট বাজার থেকে সে টাকা তুলে আনাও অসম্ভব। বাঙালী মনের করুণ নরম বাস্পাধিকার জায়গাগুলোতে পালক বোলানোর মতো গল্প সব শেষ হয়ে গেছে, অথবা স্ক্রুয়ার বৃত্তির আকালের দিনে শুধু নরমে আর কাজ হয় না, নরমে-গরমে স্বাদটা বেশ চড়া হওয়া চাই। কাজেই এই মুহূর্তে ইণ্ডাস্ট্রির একমাত্র ভরসা অরুণকুমার।

সে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। একটা ইণ্ডাস্ট্রি যার কাঁধে ভর দিয়ে বেঁচে আছে, কয়েক হাজার মানুষের ছুঁবেলা না হোক একবেলার অন্তত অন্নসংস্থান হচ্ছে। সে মানুষটা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। তার বেঁচে থাকা দরকার। হয়ত, একদিন দুঃসময় কেটে যাবে, ইণ্ডাস্ট্রি রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু যতদিন ছুঁপায়ে দৌড়ানোর মতো আশ্চর্য ব্যাপারটা না ঘটছে ততদিন এক পায়ে খুঁড়িয়ে চলার জন্তুও অরুণকুমার নামক ক্রাচটিকে দরকার। একেবারে ছুঁপা ভেঙে মাটি নিলে আর কি উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়া যাবে?

অনুগ্রাধা স্টুডিওর ইট বের করা দেয়াল বরাবর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিলয় এইসব ভাবছিল এবং একটা যুক্তিহীন অপরাধবোধ তাকে বিধগ্ন করে ফেলছিল।

অরুণকুমার স্নস্ব থাকলে আজ অনুগ্রাধা স্টুডিওতেই নিলয়কে তার সঙ্গে কাজ করতে হত। সে কাজে আনন্দ না থাক টাকা ছিল। এবং টাকার তার সম্বন্ধ প্রয়োজন।

গেটে দারোয়ান নমস্কার জানাল—নমস্তে বাবুজী।

অগ্রমনস্কভাবে 'নমস্তে' বলে এগিয়ে গেল নিলয়। অশ্রুদিন সে দারোয়ানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছ'চার মিনিট গল্প করে। মানুষটার বয়সের গাছ-পাথর নেই। অনুগ্রাধা স্টুডিওর সঙ্গে আ-শৈশব সম্পর্ক। বয়সের হিসেব ঠিক থাকে না, কিন্তু স্মৃতির ভাঁড়ারে মণি-মাণিক্যের সঙ্কেয় হিসেবের ভুল নেই। পুরনো দিনের কত গল্পই না সে

অনর্গল বলে যেতে পারে। নিলয় ওর সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পায়। কিন্তু আজ অফুরত অবসর থাকা সত্ত্বেও দাঁড়াল না।

এক নম্বর ফ্লোরে সেট সাজানো চলছে। এখানেই আজ অরুণকুমারের সঙ্গে নিলয়ের স্তাটিং হবার ডেট ছিল। অরুণকুমার না থাকায় অচ ছবির কাজ হচ্ছে।

কর্তারা বা আর্টিস্টরা কেউ এখনো আসেনি। কয়েকজন মজুর আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করছে। তদারকি করছে আর্ট ডাইরেকটরের একজন সহকারী—অনুতোষ দত্ত। নিলয়ের চেনা অনেকদিনের—বন্ধুর মতোই।

খুব হাঁকডাক করছিল অনুতোষ—বেস্তেরি, এটা কি করলি রে? জানাটা তোকে ওখানে লাগাতে বলেছিলাম? খোল, খোল, খোল শিগগির। এক ঘণ্টা পরে স্তাটিং, এখনো...এই হজমি, তুই শালা ইলেকট্রিসিয়ান? মোমবাতি বিক্রি করগে যা। ওখানে ওয়াললাম্প লাগালে শেড পড়বে না? ডান দিকের দেয়ালে লাগা। আরে, ছ'নম্বর!

নিলয়কে দেখে এগিয়ে এল অনুতোষ।

—কি খবর? তোমার পাতাই মেলে না...

—কাজ-টাজ নেই...তাই...মানে...। খেমে খেমে বলল নিলয়।

—ঠিক। কায়ান না থাকলে ছায়া আসবে কোথেকে। বলে উঠলেই কন বলার আশ্রয়প্রসাদে হাসল অনুতোষ।

বোকাটে হাসিতে নীরব উত্তর দিল নিলয়।

—অরুণকুমারের মিউজ কি? অনুতোষ বলল।

—খবরের কাগজেই যা দেখছি। তুমি জান?

—সে কি! কায়ার খবর ছায়া জানে না? অবশি বিছানায় চিংপাত হয়ে থাকলে ছায়া পড়ে না। অনুতোষ উঁচুদরের সংলাপ বলার হাসিটার পুনরভিনয় করল।

অভিনয়ের জগতে কাজ করতে করতে ও বেধ হয় নিজেকেও অভিনেতা ভাবে শুরু করেছে। এখানকার অনেক কৃত্রিমতার মনো এও একটা। নিলয় লক্ষ্য করেছে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পর্দায় যেমন সহজ স্বাভাবিক—মানুষের মতো—পর্দার বাইরে তা নয়। বাস্তব জীবনে যেন ওরা ওভার বা আণ্ডার-আর্কাটিং করে থাকে। নকল সাজানো মানুষের মতো মনে হয় ওদের। এটা হয়তো নিলয়ের দেখার ভুল, বোকার ভুল। কিংবা অভিনয় জীবিকা হলেও অভিনেতা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়

বলেই গোপন ঈর্ষার চোখ ওদের বাঁকাচোরা কাটু'নের মতো দেখে। নিলয় ভীষণ বিব্রত বোধ করল হঠাৎ।

‘মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে ফেলার জন্তু ও অল্প প্রসঙ্গে যেতে চাইল—কোন ছবির স্মৃতিং হচ্ছে ?

—নতুন প্রোডিউসার, নতুন ডাইরেকটর। স্বরের বিলাপ। স্থলক্ষণ-বিক্রমজিৎ। ওদের কয়েকটা ইনটিমেট শট টেক করা হবে আজ।

—কেটে পড়তে হয় তাহলে।

—আরে, দেরি আছে।...এই, এই মোনো, আরেকটু সরা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইবার বেঁধে ফেল। শালা বুদ্ধ, তোর মাথায় কি কোনোদিন বুদ্ধি হবে না রে মোনো...

অনুভোষের বাস্তবতার স্বপ্নোগে ‘আজ তবে চলি’ বলে ফ্লোর থেকে বেবিয়ে এল নিলয়।

স্থলক্ষণ অভিনয়ে যত না, ঠাটবাটে তার দশগুণ। অরুণকুমারের বিছানায় ভাগ বন্ধানোর অহংকারে চাল বোল কায়দাগুলো বোল আনা রপ্ত করেছে। স্মৃতিংয়ের সময় নরকারী লোকজন ছাড়া অরুণকুমার কাউকে থাকতে দেয় না। কর্তারও সন্ত্রস্ত থাকে। মেজাজ একবার বিগড়োলেই হল। মুড় নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব স্মৃতিং হবে না। তাতে প্রোডিউসারের দু'পাঁচ হাজার গেল তো গেল। স্থলক্ষণও আজকাল এসব উৎপাত চালায়। অথচ অরুণকুমারের হিলটন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠার আগে ও কিন্তু এ রকম ছিল না।

স যা-ই হোক, সেট থেকে নিলয়ের করে আসার কারণ এটা নয়। স্থলক্ষণার সঙ্গে দৈবাস দেখা হয়ে যাওয়াও সে চাইছিল না। মাহুমকে আঘাত করা স্থলক্ষণার বিলাস বা রাগী নায়িকার ইমেজ বাড়ানোর কায়দা। অবশু মাটি শক্ত হলে মানিকিওর করা নেলপালিশ-রাঙানো নগগুলো ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি কখনোই নেয় না। কিন্তু নিলয় শক্ত মাটি নয়।

স্টুডিও-চত্বরের একপাশে দেয়াল ঘেঁষে ছোট টিনের চালা। নিচে কয়েকখানা বেঞ্চি টেবিল। রামদা'র চায়ের দোকান। বড়-মাঝারি আর্টিস্ট আর কর্তাদের চায়ের ব্যবস্থা ভেতরে। ভালো ব্যবস্থা—খরচ প্রোডাকশনের। ছুটকো আর্টিস্ট, অ্যানিস্ট্যান্ট আর মজুরদের বরাদ্দ টিফিনের বাইরে চা-টা খেতে হলে রামদা'র দোকান। খেলাসে শস্তা চা, বয়াম থেকে দিশি বিস্কুট। রামদা'র বিক্রি ভালো স্মৃতিংয়ের আগে-পরে ফাঁকে ফাঁকে বেশ খন্দেয় হয়, অবশু স্মৃতিং থাকলে তবেই। নিলয় রামদা'র খন্দেয়।

ও গিয়ে বসতেই রামদা উত্তরের পাশ থেকে বলে উঠল—কি ওস্তাদ, দেখি না কেন ?

—এই...এই আর কি ...। কি উত্তর দেবে নিলয় ভেবে পেল না।

দোকানে বসে দু'জন মানুষের মুখের ওপর দিয়ে নিলয়ের চোখ ঘুরে এল তিনজন তার চেনা। যজ্ঞেশ্বর—ক্যামেরাম্যান সত্যেনবাবুর দু'নম্বর আর্সিস্ট্যাট। অনিলের কাজ জোগাড়ের—সকলের ব্যাগার খাটা। ভোলাদা করে একটু সাপ্লাই। ওরা পাশাপাশি বসেছিল। ওদের মুখের আড়ষ্ট হাসি নিলয়কেও আড়ষ্ট করে রাখল।
রামদা জিজ্ঞেস করল—চা দেব ওস্তাদ ?

নিলয়কে ওস্তাদ ডাকে রামদা। প্রথম প্রথম রামদার এই সম্ভাষণে নিলয়ের আপত্তি ছিল। কিন্তু রামদার যুক্তি প্রবল।—‘তুমিই বাবা ঠিক ঠিক ওস্তাদ। ভুল নাচিয়ে, স্টেট বেকিয়ে, নাকা-নাকা ডাইলগ চেপ্টা করলে অনেকেই বলতে পারে। কিন্তু তোমার মতো ...ওরে বাবা !—’

রামদার স্বীকৃতির ভাষা যেমনই হোক আন্তরিকতা বুঝতে নিলয়ের অস্বাভাবিক হয়নি। আর আপত্তিও করেনি। বরং রামদার মুখে ওস্তাদ ডাকটা শুনতে ওপরে ভালোই লাগে।

—কি যজ্ঞেশ্বর, চা চলবে নাকি ? নিলয় জড়তা কাটিয়ে বলতে চেপ্টা করল।

—আমরা খেয়েছি।

—তাতে কি হয়েছে, আরেক রাউণ্ড হোক না। ভোলাদা বলল।

—চারটে চা, চারখানা নোনতা বিস্কুট। নিলয় বলল।

—নিলয়দা, এখানে এসে বসুন না। অনিল বলল।

নিলয় উঠে গিয়ে ওদের মুখোমুখি বসল বেঞ্চে। এদের সঙ্গে নিলয়ের সম্পর্ক সহজ অন্তরঙ্গ। গোড়ার দিকে নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিলয়ের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। সে অরুণকুমারের ডামি, চাড্ডিগানি ব্যাপার—এইরকম ভাব বোধ হয় ছিল মনে। আস্তে আস্তে বুঝেছিল আসলে আর নকলে ফারাক হাজার মাইল। সাধারণ আর্টিস্ট-শাও তাকে পাত্তা দিত না। তখন নিলয় তার কাছের মানুষদের খুঁজে পেয়েছিল এদেরই মধ্যে। এরা নেপথ্যের নাম্বার, সেও নেপথ্যেরই একজন। এদের কাজ যত ছোট্টই হোক তবু স্বাভাবিক অহংকার আছে। নিলয়ের তাও নেই। নিজের গোপন উপস্থিতি ওদের কাছে কখনো প্রকাশ করেনি। ওরা কিন্তু নিলয়কে মনে করে ওদের কয়েকটা ওপরের লোক। তাই নিলয়ের অন্তরঙ্গতাকে খাতির করে যথেষ্ট।

কিন্তু আজ যেন নিলয়কে ওরা তেমন ঘনিষ্ঠ করে নিতে পারছিল না। বিশেষত যজ্ঞেশ্বর বড় বেশি গম্ভীর।

চা-বিস্কুট দিয়ে গেল রামদা।

নীরবতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে।

—খবর আপনার কাছে। যজ্ঞেশ্বরের স্ত্র যেন সামান্য তেতো।

—আমার কাছে ?

—অরুণকুমারের খবর আর কি। অনিল যজ্ঞেশ্বরের কথাই মর্মার্থ বুঝিয়ে দিল।

নিলয় ম্লান হাসল—অত ওপরের খবর কি আমার কাছে থাকে ভাই ?

—ষততো ফালতু ঝামেলা। চায়ের লম্বা চুমুক দিয়ে ঠকাসু করে গেলস নামিয়ে রাখল ভোলাদা।

যজ্ঞেশ্বর থমথমে মুখ করে বলল—তোমার কাছে ফালতু হতে পারে...

নিলয়ের মনে হল সে আসার আগে এ প্রশ্নকে কোনো আলোচনা চলছিল। সে একদিনে ঢোকের পর ওরা আলোচনায় দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। তার মানে এ আলোচনার মধ্যে তাকে রাখা চলে না। অতএব তারও প্রশ্ন করা উচিত নয়। নিলয়ের অস্বস্তি বাড়ছিল।

—ফালতু ছাড়া কি ? আমার গুরু কি বলত জানিনা, নেড়ি কুত্তা হয়ে যখন জন্মেছিল স্বভাবটা নেড়ি কুত্তার মতো করে নে, আলা থাকবে না। ভালো পেলে ভালো খাবি, না পেলে নোংরা ঘেঁটে খাবি। তোরা হচ্ছিস না ঘরকা না ঘাটকা। মনে ইচ্ছে ভদ্রলোকের মতো কাজকর্ম করে খাওয়া, কিন্তু কাজের ঘোড়ার ডিম ঠিক আছে ? অরুণকুমার যেন ভগবানের পরমাই নিয়ে জন্মেছে, মরবে না, শরীর টসকাবে না কোনোদিন। একটা লোকের ভরদায় যদি এত লোকের বাঁচা-মরা, তবে শালা মরই ভালো। অরুণকুমার বসে পড়ল তো হাজার লোকের মাথায় হাত। কোনো মানে হয় ? এর নাম বাবলা ? তোরা আবার গালভরা নাম দিয়েছিস সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রি। আমি শালা মাগী সাপ্লাই করি। সিনেমায় পেলে সিনেমায় করব, না হলে অল্প খন্দের ধরব। আরো লাইন আছে, সেসব তোদের শুনে কাজ নেই। আর তোরা ? ভদ্রভাবে বাঁচতে চাস ? ভদ্রভাবে ক'জন বেঁচে আছিস রে ?

প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ভোলাদা তেরটে কাঠ-কাঠ মুখে পোড়-খাওয়া হাসি মাখিয়ে তাকিয়ে রইল যজ্ঞেশ্বরের দিকে।

যজ্ঞেশ্বরের মুখ কালো, সে একটু সময় নিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল—তুমি যেমন
নাক পেরকমই বলছ।

—আলবৎ, ভোলাদা বলল, আমি আমার মতনই বলব। তোদের মতন বসে বসে
প্রত্যাশা করব না, কার জন্মে কি হল তা নিয়ে বাজে কপচাতেও যাব না। আমার
প্রার্থের ভাবনা নেই, তোদের আছে। কিন্তু কোনোদিন কি ভেবে দেখেছিস তোদের
প্রার্থের ভাবনাটা বাজে খোয়াব?

অনিল মিনমিন করে বলল—বারে, আমরা কি করব? ভাত জুটবে কোথেকে?

—আমি তার কি জানি। গোটা দেশের যা আদত, এ লাইনেরও সেই আদত।
পরের লোকেরা মজা লুটে নিচ্ছে, নিচের লোকদের বেলায় লবডঙ্কা। এটা আমার
ব ভালো রকম বোঝা হয়ে গেছে বলেই আমি কিছুই তোয়াক্কা করি না। এখনো
লিখি যদি বাঁচতে চান নেড়ি কুত্তা বনে যাবার ট্রেনিং নে।

যজ্ঞেশ্বর অল্পস্বল্প লেখাপড়া করেছে, শোনা যায় বি.এস. সি পর্যন্ত নাকি পড়েছিল,
সব পলেই বইপত্র পড়ে।

স রাতিমতো উদ্ভণ্ড হয়ে বলল—তোমাদের মতো লোক আছে বলেই এ দেশের
কছু হবে না। তোমার আসল বক্তব্য হচ্ছে ভাগ্যকে মেনে নাও। যা হচ্ছে তা
তেই থাক, পালটাবার চেষ্টা করো না।

—পালটাবার চেষ্টা তোরা করছিস? কে করছে? পালটানো চেহারাটা কেমন
দাঁক কেউ জানে? তুই জানিস? আমি জানি না, তাই বেঁচে না থেকে যখন উপায়
নই ছাবনটাকে বিলকুল সোজা করে নিয়েছি। ভোলাদা রসিয়ে রসিয়ে বলল।

নাঁরবে শুনছিল নিলয়। বুঝল জীবিকার ওপর যোক্ষম যা এসে পড়ায় ওরা চিন্তিত
প্রত্যাশা এবং কুদ্ভ। ওদের তর্কবিতর্কে পথের হাদিস না থাকার জালা, অক্ষমতার দাহ।
গান্ধী অনেকসময় তার যন্ত্রণাব সঠিক কারণ খুঁজে না পেয়ে কাল্পনিক শত্রুর ওপরই
প্রত্যাশা মেটায়। নিলয় কি যজ্ঞেশ্বর-অনিলের সেই কাল্পনিক শত্রু? যজ্ঞেশ্বরের
বিভাবে যেন এ রকম একটা আঁচ ছিল।

—সত্যিই আমাদের নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা দরকার, নিলয় আস্তে আস্তে
মিলতে লাগল, বাংলা ছবির বাজার যা হচ্ছে...। আগে যেসব হলে শুধু বাংলা ছবি
দখানো হত এখন সেখানেও চলছে হিন্দি ছবি। ছবি তৈরি হচ্ছে আগের চেয়ে
অনেক কম। যা-ও হচ্ছে বেশির ভাগই রিলিজ পাচ্ছে না, রিলিজ পেলেও বিক্রি পাচ্ছে
না। প্রোডিউসাররা ভুলে পিছিয়ে যাচ্ছে। এর কোনো বিহিত হবে না?

—কি বিহিত হবে? কে বিহিত করবে? সরকার? ভোলাদা বলল।

—সরকার সাধামতো চেষ্টা করছে, যজ্ঞেশ্বর বলল, অনেক ভালো ছবি সরকারের টাকায়ই তৈরি হয়েছে। আর কি করবে সরকার? সরকার কোটি কোটি টাকার বাজেট নিয়ে বোম্বাই ছবি তৈরি করতে নামতে পারে না। অল্প টাকায় ভালো ছবি তৈরির দিকেই সরকারের নজর। সেটাই উচিত।

—সরকার যা করছে তার বেশি সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়, নিলয় যজ্ঞেশ্বরকে সমর্থন জানানাল, কিন্তু সিনেমা শিল্পের এই দশা চললে আমরা দাঁড়াব কোথায়?

—আমরা শুয়েই আছি। ভোলাদা মন্তব্য করল।

—তোমাদের 'আ্যাসোসিয়েশন এ নিয়ে ভাবছে না? নিলয় যজ্ঞেশ্বরকে জিজ্ঞেস করল।

—আ্যাসোসিয়েশন আমাদের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়তে পারে। এর বেশি কি ক্ষমতা আছে তার? আসল জিনিস হচ্ছে অল্প বাজেটের এমন ছবি তৈরি করতে হবে যা বাজারে ধরবে। হিন্দি ছবির লাইনে ছবি করার মানে হয় না। অত টাকা নিয়ে যে নামবে সে বোম্বে গিয়ে হিন্দি ছবিই বানাবে। আমি বোম্বাই-মার্কা ছবি এখানে বানানোর বিরুদ্ধে। আবার আর্ট-ফিল্মের নামে এমন ছবি করেও লাভ নেই যা এক হপ্তাও চলে না। আমার মনে হয় বুঝে করতে পারলে বাঙালীর মন-মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি-করা অল্প টাকার ছবিও ভালো পয়সা দেবে। কিন্তু কেউ এ নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছে বলে মনে হয় না। একদল হিন্দি ছবির নকল করতে গিয়ে মার খাচ্ছে, আরেক দল এমন আর্ট-ফিল্ম তৈরি করছে যা বাজারে অচল। তাই ভরসা অরুণকুমার, ঐ একটা লোকের নাম ভাঙিয়ে যা হয়...আমাদের অন্নদাতা এখন প্রযোজকরা নয়, অরুণকুমার ..

যজ্ঞেশ্বরের বক্তব্যে নিলয়ের ভাবনার অবিকল প্রতিধ্বনি। বাহুবের চাহিদার দুটো দিক আছে। একটা দিক ধরে নিয়ে হিন্দি ছবি দেশ জুড়ে চূড়ান্ত ব'বশ' চালাচ্ছে। অল্পদিকটা ঠিকভাবে ধরতে পারলে বাংলা ছবির পক্ষেও যে ভালো ব্যবসা করা সম্ভব তার প্রমাণ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কেন সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না? অথবা কাজে লাগানোর মতো যোগ্য লোকের অভাব?

যজ্ঞেশ্বর আবার বলল—অরুণকুমার নার্সিংহোমে যাবার পর থেকে বাবো আন কাজ বন্ধ। প্রোডিউগাররা যে যে ছবিতে অরুণকুমার আছে সেগুলোর কাজ বন্ধ

করে দিয়েছে। এমন কি যেসব সিনে অরুণকুমার নেই সেসব সিনেও তুলছে না। বিষ্ক নিতে কেউ রাজী নয়। এই তো অবস্থা। এদিকে আমাদের হাঁড়ি চড়ছে না।

—এমন কৌতুকা চালালেন নিলয়দা, বোকার মতো হঠাৎ বলে ফেলল অনিল, অরুণকুমার কাত, আমরাও কাত।

খেকেঁকিয়ে উঠল ভোলাদা—বুদ্ধুর মতো কথা বলিস না। নিলয়বাবু যেন ইচ্ছে করে অরুণকুমারকে চোট দিয়েছে।

—বিশ্বাস করুন ভোলাদা, আমার ঘুমি ওর পেটে লাগেওনি। মনে হয় টেবিলের কোনায়-টোনায়... নিলয়ের গলায় ক্লাস্তি।

—লাগলেই বা। ভোলাদা বলল।

—যাকগে, ছাড়ান দিন, ও নিয়ে গবেষণা করে কি হবে। যা হবার হয়ে গেছে। যজ্ঞের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টানতে চাইল।

কিন্তু ওর গলার অল্পচারিত অবিশ্বাস ও অভিযোগ নিলয়ের কান এড়াল না।

খুব আস্তে আস্তে, যেন কৈফিয়ত দেবার স্বরে সে বলল—তোমরা তবু সিকি হলো ও কাজ পাচ্ছ। আমার অবস্থাটা ভেবেছ? আমার এক পয়সারও কাজ নেই।

—আপনার কি, আপনি বোধে চলে যাবেন, ওখানে ফাইটিং ছবিতে আঁকটিং করবেন। অনিল বলল।

—হ্যাঁ, জলের মতো সোজা, ভোলাদা বলল, তুইও ফিলিমের অনেক কাজ জানিস, চলে যা না বোধে। দেখি কেমন কাজ জোগাড় করতে পারিস।

—আমরা টেকনিসিয়ান আমাদের কে পুঁছবে। অনিল সাফাই গাইল।

—আর আমি? আমি কি? হঠাৎ চাপা তীব্র স্বরে নিলয় বলল।

নিলয়ের আকস্মিক ভাবান্তরে সবাই খতমত খেয়ে চূপ করে গেল।

খানিকক্ষণ চূপচাপ বলে থেকে নিলয় উঠে দাঁড়াল—চলি তাহলে। কত হল রামদা?

—তিন টাকা ওস্তাদ। উল্লনের পাশ থেকে চটপট উত্তর এল রামদার।

পয়সা দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল নিলয়।

অদ্ভুত। যেন ফেল-করা বাচ্চা ছেলেদের বানানো অজুহাতের মতো। নিলয়ের লেখাপড়া বেশি নয়। কিন্তু পৃথিবীর অশ্রুদেশে এমন হয় বলে তার জানা নেই।

একটা লোকের দমায় কয়েক হাজার লোক ছোট-বড়-মাঝারি উল্লেখ করে বেঁচে আছে। এর নাম শিল্প? কোথাও দশটা ছবি তৈরি হলে তার আর্টটার নায়ক যদি হয় একই লোক তবে সেটা আর যা-ই হোক ইণ্ডাস্ট্রি নয়। ছবির নায়ক কারখানার ম্যানেজার নয় যে জায়গা খালি হলে হাজারখানা নতুন দরখাস্ত পড়বে। একজন নায়ককে দিয়ে ছবি শুরু করে আরেকজনকে দিয়ে শেষ করানো যায় না। তাহলে বেশির ভাগ ছবিতে একই লোককে হিরো করার লটারি খেলা কেন? লোকটা বক্তৃতা-সংসার মানুষ, অসুস্থ হতে পারে, মরে যেতে পারে, তখন যে সবসুধু ডোববার পালা।

ইণ্ডাস্ট্রি যারা চালায় তারা ভাবে না। নাকি ভাবতে যারা পারে সে মানুষগুলো এ কাজে নেই? কর্তাদের ভড়ং অশেষ, এমন ভাব দেখায় যেন মানুষ আর ছুনিয়ার আত্মত্ব ওদের নখের ডগায়। কথায় কথায় ফেলিনি, গদায়, নিউ-ওয়েভ, কমার্শিয়ালিজম, মস্তাজ, থার্ড সিনেমা, বুদ্ধ, দর্শকের জন্তু করতে বাধ্য হচ্ছে, আরে-ঠারে দারুণ চালাক-চালাক শব্দ, ইন্টেলেকচুয়াল ভঙ্গিতে কাঁচা খিস্তি। পুরোটা মিলিয়ে অস্বাভাবিক। তোমাদের ক'জনের না হয় শালা বাপ-ঠাকুদার রেখে যাওয়া টাকার চুলকুনি, কিংবা বড়লোককে টুপি পরিয়ে টাকা এনেছ। বেশ, তোমরা আনছ বলে তবু গরিব-গুরুরোর আবেগটা-সিকিপেটার সংস্থান হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত জিনিষটা কি চেলে শাজানো যেত না? দর্শককে বুঝতে হবে, আর্ট বুঝতে হবে, বাবসাও বুঝতে হবে। এজন্তে যা করা দরকার তোমরা করছ না কেন? কেউ অস্ত্রের গল্প লিখে দিতে পারে না, কেউ অস্ত্রের পরিচালনা করে দিতে পারে না, একজনের অভিনয়ও ছবছ অন্তকে দিয়ে হয় না। কিন্তু সমস্যার গোড়াটা সকলে মিলে পরিষ্কার বুঝে নিলে এত ভয় থাকত না। লাইন দিয়ে অরুণকুমারের পায়ে গড়াগড়ি দেবার দরকার হত না। বাপারটা সত্যিকারের ইণ্ডাস্ট্রির চেহারা পেত।...কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিলয়ের অবস্থানের হেরফের হত কি?

গেটের কাছাকাছি গিয়ে সে আবার ফিরে এল। হঠাৎ একটা মতলব এসেছে মাথায়।

এডিটর অধীর ব্যাণ্ডো ল্যাবোরেটরিতে ছিল। অধীর ব্যাণ্ডো ছাড়া প্রেট। প্রচণ্ড মোটা, প্রচণ্ড খাটিয়ে, প্রচণ্ড মাতাল এবং অল্পবিস্তর স্ত্রীলোকে আগন্তু। মদ পেটে

ধাকলে তার মেজাজ দিলদরিয়া এবং ও বস্তু সর্বদাই তার পেটে থাকে বলে মোটামুটি সর্বদাই তাকে খোশমেজাজে দেখা যায় ।

লাবোরেরির দারোয়ানকে নিলয় বলল—ব্যাণ্ডোদাকে বল আমি দেখা করতে চাই ।

দারোয়ান ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলল—যান, ব্যাণ্ডো সাহেব এডিটিং কমে আছেন ।

মস্ত টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডো কাজ করছিল । টেবিলের ওপর ছড়ানো একগাদা ফিল্মের টুকরো, কাঁচি, রিল, আরো নানান সরঞ্জাম । খানিকটা ফিল্ম হাতে নিয়ে ব্যাণ্ডো আলোর সামনে ধরে দেখছিল একমনে । মোটা বেন্ট দিয়ে কুঁচকির কাছে আটকানো ট্রাউজারের ওপর বিশাল ভুঁড়ি নিশাসের ফোঁস ফোঁস শব্দের সঙ্গে ইঞ্চি তিনেক ওঠানামা করছিল । চিবুকে তিনটে ভাঁজ । কর্ণা মুখে ফোলা গালের মাংস ঝুলে পড়েছে । কানের ওপরে ঘাড় বরাবর আধ ইঞ্চি পাট রঙের চুলের বর্ডার ছাড়া মাথায় একটিও চুল নেই । চকচকে টাকের ওপরে চিকচিক করছে ঘামের ফোঁটা । ব্যাণ্ডো দ্যা গ্রেট গভীর মনোযোগের সঙ্গে ফিল্মের টুকরো দেখছিল ।

নিলয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সসম্মত দূরত্বে ।

দেখা শেষ হতে ব্যাণ্ডো ফিল্মের টুকরোটা পাশে দাঁড়ানো অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে দিয়ে বলল—পাঁচ নম্বর শটের শেষে জুড়ে দাও । ওখানে মিস্ত্র-আপ এফেক্ট আছে মনে থাকে যেন । আরে নিলয়, এসো, এসো । বসো ।

ব্যাণ্ডো বসল তার হাতলওলা রিভলভিং চেয়ারে । পাশেই একটা সাধারণ চেয়ারে বসল নিলয় । ভূরভূর করছে মদের গন্ধ । যাক, নিলয় আশ্বস্ত হল । ব্যাণ্ডোর পেটে বস্তু ভালোমতোই আছে, অতএব মেজাজও নিশ্চয়ই ভালো । এখন তার কাছে যা ইচ্ছে বলা যায় নির্ভয়ে । খানদানের দেমাক, পয়সার গরম (পৈতৃক স্মৃত্তে এবং স্বাপার্কিত) ইত্যাদি যা তাকে মানায় সেগুলো এমনিতেই তার কম, নেশা তাকে আরো উদার করে তোলে ।

—কেমন আছ গো ? চেয়ারে অল্প অল্প দোল খেতে খেতে ব্যাণ্ডো বলল ।

—আর থাকা...

—কেন গো ? ও, সেই কাণ্ড ! আরে, দূর দূর । নাও, সিগারেট খাও ।

—দাদা, আপনার আর কি । আপনি কাজ করেন শখে, আমরা করি প্রাণের দায়ে । বসে খেলেও আপনার টাকা বাড়তেই থাকবে, কমবে না ।

—দেখ-শুনে বাবা ঠিক করতে হয় গো, হাঃ হাঃ, তোমরা পারনি, পস্তাচ্ছ।
আমল ঘটনা হচ্ছে এত পরিশ্রম করেও মোটা হওয়া ঠেকানো যাচ্ছে না, পাশ্চাত্যগাচ
ছুঁ ডিঙনো পর্যন্ত পাত্তা দিতে চায় না গো। হাঃ হাঃ।

ব্যাণ্ডোকে খুশি করার জন্তু নিলয়ও তার হাসির সঙ্গে হাসি মেলান।

—আই নিলয়, একখানা দারুণ ব্রু আছে, দেখবে? ব্যাণ্ডোর গোল গোল চোখ
দুটো টাঁকার মতো গোল দেখাল।

এই এক রোগ লোকটার। সঙ্গী নিয়ে নোংরা ছবি দেখায় ওর বিশেষ আনন্দ।
ও বলে যাদের রুচি তারা ব্যাণ্ডোর কাছে ঘুরঘুর করে। নিলয়ের ভাবতেও ঘেন্না
হয়। কিন্তু ব্যাণ্ডোর মতো পয়সাওলা ক্ষমতাওলা লোককে তা মুখের ওপর বলার
সাহস ওর নেই।

—আজ থাক দাদা, আরেকদিন হবে। আপনার কাছে এসেছিলাম বিশেষ
দরকারে...

—তা ঠিক, তা ঠিক, ব্যাণ্ডো মাথা নাড়তে লাগল, তোমার বেমন ফিগার তেমনি
চমৎকার ফিগার নিনার, ঘরে একখানা বড় আয়না থাকলেই হল, বাস, হেঃ হেঃ!

নোংরা ইঙ্গিত জালা ধরাচ্ছে নিলয়ের মাথায়, কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই।

—বলছিলাম কি দাদা...

—কি বলছিলে?

—সেদিনকার স্যাটিংয়ের কিয়গলো আপনার কাছেই আছে... যদি প্রোজেকশন
করে দেখান...আমি বুঝতে পারছি না...লোকে নানারকম আজ-বাজে গল্প
বটাচ্ছে...। নিলয় খতিয়ে খতিয়ে বলল।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডেও ভাবল ব্যাণ্ডো—ঠিক আছে। দেখাচ্ছি
কিন্তু ওনলি ফর ইওর স্যাটিসফেকশন। কেউ যেন না জানতে পারে।

—আমি ওয়ার্ড দিচ্ছি।

—বসো।

ব্যাণ্ডো উঠে থপথপ করে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল বড় কালো একটা ট্রান্সের সামনে
অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে কি যেন বলল।

খুটখুট করে কয়েকটা শব্দ। এডিটিং রুম অঙ্ককার। প্রোজেকটর থেকে আলো
গিয়ে পড়ল স্ক্রিনে। কিরকির শব্দ হচ্ছে প্রোজেকটরের। পর্দার ওপর ভেসে উঠল

সেদিনের দৃশ্যটা। আলাদা আলাদা শটগুলোকে স্থলর জুড়েছে ব্যাণ্ডো। কিন্তু ব্যাণ্ডোর
হাজের তারিফ করা বা দৃশ্যটা উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা নয় নিলয়ের।

ঘরের আলোগুলো জলে উঠল।

—কি দেখলে গো? ব্যাণ্ডো জিজ্ঞেস করল।

—বুঝতে পারলাম না।

—কি বুঝতে পারবে, ব্যাণ্ডো হাসল, এ বাবা যাত্রা-থিয়েটার নয় গো। হাওয়ায়
হাত চালালে লোকে ধরে নেয় ভীষণ মার হচ্ছে। সিনেমার আসল নকল এক হওয়া
চাই। দাঁড়াও, দাঁড়াও। গোপাল, আরেকবার চালাও শেষের দিকটা, একদম ডেড
:স্না স্পীডে।

আবার ঘর অন্ধকার। পর্দার ওপর আলো।

দ্রুত ছবিগুলো সরে যাচ্ছে পর্দার গা বেয়ে।

—ও. কে। স্নো, ডেড-স্নো। ব্যাণ্ডোর গলা।

ব্যালো নাচের দুই-তর্কের মতো দেখাচ্ছে অরুণকুমার আর নিলয়কে। ডান
হাতটা অরুণকুমারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল নিলয়। হাতটা পালকের মতো
ভাসতে ভাসতে সরে গেল পেছনে। কান-ঘাড় বেকানো, দারুণ জ্বাঝে ঘুমি চালানোর
ভঙ্গিতে। নিলয়ের চোখে পলক পড়ছে না। সিনেমারই চর্চাচিত্রায়িত ডান হাতটির
ওপর সমস্ত মনোযোগ একটা বিস্মৃতে স্থির হয়ে আছে। আবার পালকের হাতটা
অর্ধবৃত্তের পথে ভাসতে ভাসতে এসে অরুণকুমারের পেটে লাগল।

—স্টপ। ব্যাণ্ডোর হাঁক।

মুহূর্তটা কয়েক সেকেন্ডে স্থিরচিত্র হয়ে রইল পর্দার ওপর।

—মুভ অন।

অরুণকুমারের মুখে যন্ত্রণার আশ্চর্য এক্সপ্রেশন। দুটো হাত স্নো মোশনে নেমে
এল তলপেটে, শরীরের ওপর দিকটা হাওয়া কাটতে কাটতে ঝুঁকে পড়ল টেবিলের
ওপর।

—ও. কে।

আলো জ্বলল। ব্যাণ্ডো এসে বলল চেয়ারে।

—যা চেয়েছিলে পেলে? ব্যাণ্ডো বলল ডুম্মার থেকে ছুঁইস্বর বোতল বের করতে
করতে। বোতল থেকে সরাসরি গলায় ঢেলে দিল জলের মতো। চোখ কুঁচকে
পাতলা জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। বোতলটা চুকিয়ে রাখল ডুম্মারে।

—না, বুঝতে পারলাম না, বুঝতে পারলাম না। স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ
করল নিলয়।

—দেখ বাবা, বুঝতেই যদি পারবে লোকে তাহলে তোমাদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি
করার দরকার হত না। ইউ মার্গেট অ্যাক্ট ইন রায়াল-লাইফ ম্যানার, ওনলি উইদাউট
আ রায়াল-লাইফ এফেক্ট। ছোট ইজ হোয়াট ইউ আর পেড ফর।

—চলি ব্যাণ্ডোনা, নিলয় উঠে দাঁড়াল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—নীড নট মেনশান, ব্যাণ্ডোও উঠে দাঁড়াল, নিনা কেমন আছে?

—ভালো।

—তোমার চোখ আছে বাবা...ও রকম ফিগার...নীল নির্জনে গুর একটা হেই.
যাওয়ার মিড-শট! ছিল...এডিট করার সময় বারবার প্রোজেকশন করে দেখেছি
তুলনা হয় না... হেঃ হেঃ।

স্বামী হিসেবে নিলয়ের পক্ষে অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যাণ্ডোর কথাগুলোও তার মনে
কোনো দাগ ফেলছে না।

লাবোরেরটির দরজা পবন নিলয়কে এগিয়ে দিয়ে অশাব্যব সৌজন্য দর্শন
ব্যাণ্ডো—ডোনট ওয়ারি।

—থ্যাংক্‌স্‌।

বাইরে চড়া বোদ কাঁ কাঁ করছে। মানুষজন বিশেষ নেই পথে। নিলয় বোদের সব
দিয়ে নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের মতো হেঁটে যেতে লাগল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে
সে কি সত্যিই আঘাত করেছিল অরুণকুমারকে? নিজেকে মেন সে বিশ্বাস করতে
পারছে না। মনের কোনো গোপন ইচ্ছা কি সেই মুহূর্তে তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল
সমস্ত টেকনিক্যাল স্কিল? যদি তাই হয়, সেই ইচ্ছার চেহারাটা কেমন? তার তে
জানা নেই। মনের মনো হাতড়ে বেড়াতে লাগল নিলয়।

দরজা খুলে দিলেন মা। নিলয় অবাক শুধু নয়, মায় শীর্ণ অস্থূল চেহারা দেখে
নিমেষে অল্প চিন্তা উধাও হয়ে গেল মন থেকে।

—মা, তুমি! মাগো, এ তোমার কি চেহারা হয়েছে!

—তোমার কাছে থাকতে এলাম নিলু। তাড়িয়ে দিবি না তো বাবা? বলতে
বলতে কেঁদে ফেললেন মা।

মাকে ছড়িয়ে ধরল নিলয়।—তুমি কি বলছ মা !

নিলয়ের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মা। মাকে প্রহ্ন করে নিলয় তার দুঃখ বাড়াতে চাইল না। সে বুঝতে পারছিল। মা বড় দুঃশময়ে এসেছেন। তবু যেন মাকে বুকের আশ্রয় দিতে পেরে সে সহসা খুব সাহসী ও নিরুদ্বেগ বোধ করল। মা তার বড় আপন, সবার চাইতে আপন। কতদিন মনে মনে চেয়েছে মাকে তার কাছে নিয়ে আসতে। প্রত্যাখ্যানের ভয়ে সে চেষ্টা করতে পারেনি। মা আজ নিজে থেকে এসেছেন। বড় সুখের দিন আজ।

—কান্না রাখ তো মা, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নিলয় বলল, ওরা আশুক, আজ আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দ করব। লক্ষ্মী মা আমার।

মায়ের মুখে হাসি ফুটল। তিনি উঠে গিয়ে স্নাটকেস খুলে একটা ছোট পুঁটুলি বের করে এনে নিলয়ের হাতে দিয়ে বললেন—সাবধানে রেখে দে।

—কি আছে মা এতে ?

—আমার গয়না।

নিলয় গুটিয়ে গেল।—না আনলেই পারতে মা।

মা হাসলেন—এগুলো তোর বাপ-ঠাকুরদার দেয়া নয়। আমায় বাবা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। আমার নাভবৌকে আমি দিয়ে যাব নিজের হাতে।

—তাহলে কিন্তু বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে ॥

—করব।

কয়েক ঘণ্টার তিক্ত স্মৃতি মুছে গেল নিলয়ের মন থেকে।

৭

বাস-স্টপ থেকে দূরত্ব বেশি নয়। মিনিট পনেরোর হাঁটা পথ। নিনার ইচ্ছে ছিল হেঁটে যাবার। সাইকেল রিকশা আজকাল তিন টাকার কমে যায় না। তিন টাকার দামও এখন ওর কাছে অনেক। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করার মানসিক প্রস্তুতি ওর আছে। কিন্তু ভাবিয়ে তুলেছে নিলয়। যতটা দুঃসাহসী ওকে ভেবেছিল নিনা, প্রথম আঘাতেই দেখা যাচ্ছে ও তা নয়। সাজানো সংসারের ভালোবাসা-স্বপ্ন হারানোর ভয়ে ও যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নিনা কিন্তু মোটেই ভেঙে পড়েনি। ওকে অভাবের মধ্যে থেকে, অভাবের নিত্যদিনের উলঙ্গ চেহারা দেখতে দেখতে, তাব

বিরুদ্ধে ঢাল-তলোয়ারহীন নিখিরাম সর্দারের লড়াই করতে হয়েছে। নিলয়ের যুদ্ধ ছিল অস্বরকম। সচ্ছল সংসারের একজন হয়েছে নিজেকে তার অংশীদার ভাবতে না পারার দুঃখই ছিল তার আসল। যাকে আজন্ম দেখা যায়, যেমন অভাবকে দেখেছে নিনা, তাকে আর তেমন ভয় করে না মাহুষ। নিলয় অভাবকে সেভাবে দেখেনি।

রিকশায় বসে এইসব ভাবছিল নিনা। রোদের দাপটে চারপাশ বিমিস্রে পড়েছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে বাবুসোনা। কপাঁ মুখ লাল। আঁচলে ওর মুখ মুছিয়ে দিল নিনা। বাবুসোনা আপত্তির শব্দ তুলল—না, না...

রিকশা নিয়ে ভালোই করেছে। হেঁটে এলে বেচারার আরো কষ্ট হত।

—এই তো এসে গেছি সোনা। নিনা বলল।

মুখচেনা রিকশাওয়ালা রিকশা চালাতে চালাতে বলল—আপনি আর সিনেমায় নামেন না দিদিমণি ?

বিরক্তি চেপে নিনা বলল—না।

—জামাইবাবু কি করে দিদিমণি ?

এ ধরনের প্রশ্ন রিকশাওয়ালার মুখে মানায় না। কিন্তু কলোনিয়রই ছেলে। জন কত সম্পন্ন মাহুষকে বাদ দিলে এখানে জীবিকার বাবধানে সম্পর্কের বাবধান তৈরি হয় না। এটাই তো ভালো—নিনার মনে হয়। কিন্তু রিকশাওয়ালার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া যে অসম্ভব।

—চাকরি করে। নিনা বলল।

—সুণ্টুদা যে বলেছিল ফিল্মে কাজ করে।

সুণ্টু নিনার ছোড়দা। মনে মনে ছোড়দার ওপর ভীষণ রাগ হল নিনার। কি দরকার ঘরের খবর বাইরের আজ্ঞে-বাজ্ঞে লোককে বলে বেড়ানোর ? সিনেমায় কাজ করা যেন খুব বাহাদুরি। এরাই বোধ হয় দাদাদের বন্ধু-বান্ধব !

নিতান্ত অনিচ্ছায় উত্তর দিল নিনা—আগে করত। এখন করে না।

—ও, আপনি শুনেছেন...? কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল রিকশাওয়ালা।

নিনা জানতে চেয়ে ওকে আরো প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে চাইল না।

—আপনাকে খুব কম দেখি। রিকশাওয়ালা তবু খামতে নারাজ।

—দূরে থাকি। বেশি আসা হয় না।

—গরিবমাহুষ এখানে আর থাকতে পারবে না দিদিমণি, রিকশাওয়ালা তার বৃত্তান্ত নিনাকে শোনাবেই, ষতদিন দখলী জমি ছিল কেউ কিনতে চাইত না। এ সরকার

আমাদের নিজ করিয়ে দিল। বাসু, অমনি টাকাওলা লোকেরা কেনবার জন্তে ছাটাছুটি শুরু করল। শহরে জমির দাম আশি হাজার-এক লাখ কাঠা। এখানেও এখন বিশ-পঁচিশ হাজার কাঠা হয়ে গেছে। গরিব মানুষ নগদ টাকার লোভে বিক্রি করে দিচ্ছে। শুনছি নাটুদা স্তুটুদাও খন্দের খুঁজছে।

নিনা মনে মনে আঁতকে উঠল। টাকা হাতে পেলে উড়িয়ে দিতে ওদের সময় লাগবে না। তবু যা হোক মাথার ওপর একটা চাল আছে, নিজের খানিকটা মাটি। শেষ পর্যন্ত কি বুড়ো-বুড়িকে ভিক্ষের থালা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে?

—বিজ্ঞের জমি বিক্রি করা যায়? নিনা জিজ্ঞেস করল।

—তা জানি না, রিকশাওলা বলল, তবে হাতবদল হচ্ছে দেখছি। টাকা থাকলে সবই করানো যায়।

—তুমি থাক কোথায়?

—কলোনিতেই, আপনাদের বাড়ি ছাড়িয়ে আরো ভেতরে।

—তুমি কি করবে?

—না খেয়ে মরলেও জমি বেচব না। বাবা একবার উদ্বাস্ত হয়েছিল, সে কষ্ট আমি দেখোছি, আবার উদ্বাস্ত হওয়ার সাধ নেই আমার, তাতে ভিক্ষে করে খেতে হয় সেও ভি আচ্ছা। অবিশি ভিক্ষে আমাকে করতে হবে না। আমরা কোনোদিন ভদ্রলোক ছিলাম না, জাতে জেলে। বাবা দেশে জাল নিয়ে লোকের পুত্রে পুত্রে মাছ ধরে বেড়াত। কানো কাজে আমার লজ্জা নেই। এখন রিকশা চালাচ্ছি, না পোষায় সবজি নিয়ে বসে যাব, না হয় আরেকটা দেখব। ভদ্রলোক হওয়ার হাজার অসুবিধে দিদিমণি।

নিনার হঠাৎ ভালো লাগতে লাগল মানুষটাকে।

—তুমি ঠিক জান বড়দা ছোড়দা ভিটে বিক্রি চেষ্টা করছে?

—জানি। কিন্তু আমার নাম করে ওদের বলবেন না। হামলা করবে আমার ওপর। দিদিমণি, ভিটে ওদের বেচতে দেবেন না।

—আচ্ছা ভাই, বড়দা ছোড়দা কি করে বলতে পার?

—আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

রিকশাওলা বাকি পথ একেবারে চুপচাপ রিকশা টেনে নিয়ে গেল।

বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে নিনা ভাড়া মিটিয়ে দিল।

রিকশাওলা নিচু গলায় বলল—আপনার দাদাদের বলবেন না কিন্তু দিদিমণি।

—আচ্ছা, বলব না, কথা দিলাম । তোমার নামও জানি না আমি । ভয় কি ?

—নাম খুঁজে বের করতে কতক্ষণ । ওদের পাঁচ মিনিটের কাজ ।

—তুমি যেন বড্ড ভয় কর ওদের ।

—এ তল্লাটে কে না করে । হালে আরো বেশি করছে ।

রিকশাওলা রিকশা ঘুরিয়ে চলে গেল ।

মা দাওয়ান্ন বসে সেলাই করছিলেন । নিনাকে দেখে উঠোনে নেমে এলেন ।

—আম, দাছুভাই আস । নিনার কোল থেকে বাবুসোনাকে কোলে নিলেন মা
দিমার কোলে যেতে বাবুসোনার আপত্তি নেই ।

দাওয়ান্ন বসে হাতপাখার হাওয়া খেতে খেতে নিনা বলল—বাকরে দেখি না :
কই গেছে ?

তুই দাদার সম্বন্ধে ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করল না, তাদের বাড়িতে থাকা দৈবাৎ
ঘটনা ।

—স্বপ্টুরে জামিনে ছাড়াইয়া আনতে কোটে গেছে । মা মুখ নিচু করে ধরা ধর,
গলায় বললেন ।

নিনার চোখ পূরনো কালচে বাখারির বেড়া দেখা উঠোন, তুলসীতলা, বকুলগাছ,
আলকাতরা মাথানো মুলিবাঁশের বেড়ার ঘর হয়ে মায়ের মুখের ওপর এল ।

—ছোড়দারে পুলিসে ধরছে কান্ন ? নিনা জিজ্ঞেস করল ।

—লোকে ত কয় ওয়ান্ন ভাঙছে না কি করছে । অগ পাটির লোকেরা কয় অগ
পাটিরে বিপদে কালানের লাইগা মিথ্যা দোষ দিয়া ধরছে । আইজ নাষ্টু, অগ পাটির
লোকেরা মিছিল কইরা কোটে গেছে স্বপ্টুরে ছাড়াইয়া আনতে । তোর বাবারেও সঙ্গে
লইয়া গেছে ।

—দাদারা আবার পাটির লোক হইল কবে ?

—হইছে । কয় মাস হইল হইছে ।

—হইয়া লাভ ?

—আমি হের কি জানি । বুঝি না এ হগল ।

বোঝে না নিনাও । বাবার কাছ থেকে শুনেছিল বড় বড় দেশ-নেতাদের
কাহিনী । তাঁরা সবধ ছেড়েছেন, হাশতে হাশতে দেশের জন্ত জীবন দিয়েছেন, সহজ

স্বথ ছেড়ে কঠিন দুঃখকে সঙ্গী করেছেন। রাজনীতি-করা মানুষদের সম্পর্কে নিনাও মনে তাই ছিল শুধুই শ্রদ্ধা।

কিন্তু গত আট-দশটা বছর তার ধারণাগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যাতে জায়গা হওয়া উচিত জেলখানায় তাদের অনেকেই কি এক অসুস্থ কায়দায় নেতা হয়ে বসেছে। অশিক্ষিত গুণ্ডা-বদমাশ খুঁজে লুটেরাদের চরিত্রবান সাকা মানুষ বলে সার্টিফিকেট দিতেও বাধে না সমাজের উচ্চশিক্ষিত মাথাবাদের। ডাকসাইটে গুণ্ডা হয়ে যায় নেতাজীর যোগ্য ভাবশিষ্ট—মাথাওলা নেতার বয়ানে। নেতার মতে ইনি নাকি বিপথগামী যুবশক্তিকে স্থপথে ফিরিয়ে আনায় অবিশ্বাস কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্থপথে ফিরে আসা যুবশক্তির দাপটে অবশ্য পাড়ার লোক ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে। টালিও ঘরের বাসিন্দা নেতাজীর ভাবশিষ্ট নিজেই দোতলা বাড়িতে উঠে খান। ক্রমে ক্রমে ছুঁখানা মিনি, একখানা বাস, তিনটি দোকান।

এসব নিজের চোখে দেখেছে নিনা, জেনেছে এও রাজনীতি, কিন্তু বাবার কাছ থেকে পাওয়া সামান্য শিক্ষায় এত গভীর এবং জটিল রাজনীতি সে বুঝতে পারেনি। অতএব দাদাদের রাজনীতি করাও তার বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

—মরুক গিয়া, নিনা বলল, শো-লাম ওরা নাকি ভিটা বেচনের তাল করছে।

—তুই শুধু কই ?

—শুনছি। সত্যি ?

—কইছিল দুই-চার বাপ। তোর বাবার মত নাই।

—দলিল বাবার নামে। বাবায় যান কোনোমতেই রাজী না হয়।

—আমারও মত নাই। তবে ওরা কইতে আছিল বেচলে যাইট-সত্তর হাজার টাকা পাওন যাইব। গ্রামের দিকে গেলে দশ-বারো হাজার টাকায় থাকনের জায়গা হইয়া যাইব। বাকি টাকা দিয়া ওরা ব্যবসা করব।

—হ। থাকনের জায়গাও হইব না, ব্যবসাও ঘণ্টা করব। মদ খাইয়া বদমাঁশ কইবা টাকাগুলি শাষ করব। তোমাগরে বাস্তায় নামাইব। অগরে আমি জার্ন। খবরদার মা, রাজী হইও না। টাকাটা রাখ।

বাগ থেকে ছুঁখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে মা'র হাতে দিল নিনা।

মা অকুণ্ঠ হাতে নিলেন। মেয়ের মারফত এলেও জামাইয়েরই বোজগারের টাকা। মাসে মাসে হাত পেতে এ টাকা নিতে প্রথম দিকে বাধো বাধো ঠেকত। আপত্তির ছ'একটা শব্দও উচ্চারণ করতেন। তারপর বেমানান লজ্জাকে প্রকাশ দেয়া ছেড়েছেন।

একশো টাকা কম নয়, দিন দশেকের ডালভাতের সংস্থান। স্বামীর সৎ উপার্জনে তাঁরা দাবি আছে, সে দাবি স্বামী সম্পূর্ণই মেটান, কিন্তু তাতে দশ কিলো চালের দামও হাঁকিনা সন্দেহ। ছেলেদের নোংরা টাকায় হাত দিতে তাঁর আপত্তি, মুখ ফুটে চানও না তবে দিলে ফিরিয়ে দেবার সাধ্যও নেই। অনটন সে সাধ্য তাকে দেয়নি। তিনি গৃহিণী, স্বামী-সন্তানের সামনে ভাতের খালা ধরে দেবার দায়িত্ব ঘে তাঁরই।

মা টাকা রাখতে ঘরে গেছেন।

সূর্য হলে পড়েছে পশ্চিমে। উঠোনে গাছের ছায়া। ফুবফুরে হাওয়া আসছে থেকে থেকে। ক্লাস্ত বাবুসোনা মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা হাড়-জিরজিরে গরু হেঁটে যাচ্ছে মেটে রাস্তা দিয়ে। সারা গায়ে শুকনে পোবর, পিঠের ওপর লাল দগদগে ঘা। দুধ দেবার ক্ষমতা নেই বলে মালিক হয়তে খেদিয়ে দিয়েছে।

মা এসে বললেন—তুই খাবি ত ?

—তুমি খাও নাই ?

—ভাবছিলাম ওরা আইলে খামু।

—কখন আইব কইয়া গেছে ?

—না...কয় নাই...তবে...। মা থমে থমে বললেন।

নিম্না হাসল।

—হাসছ কান্ ?

—পোলাগ লাইগা দরদ দেইখা হাসি।

—তোর বাবায়ণ ত খায় নাই।

—বাবার লাইগা অত দরদ তোমার নাই।

মা হেসে বললেন—তোর কার লাইগা দরদ বেশি, দাছুভাইয়ের লাইগা ন জামাইয়ের লাইগা ?

—তোমার পোলাগ মতন হইলে পোলার লাইগা দরদ আমার থাকব না।

—কওন সোজা। ভগবানেরে কই তোয় পোলা ঘান আমার পোলাগ মতন ন হই। কিন্তু হইলে কালাইতে পারবি না।

—আমি পারম।

—নারে মা, পারন যায় না। ওগরে আমরা কি দিতে পারছি ? লেখাপড় শিখনের ব্যয়োগ পাইল না, কামকাজ পাইল না...হগলই কপাল রে মা...

—কপালের দোষ দেও কান্ মা? ওরা ত এখন পোলাপান না। কলোনির কত পোলা বিকশা চালাইয়া, চায়ের দোকান দিয়া, হাতের কাজ শিখ্যা পেটের ভাত জোগাড় করতাছে। না মা, তুমি ওগ হইয়া সাফাই দিও না।

মা বিব্রত হয়ে চুপ করে গেলেন।

নিনা ব্যাগ থেকে হরলিক্সের শিশির আধ শিশি ছুধ বের করল। এখনই আসে বাবুসোনার জন্ম ও ছুধ নিয়ে আসে। ছুধ চেয়ে মাকে লজ্জা দেয় না :

—ছুধ গরম কইরা দেই? মা জিজ্ঞেস করলেন।

—পরে দিও। ঘুম খেইকা গুঠুক।

—তুই খাইয়া ল।

হাতঘড়িতে সময় দেখল নিনা। সওয়া একটা।

—আরেকটু দেখি, বাবায় আসে নি...। তুমি বস, আমি বর' তুইটা চাউল বসাইয়া দেই।

উঠতে যাচ্ছিল নিনা, মা বাধা দিলেন :

—ভাত রাঁধন লাগব না। চাইর জনের মতন রাঁধছি, হইয়া যাইব। করুণ সলজ্জ দেখাল মা'র মুখ।

মা'র মুখ দেখে একটা কঠিন শব্দ নিনার জিভের ডগা থেকে অন্বচ্চারিত ফিরে গেল।

নিজেকে থিতোবার সময় দিয়ে ও বলল—মাগো, তোমায়ে দেইখা কষ্টও হয়, রাগও হয়। যা-ই কর মা, পোলাগ পরানর্শে ভিটামাটি যান বেইচা দিও না।

দু'জনের বলার কথাগুলো সহসা যেন ফুরিয়ে গেল। গ্রীষ্মের কিম-বরা কলোনির ছপূর আকস্মিক ক্লাস্ত নীরবতার মধ্যে ঠেলে দিল মা-মেয়েকে।

নিনার নিটোল আঙ্গ-বিধাসে প্রব্লেব আঁকাবাঁকা চিড়গুলো ফুটে উঠছিল। কে কার জন্ম কতখানি স্নেহ-ভালোবাসা বৃকে নিয়ে বসে আছে তার সঙ্গে কারো মাল্লখ হওয়া না-হওয়ার সম্পর্ক খুবই কম। মাল্লখ সাবালক হওয়ার পর তার দরকার একটা আঙ্গ-বিধাসের জমি—যেখানে দাঁড়িয়ে সে নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতা বাজিয়ে নিতে পারে। এ দেশে ক'জনের ভাগে সেটুকু জোটে? দাদারা গোল্লায় গেছে। গোল্লায় যাওয়ার রাস্তাগুলো আছে কেন? যাদের হাতে ক্ষমতা তারা দু'দিনে বন্ধ করে দিতে পারে। নাকি ক্ষমতা রাখতে গেলে এ রাস্তাগুলো খোলা রাখতেই হয়, নতুন রাস্তাও খুলে দিতে হয়। রাস্তা ছাড়া মাল্লখ চলতে পারে না, বাচতে পারে

না, তা সে যাস্তা যেমনই হোক। শোজা শক্ত বকবকে তকতকে যাস্তা মাল্লব নিজের চষ্টায় ভৈরি করে নিতে পারে না, একজন-ছ'জন বাহাহুরকে দিয়ে দেশের বিচার হয় না। বিকশাওলা ছেলেটা যতই বলুক বড় গলায়—সে খাটতে পিছপা নয়, পেটের ভাতের জোগাড় সে করবেই—কিন্তু শুধু তাতেই কি মানুষের আশ্র-বিধানের জমি তৈরি হতে পারে? মানুষ মানুষের মতো হয়ে উঠতে পারে? পেটের ভাত জোগাড় করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হলে মানুষকে বড় হতে বলা, সং হতে বলা আহামুকি, না হয় বদমায়েশি।

দাওয়ার থেকে দেখতে পেল নিনা নাট, আসছে। পা ফেলা দেখেই বোঝা যায় মেশা করেছে ভালোমতোই। কাছে আসতে জড়ানো গলায় গানও শোনা গেল। হরদম-শোনা হিন্দি গান। বন্ধ মাতাল নাটু।

বাথারির পেট সবিয়ে আছাড় খেতে খেতে সামলে নিয়ে উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়াল নাটু, ছ'পা ফাঁক করে—সম্ভবত বালাঙ্গ ঠিক রাখার জন্য। টালমাটাল মাথাটাকে অতি করে শোজা করে চোখ কঁচকে তাকাল নিনার দিকে।

তারপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল দাওয়ার ওপর।

—হ্যাঁ মেরে বহেন, মেরে পেয়ারি ছোট বহেন, বহু দিন তুমকো দেখা নেহি...

—আঃ ছাড়, ছাড়, নিনা হাসবে না কঁাদবে ভেবে পেল না, এই বড়দা, ছাইড়া দে...

কি চেহারা হয়েছে নাটু! অর্থাৎ-অত্যাচারে নষ্ট মানুষের মুখ। স্টুডিও প্যাডায় ঘোরাঘুরি করার সময় এ ধরনের মুখ বহু দেখেছে নিনা। দেখলে ঘেন্না করে, শিক্তি লাগে।

নাটুর মুখের বাঁজালো মদের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে নিনার।

—সরা, হাত সরা, জোবে ঠেলে কাঁধের ওপর থেকে নাটুর হাত সবিয়ে দিল ও, চিঃ, লজ্জা করে না তোব ছোটলোকের মতো মাতলামি করতে...

—লজ্জা! কিসের লজ্জা? যা খেলে আরাম হয় তা খেতে লজ্জা হবে কেন ছোট্ট বোনটি আমার? ছোটলোক? ভদ্রলোকরা যত মদ খায় ছোটলোকেরা তার আন্দেকও পায় না। আরে বাবুসোনা, মাই ওনলি একমাত্র ভাগ্নে...চলে আও নোটো মরা কোলমে আও! বাবুসোনার দিকে এগোল নাটু।

মা আড়াল করে দাঁড়ালেন।—রোঁদে পুইড়া আইছে। ওবে ঘুমাইতে দে।

—বহোতাছা। ঘুমোও, ঘুমু কর, লক্ষ্মী ছেলে, ঘুমু কর বাপ আমার।

—হুট, আইল না? তোব বাবায় কই? মা জিজ্ঞেস করলেন।

-বাবা ? বাবা কোর্ট সে গিয়া খান্দামে । স্মটুকে জামিন দিল না । আমাদের উকিল কত করে বলল হাকিমকে । শালা নট নড়নচড়ন । দশদিন পরে আবার যেতে বলেছে । বলে কিনা স্মটু ওয়াগন ভেঙেছে, পুলিশের সঙ্গে পেটোবাজি করেছে । আমাদের উকিল কত বোঝাল, স্মটুর মতো ছেলে হয় না, হাঃ হাঃ, পুলিশ নিশ্চয় ভুল করে কাকে ধরতে কাকে ধরেছে । বাপরে বাপ, শালায় ম্যাজিস্ট্রেটের কি গৌ । বলে, আপনারা যা-ই বলুন ছাড়া হবে না । আমরা বাইরে এসে এক ঘণ্টা ধরে স্লাগান চাঁচালাম, কমসে কম ছুঁডজন পেটো ছুঁডলাম । আমাদের লীডার দেবব্রত গাঙ্গুলি শালা কি কাটানো বক্তৃতা করল, কিস্তি হল না । স্মটু আবার জালে-ঢাকা গাড়িতে করে শঙ্করবাড়ি চলে গেল । তবে গ্যা, আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, লেকচার দিয়ে বলে দিয়েছি, আমি যদি যুবনেতা নাটু রায় হই তাহলে স্মটুকে আমি বেকসুর খালাস করে আনবই । কোর্ট যদি না ছাড়ে আমরা পেটো ঝেড়ে কোর্টই তুলে দেব ।...সিলে'রি বিনা চাটনি কায়সে বনি...

গানের সঙ্গে নাচের যুকনি দিতে গিয়ে উঠোনে জমড়ি খেয়ে পড়ল নাটু । উপুড় হয়ে পড়েই রইল মড়াব মতো ।

গা-ঘিনঘিন করছে নিনার । মা'র কাছে দাদাদের উৎপাতের বিবরণ ও শুনেছিল, নিজের চোখে দেখেও ছেলে অল্পস্বল্প । কিন্তু এ রকম দৃশ্য এই প্রথম । লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে । পালাতে পারলে বাঁচ । কিন্তু না খেয়ে চলে গেলে মা কষ্ট পাবে ।

নাটু উঠে বসেছে । হাতে ভর দিয়ে বুকে বসে আছে উঠোনে ।

—মাতাল, ছোটলোক, হঠাৎ জ্বল উঠল নিনা, যুবনেতা হইছে না আনার মাথা হইছে । ছোটলোক, গুণ্ডামি কইগে বেড়ায়...খাইটা খাইতে পারস না, রিকশা চালাইতে পারস না ? চোর, গুণ্ডা...বাবার মতো মানুষের তোরা...

—এই, চেপ, চোপরাও... টলমলে মাথা তুলে চোখ পাকিয়ে বলল নাটু ।

—কান্ চূপ করুম ? তোর ভয়ে ?

—আলবৎ আমার ভয়ে ।

—এক আপলার মুরোদ নাই আবার ভিটা বিক্রি করনের ফিকির করতা:ছ ।

ছুতিন বায়ের চেষ্টায় ঝাঁক সামলে উঠে দাঁড়াল নাটু । টলতে টলতে এগিয়ে এল নিনার সামনে । মুখের সামনে আঙুল উঠিয়ে বলল—কে বলেছে তোকে বিক্রি করছি আমি ? মা ? এই মা, তুম বোলা কেয়া ?

হতভঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা। ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করছিলেন না। মাতাল নাটুর চেহারা তার চেনা, সামলাতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছেন বহুবার।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে দাঁড়ায় থেকে উঠেনে নেমে এল নিনা। নাটুর সামনে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় বলল—মারে ভয় দেখাস নাকি তুই? ভোগ মতন জানোয়ারের লাইগা ভাত রাঁইধা বইলা থাকে...সেই মায়েরে তুই রাঙা চউখ দেখাস? ভিটা বিক্রির চেষ্টা কইরা দেখ্ তুই, কি হাল করি তোর আমি...

নাটুর মুখ-চোখে নেশা সরিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে প্রচণ্ড রাগ।

—বেশ করব, বিক্রি করে দেব। বাবা রাজী না হয় পেদিয়ে রাজী করাব। কি করবি, কি করবি তুই?

—কি বললি, কি বললি তুই হারামজাদা, বাঘিনীর মতো গর্জে উঠল নিনা, নিজের হাতে তোর গলা কাইটা আমি ফাঁসি ষায়ু। এর লাইগা লোকের গাইল শুইনাও আমি ভোগ লাইগা খাইটা মরছি? তোরা আমার বড় ভাই হইয়াও কি করছস বাবা-মা'র লাইগা? কইরা দেখ্ বাবা-মা'রে ভিটা-ছাড়া করনের চেষ্টা, যত বড়ই যুবনেতা হ আর ওয়াগন-ভাঙার সর্দার হ আমি ছাড়ুম না।

ধরখর করে কাঁপছে নিনার লবাক। নাকের বাঁশি ফুলে ফুলে উঠছে। রাগে দুঃখে বিক্ষাণিত চোখে জল এসে গেছে।

বোনের অচেনা রুদ্রমূর্তির সামনে মিইয়ে গেল নাটু। বিড়বিড় করতে করতে পিছিয়ে গেল পায়ে পায়ে—মুরোদের খোঁটা দিচ্ছে! যা যা, বিয়ে তো করেছিল একটা চায়শো বিশকে, তার আবার বড় বড় বাতেলনা। ফিলিমে কাজ করে! ঘোড়ার ডিম করে! একটা ছবিতেও শালাকে দেখলাম না।

গঙ্গগঙ্গ করতে করতে বেড়ার ধারে বসে পড়ল নাটু।

নিলয় সম্পর্কে ওর মস্তবাগুলো নিনার কানে পৌঁছেছে। বুকের ভেতর থেকে দারুণ ক্রোধের জ্বালা হঠাৎই উড়ে গেল বুকটাকে ফাঁকা করে দিয়ে। নিনা কখনো বলেনি ওদের নিলয় কি কাজ করে সিনেমায়, কোথায় যেন বেবেছে। বলতে পারেনি যে নিলয় অনেক কিছই করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নিজের সমস্ত শক্তি সাধ্য সততা উজাড় করে দিয়েও করে। অথচ নাটু তার দুর্কর্ম বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়, আর নিলয় তার কৃতিত্বের সামান্ত প্রমাণও দিতে পারে না কাউকে। স্বামীর জন্তু নিনার গর্ভও বুকের চার দেয়ালের মধ্যেই বন্দা থাকে।

ঠোট কামড়ে ঘুবে দাঁড়াল নিনা। নিলয়ের লঙ্কায় নিজের লঙ্কায় হঠাৎ-আসা চণ্ডাল রাগটাকে ও ক্ষমা করতে পারছে না। এমন কখনো হয়নি। এভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ঘটনা ও স্মরণ করতে পারে না। কেন এমন হল ?

বাবুসোনা কখন জেগে উঠেছে। বসে বসে চোখ বগড়াচ্ছে হাতের উলটো পিঠে।

নিনা ওকে কোলে নিল। দাঁড়ায় ওপর থেকে ব্যাগটা নিয়ে কাঁধে ঝোলান।

—আইজ যাই মা।

—খাইয়া যা স্বরো। ভীক গলায় মা বললেন।

—আইজ না মা।

অসহায় করণ চোখে তাকিয়ে রইলেন মা।

নিনা রাস্তায় পা দিল।

পেছন থেকে নার্টু চোঁচাচ্ছে—মাপ কর দে বহেন, স্বরো, আয়, স্বরো...

নিনা ফিরে তাকাল না।

৮

মা শুধু দেখলেন নিনার ক্লান্ত শুকনো মুখ, বাবুসোনা কাদা হয়ে আছে মায়ের কোলে।

—মা রোদ বোমা, মা বললেন, বিকেলের দিকে বেরলেই পারতে।

—অনেকদূর মা, বিকেলে বেরলে ফিরতে রাত হয়ে যায়। নিলয়ের বাড়ানো হাতে বাবুসোনাকে দিয়ে নিনা বলল।

চৌকিতে বসল নিনা। নিলয় পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিল।

—বাবুসোনাকে মা'র কাছে রেখে যেতে প'রতে। নিলয় বলল।

—মা তাহলে তিষ্ঠোতে পারতেন না। ক'টা দিন যাক, তখন ঝামেলা করবে না।

বাবুসোনা নিলয়ের কাঁধে মাথা রেখে চুপচাপ। ঘুমোয়নি যদিও।

মা দেখেছেন বৌমার ক্লান্তি, শারীরিক কষ্ট। নিলয় দেখেছে তার বেশি।

—তুমি চান করবে তো ? নিলয় জিজ্ঞেস করল।

—ই্যা।

—তাহলে তুমি চান করে নাও। আমি বাবুসোনার মুখ-টুখ মুছিয়ে, জামা-ইজের পালটে, দুখ খাইয়ে দি।

—দাও ।

—আমাকে দে না নিলু, মা বললেন, আমি করে দিচ্ছি ।

—তুমি পারবে না মা । নিলয় বলল ।

—না, মা পারবেন না, নিনা হাসল, তুমি পারবে ! তোমাদের মাহুঘ করেনি মা ।

—আমি তা বলিনি, মা'র শরীর ভালো নয় তা-ই ।

—ষাই, চানটা সেরে আসি । নিনা বলল ।

—আরেকটু বসে যাও বৌমা, মা বললেন, গায়ে ঘাম না শুকোতে চান করলে সর্দিগর্মে হয়ে যেতে পারে ।

নিনা উঠতে যাচ্ছিল, মায়ের কথায় বসে পড়ল আবার ।

—যাক, এখন আর অবাধতা করতে পারবে না । নিলয় সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করল ।

—দেখছেন মা, নিনা মায়ের গা ঘেঁষে এল, মিছেমিছি আমার পেছনে লাগছে । এট, আমি তোমার অবাধা ? কথা শুনি না ?

—শোন, শিচয়ই শোন, তবে বড় বড় ভারি ভারি কথা । ছোটখাট হলে শুনতে চাও না । এই না, না, মায়ের অত কাছে না । মাকে দখল করার মতলব ছাড় ।

—বেশ করব, দখল করব, ঠেকাও দেপি তুমি । নিনা জড়িয়ে ধরল মাকে ।

—ইস, ঘেমা গায়ে জড়িয়ে ধরে দিলে আমার সুন্দর মাটাকে নোংরা করে ।... এ কি মা, তোমার চোখে জল কেন ?

আঁচলে চোখ মুছে মা বললেন—কই না তো...

নিলয় নিনা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে নির্বাক হয়ে গেল । মায়ের কান্না বোঝার সাধা ওদের ছিল না ।

যে বেদনার ইতিহাস আনন্দের মুহুর্তেও চোখের জল ঝরায় তা শুধু মায়ের মনই জানে । এমন করে বড় ছেলের বৌ তো কোনোদিন তাঁকে মা বলে ডাকেনি, জড়িয়ে ধরেনি ভালোবাসার দুই হাতে । বড় ছেলেও না ।

বিকেল সন্ধ্যা কাটল ভারি আনন্দে—খুনহুটি গল্প-গাছা করে ।

বয়স যত বাড়ে, মাহুঘ হয়ে পড়ে স্মৃতি-নির্ভর । স্মৃতির সঞ্চল নাড়াচাড়া করেই তার আনন্দ । দুর্বল অনিচ্ছুক দেহ, নিজেকে সমাজ-সংসারের কাছে অপ্রয়োজনীয়

ননে হতে থাকার বাস্তব ও কল্পিত কারণে বর্ধমানের নিরাশ্রয় বোধ করে বয়স। তার সাক্ষ্য-আনন্দ স্মৃতি ও অতীত।

পুরনো দিনের অনেক গল্প শোনালেন মা। নিলয়ের ছেলেবেলার দুইমির গল্পই বেশি। তাতে হাসি আর রহস্যের খোরাক ছিল বিস্তর। অনেকদিন পরে প্রাণখোলা হাসির স্বযোগ পেল নিনা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বাইরের ঘরে চৌকির ওপর মাকে বিছানা করে দিল নিনা। ছ'খানাই মাত্র ঘর। এ ছাড়া গতাস্তর ছিল না।

—এমন স্বস্তি করে বিছানা কেউ আমাকে করে দেয়নি মা। শুয়ে পাশ-বালিশ টেনে নিতে নিতে মা বললেন।

বাইরের ঘরে মাকে শুতে দেয়ায় যেটুকু সংকোচ ছিল নিনার তাও কেটে গেল।

নিজেদের বিছানা ঠিকঠাক করে নিনা ইন্ধিতে নিলয়কে ছ'ঘরের মাঝখানে দরজাটা দেখাল। এতদিন এটা বন্ধ করার দরকার হয়নি।

নিলয় বাইরের ঘরের আলো নিভিয়ে দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে বাবুসোনা। ওর জায়গা ছ'জনের মাঝখানে। নিলয় সাবধানে ওকে একপাশে শুইয়ে দিল। মাঝখানে—নিনার পাশের জায়গাটা—আজ ওর দরকার।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে শোবার আগে প্রাত্যহিক চুল আঁচড়ানোর পালা মারছিল নিনা। আয়নায় নিলয়ের চোখে চোখ পড়তে ও হাসল। নিলয়কে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রেখে আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে এল।

চূপচাপ খানিকটা সময় পার করে নিলয় বলল—তোমার মা-বাবা ভালো আছেন ?

—ছোড়দাকে পুলিশ ধরেছে। হাজতে আছে।

—কেন ?

—ওদের কি কোনো গুণের কমতি আছে।

—ছাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে ?

—না। কেন, তুমি ঘাবে নাকি ছাড়াতে ?

—আমার ক্ষমতা কোথায় ?

—খাকলেও আমি তোমাকে যেতে দিতাম না। সামনের মাস থেকে টাকা দিতে ১০০ মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দিও। আমি আর ও বাড়িতে যাব না। বিরক্তিকর হলে ইতি টানার স্ববে বলল নিনা।

বাশের বাড়ি থেকে ফেরার পর গুকে দেখেই নিলয় বুঝেছিল কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। ও শক্ত ধাতের মেয়ে, কিন্তু তাই বলে আবেগের ঘাটতি নেই স্বভাবে, আর সেটা ও লুকোতেও পারে না। অন্তত নিলয়ের ভালোবাসার চোখ ওর মুখের রঙ-ফেরা ঠিকই পড়তে পারে।

নিনাকে সময় দিয়ে নিলয় বলল—আমাকে বলতে আপত্তি আছে ?

—কি হবে শুনে ? বাবা-মা'র লজ্জা অপমান শুধু চোখ চেয়ে দেখার জন্য যেতে আমার ভালো লাগে না। যদি ছেলে হয়ে জন্মাতাম...

নিলয়ের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে নিনা। নিলয় গুকে কাছে টেনে আনল, ঘাড়ের ঠোঁট ছুঁইয়ে আন্তে হেসে বলল—তুমি ছেলে হয়ে জন্মালে আমার কি দশা হত বল তো।

—মেয়ের অভাব নেই সংসারে, কেউ না কেউ জুটে যেতই। আর, না জুটলে সেটাই হত তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

—আমি তা মনে করি না। আমার যোগ্যতা যত কমই হোক, সাধামতো সংসারটাকে জেনে-বুঝে যেতে চাই। গা বাঁচিয়ে চলায় সত্যিকারের আনন্দ আছে বলে আমি মনে করি না।

পাশ ফিরে নিলয়কে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ চেপে নিনা বলল—ছি, ছি, তুমি কি ভাবলে আমি তোমার যোগ্যতা নিয়ে ইঙ্গিত করেছি ?

—আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি নাকি যে ও রকম উদ্ভূট চিন্তা করব।

নিলয়ের সোহাগের হাত নিনার নিটোল নরম বুকে আশ্রয় খুঁজে নিল।

আপত্তি করল না নিনা, একবার শিউরে উঠে আরো ঘন হয়ে এল নিলয়ের কাছে।

—তোমাকে যেন আজ বেশ সাহসী মনে হচ্ছে। কোনো ভীলো খবর আছে ? এই—এই—, নিনা শরীরের একটা মোচড় দিল, কি হচ্ছে ?

হাত সরিয়ে নিয়ে হাসল নিলয়—যা হবার...

হাসিটা একটু জ্বায়েই হয়ে থাকবে, নিনা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল—আন্তে, মনে রেখো ও ঘরে মা আছেন। অসভ্যতা একদম বন্ধ।

—অসভ্যতা বন্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে আমি অসভ্য না হলে তোমারও কি ভালো লাগবে ?

—যাঃ।

—যাক, তুমি খবর জিজ্ঞেস করছিলে। খবর ভালো না। কাজকর্মের আশা দেখছি না। ছুঁচাঁর জনের সঙ্গে দেখা হল, সকলকেই হতাশ মনে হল। ভরসা জগদীশদা।

ইচ্ছে করেই নিলয় অধীর ব্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করার ঘটনা চেপে গেল।

—কি ভাবছে ওরা? নিনা শুধোল।

—ওরা আর কি ভাববে, ভাবছে আবোল-তাবোল। আশলে ভাববার মালিকই ওরা নয়।

নিলয়ের বলার সহজ স্বরে অবাক হচ্ছিল নিনা।

—তুমি ভাবছ না?

—ভাবছি নিশ্চয়ই, কিন্তু হঠাৎ যেন কোথায় একটা সাহসের জায়গা পেয়ে গেছি। ভাবছি, তবে ভয় পাচ্ছি না। আশ্চর্য লাগছে।

নিলয়ের ঘন চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে নিনা বলল—এই তো বেশ...

—জান, মাকে পেয়ে হঠাৎই যেন আমি পালটে গেছি। সব নতুন নতুন লাগছে, আশু আশু, নরম গলায়, যেন বুকের অনেক ভেতর থেকে নিলয় বলতে লাগল, আশার মধ্যে বোধ হয় এখনো একটা বাচ্চা ছেলে বেঁচে আছে যে মাকেই মনে করে সবচেয়ে বড় আশ্রয়। অথচ মার কাছ থেকে ভালোবাসা ছাড়া এখন আর কি পেতে পারি আমরা? তিনি আমাদের সমস্তার সমাধান করা দূরে থাক নতুন সমস্তাই সৃষ্টি করবেন। হিসেবী নিলয় এটা বোঝে, কিন্তু বেহিসেবী বাচ্চা নিলয়ের কাছে যা মস্ত বড় অবলম্বন। আমি যেন ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। জান, ভাইবোনদের মধ্যে মা আমাকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। কম উৎপাত করেছি মার পরে। তারপর যখন বড় হলাম, বাবা রিটারার করলেন, বাড়ির কর্তা হয়ে দাদা আমাকে নিকস্মা-অপদার্থের সার্টিফিকেট দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল, তখনো মা আমাকে আগলে রাখতেন। মা পুর্বনো দিনের মানুষ, কিন্তু মনটা তাঁর অনেকের চাইতে নতুন, তাজা। বাবা মাকে বুঝতে পারেননি, দাদাকে বাদই দিলাম।

—তুমি মাকে বুঝতে পার বলই মা তোমার কাছে এসেছেন। জান নিলয়, আমি খুব খুশি হয়েছি। ছেলেমানুষের মতো হলেও আমারও একটা অভূত আনন্দ আছে। লোকে যখন দেখবে শুধু স্বামী নয় শাওড়িও আমাকে ভালোবাসেন, ছেলের বৌকে আপন ভেবে তার কাছে এসে থাকছেন, এ যে আমার কত গর্বের... শোন, মাকে কিন্তু কালই ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

—হ্যা, মা'র শবীরটা দেখলাম খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন। আমি প্রাণ করে ছুঁখ দিতে চাইনি। তুমি জান কি হয়েছে ?

—হ্যা, পুনি্য আমাকে বলেছে।

দাদার বাড়িতে মায়ে'র হেনস্তার বৃত্তান্ত নিনা শোনাল নিলয়কে। দরকার হলে পুনি্য যে ও'র কাছ থেকে মা'র চিকিৎসার জন্য টাকা নিতে বলেছে তাও জানাল।

—সত্যিকারের বোন আমার একটাই—পুনি্য, সব শুনে নিলয় বলল, মায়ে'র পেটের বোনেরা যে যার মতো ভালো থাকতে বাস্তু। আসলে ওদের প্রাণ মন দুইই বড় ছোট। পুনি্য একেবারে ওদের উলটে। ছেলেবেলায় ও'র সঙ্গে আমার ভাল ছিল দারুণ। সব সময় টগবগ করত, দাপিয়ে বেড়াত। বাবলুকে বিয়ে করার আগেও একটা ছেলের প্রেমে পড়েছিল। এটুকুই ও'র দোষ। নাম হয়ে গেল খারাপ মেয়ে। অথচ মাহুবে'র বিপদে ও'র মতো এগিয়ে যেতে পারে ক'জন। সকলেই ও'র সাহায্য নেয়, আবার আড়ালে গালও দেয়। পুনি্য জরু'র করে না। যারা ও'র নিন্দে করে তাদের বিপদেও ছুটে যায়। বচন শোনাতেও ছাড়ে না, কটকট করে বলে দেয় বা মুখে আসে। অদ্ভুত মেয়ে।

—সম্পর্কে বোন না হলে ওকেই হয়তো তুমি বিয়ে করত। হেসে বলল নিনা।

ঠাট্টা গায়ে না মেখে নিলয় বলল—হয়তো করতাম। তোমার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে।

—তা-ই বল, ঠাট্টার জের টেনে নিনা বলল, তুমি পুনি্যকেই ভালোবাসতে। আমি ও'র আটপৌরে নকল, আসলকে না পেয়ে নকলকে জায়গা দিয়েছি।

—তবে বে...

নিলয়ের অবাধ্য হাত দুটো নিনার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে চূ'রন্ত আক্রমণ শুরু করল।

—আন্তে, আন্তে, লক্ষীটি...

নিনা উচ্ছল সমর্পণে এলিয়ে দিল শরীর। ঠোঁট দুটো এগিয়ে দিল নিলয়ের মুখের কাছে।

ছোট ঘরটা উত্তাল সমুদ্রের মতো হয়ে গেল মুহূ'র্তে। ভালোবাসায় আগ্নিষ্ট দু'টি শরীরে রক্তের কলবোল দক্ষ শিল্পীর হাতে মেতায়ের ঝালা'র মতো বেজে উঠল।

মধ্যমলের মতো কোমল ক্লাস্তির আবে'ণ জড়ানো গলায় একসময় নিলয় বলল—ম... তোমার ছেলের বৌয়ের জন্ত বৌতুক এনেছেন।

—তার মানে ?

—দেখো কাল । আলমারিতে রাখা আছে ।

—বলই না ।

—মাকে বিয়ের সময় দাদামশায়ের দেয়া গয়না ।

নিনা অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমার বডড ভয় করছে !

—কেন ?

—অভাবের সময় যদি আমরা...

—নিজেদের ওপর সে বিশ্বাস কি নেই আমাদের ?

—আছে ।...কিন্তু...

—কিন্তু নেই নিনা । ব্যাংকে যা আছে কাল তুলে নেব । তারপর দেখা যাবে

নিনার অগোছাল চুলের অরণো মুখ লুকিয়ে চোখ বুজল নিলয় ।

বাজার সেরে নিলয় খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল ; নিনা দ্বিতীয় পেয়ালার চায়ের যোগান দিয়ে গেছে । বুকের নিচে বালিশ নিয়ে খাটের ওপর উপুড় হয়ে আছে নিলয় । সামনে খবরের কাগজ আর চায়ের পেয়ালার ।

রান্নাঘরে নিশ্চিন্তে কাজ করছে নিনা । বাবুসোনাকে নিয়ে হাঁকডাক টেচারিমাচি নেই । বাইরের ঘরে ঠান্ডার সঙ্গে সে রীতিমতো বাস্তব । বন্ধুত্বটা নতুন, তাই পরিচয় মন-জানাজানির পালা চলছে । বাবুসোনা তার বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ঠান্ডার । নেহাত প্রয়োজন না হলে মৌখিক শব্দের ব্যবহারে তার আগ্রহ কম । ঠোকাঠোকি-ভাঙচুরে যেটুকু শব্দ আর কি । মা নতুন বন্ধুর মন জয়ে নানান জারিজুরি খাটাচ্ছেন । তাতে কলও ভালোই পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে ।

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে অরুণকুমার সবে গেছে তৃতীয় পৃষ্ঠায় । পাঠকের আগ্রহের সঙ্গে তাল রেখে কাগজগুলার জায়গা ঠিক করে । অরুণকুমারের অবস্থার কোনো এদিক-ওদিক বা চমকপ্রদ পরিবর্তন না হওয়ায় পাঠকের আগ্রহ কমে আশাই স্বাভাবিক । মাল্লুষের কোতূহল বা আগ্রহ এমনই বস্তু যা নতুনত্ব না থাকলে অরুণকুমারের মতো ব্যক্তিকেও বেশিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ধরে রাখতে পারে না । অবশ্য সাধারণ পাঠকের কোতূহল নান্দনিক বা অ্যাকাডেমিক ! শব্দ ছুঁটিতে কারো আপত্তি থাকলে বিকল্পের অভাবে আভিধানিক গুরুত্ব কমিয়ে নেয়।

ধেতে পারে। তবে নিলয় ও আরো কয়েক হাজার মানুষের আগ্রহের কারণ যেহেতু একেবারে জীবিকার মূল জায়গাটার সঙ্গে জড়িত তাই তাদের আগ্রহে ঘাটতি নেই।

...অরুণকুমারের চিকিৎসকদের স্বাক্ষরিত স্বাস্থ্য-বুলেটিনে বলা হয়েছে তাঁর অবস্থার উল্লেখযোগ্য না হলেও সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি তরল খাদ্য গ্রহণ করছেন। সামান্য শ্বাসকষ্ট আছে, তবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক। নিউ ইয়র্কের প্রখ্যাত দুই সার্জন ডক্টর লিও টয় ও ডক্টর টনি টাকলো আজ অরুণকুমারকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা স্বাক্ষরকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন। অরুণকুমারের চিকিৎসা নিভুলভাবে চলছে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনের আশঙ্কা নেই বা পঙ্ক হয়ে যাওয়ার ভয়ও নেই বলে তাঁরা আশ্বাস দেন। তবে স্বস্থ হয়ে কর্ম-জীবনে ফিরে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে। আপাতত এই চিকিৎসাই চলবে। তাঁর শারীরিক অবস্থার আরেকটু উন্নতি হওয়ার পর তাঁকে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হবে। সেখানে কয়েকটি বিশেষ পরীক্ষা ও আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে যা পৃথিবীর অত্র কোথাও নেই।...

বিশেষ প্রতিবেদক নিশাস্ত সেনের সংযোজন : আমরাই প্রথম বলেছিলাম আমেরিকা থেকে দু'জন চিকিৎসক অরুণকুমারকে দেখতে আসছেন। তাঁরা এসেছেন। নিউ ইয়র্কের ডক্টর লিও টয় ও ডক্টর টনি টাকলো কাল এখানে পৌঁছেই বিমান-বন্দর থেকে সোজা চলে যান নাসিং হোমে। তাঁরা চার ঘণ্টার ওপর সেখানে ছিলেন। অরুণকুমারের চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘ আলোচনা করেন, অরুণকুমারকে পৃথিবীপুঙ্খ পরীক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জেনেছি ডক্টর টয় ও ডক্টর টাকলো তাঁদের প্রফেশনাল ফী নেননি। জানা গেছে এঁরা ক্যালিকোর্নিয়ার ভারতীয় যোগী শ্রীশ্রীজগদগুরু মদনানন্দ যোগী মহারাজের সেক্সো-সোম্যাটিক-সাইকো-যোগিক কাল্টের সঙ্গে যুক্ত। অরুণকুমারও এই কাল্টের সভ্য এবং যোগী মহারাজের অগ্রতম শিষ্য। তিনি যখনই আমেরিকা যান গুরুদেবের আশ্রমে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। ডক্টর টয় ও ডক্টর টাকলোর যাতায়াত ও এখানকার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছেন মহাগুরু হুঃস্বত্রাণ সংস্থা। এই সংবাদও বর্তমান প্রতিবেদক পাঠকদের আগেই জানিয়েছিলেন।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডক্টর এন. এন. পরামাণিক বিন জনদার্থে পাচজন চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন,

ডক্টর টম ও ডক্টর টাকলো সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন কিশোর ভিত্তিতে এঁরা অভিমত দিয়েছেন তা অরুণকুমারের চিকিৎসকরা তাঁদের বুলেটিনে বলেননি, কাজেই এঁদের অভিমতকে তিনি গুরুত্ব দিতে রাজী নন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, আমাদের পরাধীন মনোভাব এখনো ঘোচেনি, তাই দেশে বহু যোগ্য চিকিৎসক থাকার সত্ত্বেও বিদেশ থেকে সাদা চামড়ার ডাক্তার ভাড়া করে আনা হয়।...

হ। নিলয় খবরের কাগজটা ভাজ করে সরিয়ে রাখল। মোক্ষা বাপার হচ্ছে অরুণকুমারের ক্লোরে ফিরে আসতে অনেক দেরি। পরমাণিক ডাক্তার পাত্তা না পেয়ে যাই বলুক, আর্মোরকার ডাক্তাররা ছেলেখেলা করতে আসেনি। ওরা নিজেদের কাজটা অন্তত বোঝে। রুগীর নিবৃদ্ধিতাই ওদের আসল মূলধন নয়। যা হোক, একটা ভরসা ওরা দিয়েছে, অরুণকুমারের প্রাণের ভয় নেই। অরুণকুমারের সঙ্গে নিলয়ও আজ না হোক কাল ক্লোরে ফিরে যেতে পারবে।

মা বাবুসোনাকে কোলে নিয়ে এ ঘরে এলেন।

—তুই আজ কাজে বেরবি না নিলু ?

—আমার কাজের বাঁধাধরা সময় নেই মা। রোজ কাজ থাকে না। আজ নেই। নিলয় বলতে গিয়ে সামান্য ইতস্তত করল।

এ সময় দরজার কলিং বেল বেজে উঠতে নিলয় স্বস্তি পেল। মা আবার কি গোলমালে প্রস্থ করে বসবেন কে জানে। মা'র সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চালিয়ে যেতেই হবে। নইলে তিনি হয়তো নিজেকে নিলয়ের একটা মস্ত বাড়তি বোঝা ভেবে কষ্ট পাবেন।

দরজা খুলে নিলয় দেখল ডক্টর দত্ত। এই আবাসনেই থাকেন। বাজার থেকে ফেরবার সময় নিলয় খবর দিয়ে এসেছিল। ডাক্তার হিসেবে মোটামুটি সুনাম আছে।

—বহু ডাক্তারবাবু।

ডক্টর দত্তকে বসতে বলে নিলয় মাকে ডেকে আনতে গেল।

ও ঘরে গিয়ে বলল—মা এসো, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—ডাক্তার কি হবে ?

—সে আমি বুঝব। তুমি এসো। বাসায় ঘরে উঁকি দিয়ে বলল—নিনা, চা কর, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—ডাক্তারবাবু, ইনি আমার ম্ম। মা'র শরীরটা ভালো ষাচ্ছে না, খুব রোগা হচ্ছে গেছেন। দেখুন তো ভালো করে।

ডক্টর দত্ত তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গেও বেশি বাক্যালাপ পছন্দ করেন না। সম্ভবত ঘনিষ্ঠতা লেনদেনে অস্ববিধার সৃষ্টি করে।

তিনি সরাসরি কাজ শুরু করলেন—শুয়ে পড়ুন।

যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে মাকে পরীক্ষা করলেন ডক্টর দত্ত। হু'একটা প্রশ্নও করলেন। উদ্‌বগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে নিলয়।

পরীক্ষা শেষ করে ধীরে-সুস্থে অ্যাটাশে-কেস খুলে প্যাড বের করলেন ডক্টর দত্ত। নিনা চা নিয়ে এল।

—আবার চা কেন। ডক্টর দত্ত সৌজ্ঞেয়ও গম্ভীর।

—সামান্ত্র একটু চা—। নিনা যথোচিত হাসল।

—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? নিলয় বলল।

—লিভারটা বেড়েছে, চায়ে চুমুক দিতে দিতে ডক্টর দত্ত বললেন, ম্যাল-নিউক্লিওসিস, অ্যানিমিয়া। বৃক্কও কনজেশন আছে। ভয় পাবার কারণ নেই, তবে চিকিৎসা চালাতে হবে। হু'চার দিনে রেজাল্ট আশা করবেন না। বয়স হয়েছে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে প্রেসক্রিপশন লিখতে লাগলেন ডক্টর দত্ত।

—ওষুধগুলো আজ থেকেই শুরু করে দিন। রক্তের কয়েকটা পরীক্ষা লিখে দিচ্ছি, ভালো জায়গা দেখে করিয়ে নেবেন। আচ্ছা, বাবু পাল স্ট্রীটের মুখে ডক্টর বর্মনের ক্লিনিকটা দেখেছেন?

—হ্যাঁ, কি নাম যেন...

—নিবারণ পলি-ক্লিনিক। ওখানে আমার প্রেসক্রিপশন দেখালেই হবে। বৃক্কের একটা ছবিও করিয়ে নেয়া ভালো। কোথা থেকে তুলবেন আমি প্রেসক্রিপশনের শেছনে লিখে দিচ্ছি। ডায়ালিসের দিকটায় কিন্তু নজর দেবেন। হাই প্রোটিন—ছানা দুধ ডিম মাছ, চিকেনে আশক্তি না থাকলে সপ্তাহে দু'তিন দিন চিকেন—এই আর কি। ব্লাডের রিপোর্ট এক্স-রে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আচ্ছা, চলি—

‘চলি’ বললেন বটে ডক্টর দত্ত, কিন্তু ওঠার কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না—সম্ভব কারণেই।

—এক মিনিট ডাক্তারবাবু। বলে নিলয় নিনাকে ইশারায় ও ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

আলনারি খুলে নিনা জিজ্ঞেস করল—কত ?

—কুড়ি, নিলয় বলল, ব্যাংকের পাস-বই আর চেকবইটাও বের করে রেখে ।

—ডাক্তারবাবু, আপনার ফীটা । ছু'খানা দশটাকার নোট নিলয় ডাক্তারবাবুর হাতে দিল ।

—থ্যাংক ইউ । ডাক্তারবাবুর মতত গম্ভীর মুখে মুহূর্তের জন্য প্রসন্ন হাসি ।

প্রসন্ন হওয়াই স্বাভাবিক । বাস্তবিক মাছুষ আজকাল বড় স্ব.যোগসন্ধানী হয়ে উঠেছে । প্রতিবেশিত্ব বা পরিচয়ের স্বযোগ নিয়ে প্রফেশনাল কী কম দেয়ার পবণত ডাক্তারবাবু সহ করতে পারেন না । কোন্ ডাক্তার একশে! টাকা কী নয়, মাসে যোজ্জগার লক্ষ টাকা, কোন্ ব্যারিস্টার দাঁড়ালেই পাঁচ হাজার—সেটা বিচাষ নয় আমার কাজের দাম আমি এই ধার্ব করেছি, আমার কাজ নেয়া না-নেয়; তোমার ইচ্ছা, কিন্তু নিলে ধার্ব দাম তোমাকে দিতেই হবে—তোমার হিসেবে খত বেশি বা অত্যায়াই হোক । ডক্টর দত্ত এখানকার লোকদের প্রতিবেশিত্বের স্বযোগে কম দেয়া অপছন্দ করেন । এ ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান আছে দেখে তিনি খুশি হলেন । উঠতে উঠতে ডক্টর দত্ত বললেন—চিন্তার কারণ নেই । সুস্থ হয়ে উঠবেন । আমি তত আছিই—

ও ঘরে নিনা তখন মায়ের গয়নার পুঁটলিটা হাতে নিয়ে দেখাছিল ।

৯

জগদীশদাকে ওরা দল বেঁধে পাকড়াও করেছে । যজ্ঞেশ্বর অনিল ও আরো তিনজন ।

অনুরাধা স্টুডিওর লনে বসেছিল ওরা । সঙ্কে হয় হয় । রামদার দোকানে ঝাঁপ পড়ে গেছে । খন্দের-পত্র তেমন নেই, মিছেমিছি কয়লা পুড়িয়ে কি হবে । দোকান বন্ধ করে চলে গেছে । ওরা লনে বসে এলোমেলো আলোচনা করছিল । জগদীশদা ল্যাবোরেটরিতে এসেছিল কাজে । তাকে টেনে বসিয়েছে ফেরার পথে ।

—তারপর, কিসের গাঁজালি চলছিল তোদের ? বিড়ি ধরিয়ে জগদীশদা বলল, রামদার দোকান তো বন্ধ । চা খেতে পারলে হত । যাকগে ।

যজ্ঞেশ্বর বলল—হালচাল কি বুঝছেন জগদীশদা ?

—তুই যা বুঝছিল আমিও তাই বুঝছি ।

—খবরের কাগজ দেখে মনে হচ্ছে অরুণকুমার শিগগির উঠবে না।

—তা-ই মনে হচ্ছে।

—কি হবে জগদীশদা? অনিল বলল।

—কেন, অরুণকুমার যখন আসেনি তখন কি ছবি তৈরি হত না?

যজ্ঞেশ্বর : হত। তবে তখন দিনকাল ছিল আলাদা। মানুষ এখনকার মতো ছিল না। পুরনো আমলের ছবি কয়েকখানা দেখেছি, শুনেছি দারুণ চলেছিল। টেকনিক্যাল সাইড, আর্কটিং এখনকার ছবির সঙ্গে তুলনা করলে হাসি পায়। ভেবেছি, লোকে তাহলে ছবিগুলো নিয়েছিল কেন!

জগদীশ : টেকনিক্যাল কাজ, আর্কটিংয়ের ধাঁচ বোঝই পালটাচ্ছে, উন্নতি হচ্ছে। আজ যানতুন কাল তা-ই পুরনো। তখনকার দিনে ঐ আর্কটিংই ছিল নতুন, ঐ সেকালে ক্যামেরার কাজই লোকের চোখে চমক লাগাত।

যজ্ঞেশ্বর : আমিও তাই বলতে চাচ্ছি। আর্কটিং, টেকনিক্যাল কাজ যে সময়ের যেটা সেই সময়ে সেটাই নতুন। তাহলে আমাদের তৈরি ছবি এখন চলতে চায় না কেন? আসলে মানুষই নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।

জগদীশদা : ওঃ, আমরা যেন কত রুচিওলা ছবি তৈরি করছি! না, না, ওসব ধারণা ছেড়ে দে। শোন, আমার ছেলেবেলায় খুব আক্টো করার শখ ছিল। সন্তোষ গোস্বাইয়ের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস। ঐর কাছে তালিম নেবার স্বযোগ পেয়েছিলাম। উনি বলতেন, স্টেজে যখন দাঁড়াবি মনে করবি তোর সামনে একপাল ভেড়া বসে আছে। ঐর বলার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে নিজের মনটাকে তৈরি করে নিতে পারলে নার্ভাসনেস আসবে না। ছবি যারা তৈরি করে তারাও দর্শককে ভেড়ার পাল মনে করে, তবে তাদের উদ্দেশ্যটা আলাদা। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই কিছু লোককে বাদ দিলে আমরা ভেড়ারই পাল। এমন জিনিস তৈরি কর যা তৈরি করতে মগজ লাগে না, ভেড়ার পালও গিলবে হাই হাই করে। এখন চলছে ভেড়ার পালের খাজ তৈরি করার কমপিটশন, তাতে আমরা হেরে যাচ্ছি—বেশি টাকা সবে কম টাকা কোনোদিনই পারে না। আমরা খড়কুটো আঁকড়ে ধরে টিকে থাকার চেষ্টা করছি এই পর্বস্ত।

যজ্ঞেশ্বর : মানুষকে আশুভ-এস্টিমেট করা হল না?

জগদীশ : না, মানুষ সাধারণভাবে ভালো, সে ভালোটা কাছের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশায় চলা-বলায়। কিন্তু ভালো-লাগা জিনিসটা অন্তরকম, সেখানে

ভালো-মন্দ দেশ ভবিষ্যতের চিন্তা ক'জনের মাথায় থাকে ? মানুষের কৃচি তৈরি করে
 মানুষেই, তেমন মানুষ আমাদের দেশে ক'টা ? এরা উঠে আনুক তা নিশ্চয়ই
 দেশের মাথারা চায় না। তাহলে তো নোংরা জিনিস এরাই বন্ধ করে দিত। যাক,
 তবু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয়। আমাদের পেট চালানোই সমস্যা। আমরা
 জগু ভাবি না, যেমন-তেমন করে চলে যাবে। তোরা যে কি করবি...। নতুন জিন
 চাখানা ছবির কাজ শুরু হবে শুনিছি। তোরা শুনেছিস ?

অনিল : না। হলেও পাড়া পাব না।

জগদীশ : তা ঠিক। এত লোক কাজ খুজছে, কাজ কোথায় ?

যজ্ঞেশ্বর : আচ্ছা জগদীশদা, কিন্ন-লাইনে আমরা বারা ছোটখাট কাজ করে
 তারা মিলে কো-অপারেটিভ করে বাদি ছবি করি ?

জগদীশ : অনস্বব। ছোটখাট ব্যবসা কো-অপারেটিভ করে চালানো যায়, কিন্তু
 তোমার কাইনাস জোগাড় করা অসম্ভব। তুই হয়তো বলবি ব্যাংকের লোন, সরকারি
 গ্রান্ট—এগুলো শুনতেই ভালো। ব্যাংকের লোন শোধ দিতে হবে, ছবি যদি ফল
 হল, বাস, হয়ে গেল। সরকারি গ্রান্ট একবার দিতে পারে, বারবার দেবে না। শেখ
 পর্বন্ত একখানা ছবিতেই কো-অপারেটিভও শেখ। এ পুরো কাটিকা খেলা, বড়লোকের
 খেলা। মিথো খাটুনি মার হবে তোদের। এ জিনিস এ দেশে কোথাও হয়েছে
 বলে শুনি নি।

সহদেব নিতাই বংশী চুপচাপ শুনছিল।

বংশী এবার বলল—বা দাঁড়াচ্ছে আমাদের অগ্র ধান্দা দেখতে হবে।

জগদীশদা অল্পক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল, তারপর বলল—দেখ, পারলে ভালো
 এ লাইনে তোরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ জানিস, চেনাজানাও অল্পবিশেষ
 আছে। অগ্র কাজ জুটিয়ে নিতে পারিস ভালো। আজকাল খুব কম লোকই ইচ্ছে
 করলে একটা ছেড়ে আরেকটা কাজ করতে পারে। তাহাড়া

কথাটা শেষ না করে জগদীশদা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বর একটু অপেক্ষা করে বলল—তাহাড়া কি জগদীশদা ?

—যজ্ঞেশ্বর, আমিও আগে মাঝে মাঝে ভাবতাম কি হবে কিন্ন-লাইনে পচে
 থেকে। যা আমি হয়েছি তার বেশি কিছু হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। তার
 চেয়ে বরং একটা পাকা চাকরি দেখে নেয়া ভালো। চেষ্টা করলে পেয়েও যেতাম।
 তখন দিনকাল এত খারাপ ছিল না, মুক্খসীও ছিল আমার। কিন্তু পারিনি লাইন

ছাড়তে। এ শালা বড় বাজে লাইন, বড় বাজে নেশা। নেশা যদি তোদের না ধরে থাকে খুব ভালো।

জগদীশদার বিড়ি নিভে গিয়েছিল। আরেকটা ধরিয়ে টানতে থাকল। আর যজ্ঞেশ্বর অনিল সহদেব নিতাই বংশীর মুখ-চাওয়াটা গন্ডির করে কি যেন সন্ধান করতে লাগল একে অন্তের মুখে।

সহদেব টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

নিতাই বংশীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বিড়ি বেব করে নিয়ে বলল—একটাই ছিল। নিলাম।

—নে। বংশী বলল।

কসু করে দেশলাই জ্বলে বিড়ি ধরাল নিতাই।

একটা ঘাস তুলে নিয়ে গোড়াটা দাঁতে কাটছে অনিল।

—ও, জগদীশদা পকেট থেকে বিড়ির কোঁটো বেব করে ওদের মাঝখানে রাখল, ন, নে, মনেই ছিল না যে তোদেরও চলে।

যজ্ঞেশ্বর ছাড়া সবাই বিড়ি নিল কোঁটো থেকে। ওর বিড়ি-সিগারেটের নেশা নেই।

জগদীশদা একগময় বলল—সবার ভাবনা ভেবে আমরা কোনো সুরাহা করতে পারব না। তার চেয়ে স্বার্থপরদের মতো নিজেদের, মানে, কাছের কজন্যর জন্তে ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ; এক দম্বল মানুষকে জড়িয়ে এত বড় সমস্যা'র সমাধান আমরা ভো করতে পারব না। চাচা আপন বাচা নীতিই নিতে হবে। দেখি, নতুন ছবি'র কাজে আমাদের যদি ডাকে তোদের দেবার জন্ত বলব।

যজ্ঞেশ্বর জগদীশদার বক্তব্য তুলে নিল—ঠিকই। ওগব নেহাতই আলোচনা, আলোচনাতেই শেষ; কিন্তু এভাবে তো সংসার চলে না জগদীশদা। পাশাপাশি সন্ত কাজ না ধরলে কারোই চলছে না।

—আমার দেনা হয়ে গেছে দেড় হাজার। কি করে শোধ হবে মা ভগা জানে। বলে সহদেব পাশ কিবল।

বিড়িতে আঙুল-পোড়ানো টান দিল নিতাই—আমায় ন'শো। খিটকেল কাবলিওলা। সুদ দয়া করে মাসে পঞ্চাশ টাকা। দিতে পারছি না। পালিয়ে বেড়াই, বাড়িতে থাকি না। শালা সেদিন বৌকে খিস্তি করে গেছে।

যজ্ঞেশ্বর : কিবিস্তি জগদীশদার জানা আছে। আমরা বসে বলাবলি করছিলাম : গাজগার ধমন করেই হোক বাড়িতে হবে।

জগদীশ : অনেক ছেলেকে আজকাল নানারকম টুকটাক কাজ করতে দেখি। বাঙালীয় ছেলেরা আগে এসব কাজের নাম শুনে নাক সিটকত। এখন গুণামি মস্তানি যেমন বেড়েছে, ছেলেরদের লজ্জা ভয় ছেড়ে নতুন নতুন কাজ করার ইচ্ছেও বেড়েছে। এটা ভালো।

যজ্ঞেশ্বর : এই সহদেব, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ? কি বলছিলি তখন বল না জগদীশদাকে।

উঠে বল সহদেব। —বলছিলাম আমরা পাঁচজনে যদি দুটো স্ন্যাক-বার চালাই কেমন হয় ?

জগদীশ : স্ন্যাক-বার ?

সহদেব : রাত্তার ধারে চাকাওলা গাড়িতে রোল-টোল প্রথম প্রথম ভেঙ্গে দেয় দেখেন না ? খুব চলছে। হোটেল-রেস্টুরেন্টে যা দাম, লোকে ভালোমন্দ খেতে খুব ভিড় করে এসব দোকানে। রাত্তার দাঁড়িয়ে খেতে ভক্তঘরের মেয়েরাও এখন লজ্জা পায় না।

মিনিট খানেক ভেবে জগদীশদা বলল—মন্দ বলিনি। কিন্তু তোদের কারো কি এ কাজের অভিজ্ঞতা আছে ?

সহদেব : নিতাই কিছু দিন হোটেলে রাঁধুনির অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করেছিল। ও চপ কাটলেট রোল মোগলাই পরোটা বানাতে জানে। ওর কাছ থেকে শিখে নেব।

জগদীশ : কিরে নিতাই, পারবি ওদের শিখিয়ে নিতে ?

নিতাই : হাতে-কলমে কাজ। করতে করতে শেখা হয়ে যাবে।

যজ্ঞেশ্বর : কাজটা শিখে নিতে পারলে, আমরা ভাবছিলাম, সবার সবদিন স্টুডিওতে কাজ থাকবে না, দুটো ছোকরা রেখে দিলে চালানো শক্ত নয়।

বংশী : ফিলিম আমার ভালো লাগছে না জগদীশদা। যদি চলে আমি পুরোপুরি এ কাজে নেমে যাব।

জগদীশ : তবে আর কি, লেগে যা।

যজ্ঞেশ্বর : বামেলা আছে। স্ববিধেমতো জায়গা পাওয়া চাই। কর্পোরেশন পুলিশ...হাজার ছয়েক মূলধন লাগবে...জোগাড় করাই সমস্যা ..

—হঁ। শব্দটা করে জগদীশদা নিজের মধ্যে ডুবে গেল।

কর্পোরেশনে সুরেনবাবু আছে। বুঝিয়ে বললে কয়েক মধ্য বাবস্থা করে দেবে। পুলিশ সমস্যা নয়। পুলিশ সমস্যা হলে ফুটপাথে হাজার হাজার দোকান চলতে পারত

না। আলল সমস্তা ছ'হাজার টাকা। কে দেবে ওদের এত টাকা? ছু-চার-ছ'শো হলে একুনি জোগাড় হয়ে যেত। ওহ্‌হো, হঠাৎ জগদীশদার মনে পড়ল নর্দান ব্যাংকের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার তপনবাবুকে। ভদ্রলোকের বাড়ি, গাড়ি, মোটা মাইনে, হুন্দরী স্ত্রী, মাপা দু'টি ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও মনে শাস্তি ছিল না। এমন বহু মানুষ দেখেছে জগদীশদা যাদের সিনেমায় মুখ দেখানোর জগ্গে আদেখলেপনার শেষ নেই। জগদীশদার সঙ্গে আলাপ হতে যেই তপনবাবু শুনেছিল যে সে কিয় লাইনের লোক অমনি অমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কে লোকটারও সে হয়ে গিয়েছিল জগদীশদা। তারপর বাচ্চা ছেলের মতো আরজি পেশ—আবদার। জগদীশদার মাথায়ও লোকটাকে হাতে রাখার হিসেব ছিল। তাই তপনবাবু দুটো ছবিতে আড়াই থেকে তিন লাইন জনতা-পার্ট-বলার সুযোগ পেয়েছিল। আহা, কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কি চরিতার্থতা! কৃতজ্ঞতার ঋণ আজও ভোলেনি তপনবাবু। অতএব সেই কৃতজ্ঞতার ঋণের রাস্তা দিয়েই ব্যাংক থেকে এদের ছ'হাজার টাকা ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

—শোন, জগদীশদা নীরবতা ভঙ্গ করল, তোরা খোঁজখবর নিয়ে তৈরি হ। টাকা জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব আমার, শোধ করার দায়িত্ব তোদের। মেরেও দিতে পারিস, ও টাকা মারলে দোষ নেই, শুধু মারবার কায়দা কোনো ওস্তাদের কাছ থেকে জেনে নিস।

—সে আবার কি! অনিলের বুদ্ধি কিঞ্চিং গোলা, সে বিস্মিত।

—তোরা অত বুঝে দরকার নেই, জগদীশদা হাসল, তোরা বরং আন্তে আন্তে শোধই করে দিস। গরিবের সং থাকাই ভালো। কর্পোরেশনের ভারও আমি নিচ্ছি। পুলিশের জগ্গ ভাবনা নেই, ওরা ভালোবেসেই তোদের ভার নেবে। ...ই্যা, নিলয়কে তোদের সঙ্গে নিতে আপত্তি আছে?

সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যজ্ঞেঋণ বলল—সেদিন নিলয়বাবু এসেছিল স্টুডিওতে।

—কেন?

—জানি না। হতে পারে কাজ-টাজের খোঁজে। রামদার দোকানে আমি অনিল আর ভোলানা বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আধঘটা ছিল। দারোয়ান বলছিল, বাণ্ডো সাহেবের কাছেও নাকি গিয়েছিল।

—কথা-টতা কি হল? জিজ্ঞেস করল জগদীশদা।

—বিশেষ কিছু না। এটা-সেটা সাত-সত্তেরো।

জগদীশদা বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্ত আবার বিড়ি ধরাল। ব্যাণ্ডের সঙ্গে নিলয়ের কি দরকার থাকতে পারে? ছোঁড়াটা নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে ক্যাসাদে যা পড়ে। নাঃ, কালই যেতে হবে ওর বাড়িতে।

—নিলয়লা এ কাজ করবেই না। অনিল বলে উঠল আচমকা।

—কেন, করবে না কেন? জগদীশদা মুখ ঘোরাল ওর দিকে।

—ওর মাখামাখি ওপরে। সহদেব বলল।

—অনেক জানিস দেখছি, ঠাট্টার স্বর জগদীশদার গলায়, তোরাও তো, বাইরের লোকেরা ভাবে ফিলিমে কাজ করিস, কি না কি ফিলিম ব্যাপারটাই ঐ রকম বুলি?

—বাদ দিন ওসব, যজ্ঞেশ্বর বলল, নিলয় বাবু হাসতে চাইলে আমাদের আপত্তির প্রস্নই ওঠে না। ভালোই তো।

বর্তই জোর দিয়ে তার সম্মতি জানাক যজ্ঞেশ্বর, একটা আড়াল কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। জগদীশদার কানে সেটা ধরা পড়ল। অতের জায়গাটা মাল্লু খতিয়ে বুঝতে চায় না, ওপর ওপর দেখাটাই মনে করে নিভুল। নিজের জায়গাটাই বা বোঝে ক'জন? থাকগে, কাজের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ঠিক হয়ে যাবে। মনকে আশ্বাস দিল জগদীশদা।

বুশ্ করে লোড-শেডিং নেমে এল। আশপাশের বাড়িগুলোর জানলার আলো নিভে যেতে ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখাতে লাগল। ঘুরঘুটি অন্ধকার চারবার।

—ঘটা তিনেকের ধাক্কা, যজ্ঞেশ্বর বলল, উঠে পড়া থাক।

—হ্যাঁ, জগদীশদা উঠতে উঠতে বলল, তোরা কাজ শুরু করে দে। আমার যা করবার করে দেব। আটকাবে না। মাল্লু লড়ছে দেখলে আমার ভালো লাগে।

ওরা জগদীশদাকে সামনে রেখে ঘন হয়ে হাঁটতে লাগল। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু বিশ্বাস করা যায় এমন একজন ছুঁত মাল্লুয়ের সঙ্গে পথ হাঁটার আনন্দ বোধ হয় ওদের সকলেরই মনে।

দরজা খুলে জগদীশদাকে দেখে নিনা বলল—কে আসতে বলেছিল আপনাকে?

—কে আবার বলবে, নিজেই এলাম। জগদীশদা হেসে বলল।

—ঘোড়ার ডিম।

—আরে পাগলি, একেবারে সময় পাই না। জগদীশদা চৌকিতে বলল।

—নিজের কাজের সময় পান, এর-তার বাগার খাটবার সময় পান, আমাদের বেলায়ই সময় পান না। যত দরদ মুখেই।

জগদীশদার গলার আওয়াজ পেয়ে নিলয় এর মধ্যে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

—দেখ, নিলয়, আসতে না আসতেই বগড়া শুরু করেছে তোর বৌ।

—আপনাদের ভাই-বোনের ব্যাশায়, আপনারা বুঝুন। নিলয় বলল হাসি-হাসি মুখে।

—হঁ, বোনের দোষ দেখতে পাবি কেন। ছেলেগুলো বিয়ের পর কেমন যেন হয়ে যায়।

—এই—এই—, ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে নিনা জগদীশদাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল ও ঘরের দিকে দেখিয়ে।

—কি ব্যাশায়? জগদীশদা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—আমার মা। মা, মা—। নিলয় মাকে ডাকল।

জগদীশদা মুখে প্রশ্নের ভঙ্গি নিয়ে তাকাল।

—মা এখন আমাদের কাছে থাকছেন। নিনা আস্তে বলল।

বাবুদোনাকে কোলে নিয়ে মা এলেন। জগদীশদা উঠে দাঁড়াল।

—আমার মা, নিলয় পরিচয় করিয়ে দিল, মা, ইনি জগদীশদা, আমাদের দাদার মতো। এঁরই দমায় আমাদের যা কিছু।

—তুই বড় বাড়িয়ে বলিস নিলয়। পায়ে হাত দিয়ে মাকে প্রণাম করতে করতে জগদীশদা বলল।

—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, মা বললেন, নিলু তোমার কথা আমাকে বলেছে। তুমি শুকে দেখো বাবা। তুমিই ওর সত্যিকারের অভিভাবক।

—মস্ত বড় দায়িত্ব দিলেন মাসিমা। আমার কাঁধে কি অত জোর আছে?

—আছে বাবা। নইলে সবাই তোমার কাছে ছোটে?

—যেখানে কোনো ভরসাই নেই মাসিমা, সেখানে লোকে তাবিজ কবচ মাহুলি জলপড়া লটারির টিকিটেও ভরসা খোঁজে। আমিও সেই রকম। কই যে নিনা, চা খাওয়া বি না?

—আর কি খাবেন বলুন। নিনা বলল।

—কিছু না। ফার্ট ক্লাস করে এক কাপ চা, বাস, পকেট থেকে একটা চকোলেট

বের করে বাবুসোনার হাতে দিয়ে জগদীশদা ওকে কোলে নেবার জন্ত হাত বাড়াল, এই যে ভার্সে কানাই, এসে, আমার কোলে এসে।

চকোলেট নিতে বাবুসোনার আপত্তি ছিল না, কিন্তু জগদীশদার কোলে যেতে দখা গেল রীতিমতো আপত্তি।

নিলয় মার কোল থেকে বাবুসোনাকে নিয়ে বলল—মা, তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তুমি বরং ও ঘরে গিয়ে বসো।

মা চলে গেলেন।

জগদীশদা আবার হাত বাড়াল। কিন্তু বাবুসোনার মনোযোগ চকোলেটে, জগদীশদার বাড়ানো হাতকে আমল দিল না।

—নিনা, দেখছিস তোর ছেলের কাণ্ড। আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

ঠিক করেছে। আসেন না কেন? ন'মাসে ছ'মাসে একদিন এসে চকোলেট ঘুষ দিলেই কাজ হবে?

—আচ্ছা ট্রেনিং দিয়েছিস ছেলেকে। ঘুষও নেয়, কাজও করে না, এ কেমন ছেলে রে! অবিশ্বাসি ছেলে তোর দেশের হাওয়া মেনেই চলছে। জগদীশদা হা হা করে হাসল।

—এর পর আমিও তাই করব। নিনা বলল।

—তোকে তো ঘুষ দেয়া হয়েছে গেছে।

—কই আর দিলেন?

—কেন, নিলয়।

—মাঃ। ঘাই, আপনার চা করে আনি। পালাই পালাই করবেন না ঘেন। নিনা চলে গেল রান্নাঘরে।

নিলয় বাবুসোনাকে মার কাছে দিয়ে এসে জগদীশদার পাশে বসল।

—ভুই সেদিন ব্যাণ্ডোর কাছে গিয়েছিলি শুনলাম। ও ঘরের দিকে চোখ রেখে খুব নিচু গলায় জগদীশদা বলল।

—ই্যা। নিলয় মেঝেতে চোখ রাখল।

—কেন?

—সেদিনকার শট্‌গুলো ব্যাণ্ডোর কাছে আছে। সাজানোও হয়ে গেছে।

—সে তো হল। তোর তাতে কি দরকার?

—ঐ সিনের একটা প্রোজেকশন দেখতে চেয়েছিলাম।

—ব্যাণ্ডো দেখাল ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তোর হঠাৎ ওটা দেখার কি দরকার পড়ল ?

—এমন বিশ্রী অবস্থা চলছে...আমার যেন নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে...

—দেখে কি সেটা মন থেকে দূর হল ?

—না...মানে...

—ব্যাণ্ডোর কাছে যাওয়া তোর ঠিক হয়নি। স্টুডিওর অনেকেই এর নপো জেনে ফেলেছে তুই ব্যাণ্ডোর কাছে গিয়েছিলি। যা করে ফেলেছিস তা আর ফেরানো যাবে না। জানিস, এ নিয়ে কত রকম ঘোঁটা হতে পারে ? আরে বাবা, এ লাইনের মতো কেছা কানাকানি মিথ্যের কারবার কোথাও নেই। কত লোক শ্রেক কেছা বানিয়ে বেঁচে আছে। সাবধানে পা ফেলতে শেখ। আমাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, যা খুশিই করি না কেন। কিন্তু মনে রাখিস, তুই অরুণকুমারের ডামি।

নিলয় না-বোঝার দৃষ্টিতে তাকাল।

—গাধা কোথাকার, জগদীশদা হতাশভাবে বলল, তোর সঙ্গে দরকারী আলোচনা আছে। রাস্তায় বেড়িয়ে বলব।

এ ধরনের কথা জগদীশদা আগেও বলেছে, নিলয় ভাবল, এবং কিয়-লাইনের হালচাল যে সে একেবারে জানে না তাও নয়। তাকে নিয়ে এত সাবধানতা কেন জগদীশদার ? অরুণকুমারের ডামির কাজ সে অনেকদিনই করছে। লোকের খত মাথাব্যথা অরুণকুমারের জন্ত। অরুণকুমারের লাখ লাখ ফ্যানের কজন নিলয়ের খবর জানে ? জানলেও কি তাদের বিদ্মুত্র কৌতূহল আছে তার সম্পর্কে ? ভেতরের কায়দাও হচ্ছে তাকে আড়ালে রাখবার। যেজন্ত নিলয় মজুমদার নামটা কখনো ছবির ভূমিকা-লিপিতে গুঠেনি। যে নাম তার হতে পারে না, যে নামে তাকে কেউ চিনবে না, সেই রকম একটা নাম, যা মাছুষের এমন কি কুকুরের হসেও নির্বিশেষ, বা বাচ্চার হাতে চুষিকাঠির মতো, তাকে দেয়া আছে।

ওরা বিলক্ষণ জানে এ নামের দাবিদার হওয়া নিলয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। লোকে বিশ্বাস করবে না। নিজের সত্যিকারের দাম নিলয়ের জানতে বাকি নেই। আর্টিস্টদের নানারকম দর আছে—বাজারদর ছাড়াও—যেমন গ্যামার, আপীল ইত্যাদি ইত্যাদি। নিলয়ের দর একটাই—সামান্য বাজারদর—যার ওঠা-নামাও সামান্যই। অরুণকুমারের মতো নিজের ইচ্ছাতেই ওঠানো-নামানোও যায় না। তাহলে হঠাৎ এমন নি-দর

বাক্তির কি দর তৈরি হল ? স্বাণ্ডাল-ভালু বলে কোনো শব্দ আছে কি ? আছে হয়তো বড়দের শাস্ত্রে । কিন্তু নিলয়ের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না সে কেমন করে এর আওতায় আসতে পারে ।

জগদীশদা বিড়ি টানছিল ।

নিনা ত্রেতে দু'কাপ চা আর প্লেটে চানাচুর নিয়ে ঘরে ঢুকেই নাক কুঁচকে বলল—
ইস, বিড়ির কি গন্ধ ।

জগদীশদা নির্বিকার ।—কি আর করবি বোন, গরিব দাদার বিড়িই সম্বল । এই, চানাচুর আবার কেন ?

—শুধু চা আমি দিতে পারব না, নিনা চোকির ওপর ত্রে নামিয়ে রাখল, খেলে খান, না খেলে ফেলে দিন ।

—একেবারে মিলিটারি, জগদীশদা হাসল, খাচ্ছি রে বাবা খাচ্ছি । নিলয়ের ওপর কি জবরদস্তি হয় বুঝতে পারছি ।

—জিজ্ঞেস করেই দেখুন না । নিনার জ্বালা হল ।

জগদীশদা চানাচুর চিবোতে চিবোতে বলল—তোর সামনে ভয়ে সতি বলবে নাকি ?

—তাহলে আড়ালেই জিজ্ঞেস করবেন ।

—তা-ই করতে হবে । মাসিমা ওর দেখভাল করবার দায়িত্ব এখন আমাকেই দিয়েছেন...

চা হাসি-আহ্লাদ গল্প-গুজবে থাকি কটা সময় কাটিয়ে জগদীশদা বলল—আজ উঠতে হয় বোনটি ।

নিনার ইচ্ছা ছিল জগদীশদাকে খেয়ে যেতে বলায় । কিন্তু পয়লাকড়ির অবস্থা ভেবে বলতে সাহস করেনি । লোকের সামনে শুধু ভাত ডাল তরকারি আর দেড় ইঞ্চি সাইজের দু'খানা ট্যাংরা মাছের ঝাল ধরে দেয়া যায় না ।

—আবার ক'মাস পরে আসবেন ? নিনা কপাল কুঁচকে বলল ।

—বড্ড ঝগড়াটি হয়েছিল, আগে এমন ছিলি না । আসব রে আসব, সময় পেলেই চলে আসব । চল্ নিলয়, আমাকে এগিয়ে দিবি ।

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে জগদীশদা বলতে লাগল—দেখ, নিলয়, তুই নিজেও জানিস ঘটনাটা অ্যাকসিডেন্ট । অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট । বোকার মতো লোককে অস্তরকম সন্দেহ করবার স্বেযোগ করে

দিচ্ছিস কেন? প্রথম থেকেই গুনগুন চলছিল। তোর উচিত ছিল একদম বোক সেজে থাকা। ব্যাণ্ডার কাছে গিয়ে কি করেছিস বুঝতে পারছিস? তোর মনের অবস্থা বোঝার দায় কারো নেই। বরং উলটোপালটা গবেষণা করার সুযোগ করে দিলি। এমন বোকামি আর ভুলেও করিস না।...আচ্ছা, মাদিমা কি এখন তোর কাছেই থাকবেন?

—হ্যাঁ, দাদা মার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করছিল। বৌদিও সরেস। মার শরীর ভালো নয়। চিকিৎসা হচ্ছিল না। আমার মামাতো বোন পুন্ডি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে মাকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে মা আমাদের কাছে বেশ খুশিতেই আছেন।

—একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তোদের দারুণ জিত।

—নিশ্চয়ই। নিনাও খুব খুশি। পয়সাকড়ির টানাটানি এ সময়েই শুরু না হলে আমাদের সত্যিই ভারি আনন্দ হত। মার চিকিৎসায় অনেক টাকা এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে কিছুদিন চিকিৎসা চালাতে হবে। এক বাঁচোয় রোগটা টি. বি. নয়। ডাক্তার প্রথমে সেই রকম সন্দেহ করেছিল। এক্সরে-তে পাওয়া যায়নি তাই রক্ষে।

—এত খরচ চলছে কি করে? সোজাসৃজি জিজ্ঞেস করল জগদীশদা।

—ব্যাংকে দশ টাকা রেখে বাকিটা তুলে নিয়েছি। চারশো তিরিশ টাকা নিনাকে এক ভরির একটা সরু হার দিয়েছিলাম, ওকে দেয়া আমার একমাত্র গয়না। হারটা বন্ধক রেখে পেয়েছি বারোশো টাকা। যে রেটে খরচ হচ্ছে এ টাকা শেষ হতে বেশিদিন লাগবে না। তারপরে কি হবে জানি না। পাঁচ হাজার টাকার মতে পেমেন্ট আমার পাওনা, দু'এক জায়গায় চেষ্টা করেছি, সকলেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে আর গয়না বলতে নিনার আছে কানে দুটো রিং, হাতে দু'গাছা করে চুড়ি। পেমেন্ট-গুলো না পেলে...

—ওগুলোও বিক্রি করতে হবে না হয় বন্ধক দিতে হবে। তাতে আর ক'টাকা পাবি? ক'দিন চলবে? অরুণকুমার কাজ না শুরু করতে পেমেন্টও কেউ হাড়বে না। তোর ছবি মানেই অরুণকুমারের ছবি ছবি শেষ করতে পারবে কিনা তাই নিয়ে এখন ওদের চিন্তা। যদি শেষ করতে না পারে তাহলে বাদের বাদের টাকা মেয়ে দিতে অস্বীকার নেই তাদের টাকা ওরা মেয়ে দেবেই। তোর তো আর কোর্টে গিয়ে টাকা আদায় করার মর্যাদ নেই। চাকের দায়ে মনসা বিকোবে।

—কি যে করি...

—যা হোক করতেই হবে। যজ্ঞের অনিল সহদেবরা মিলে দুটো স্বাক-বার খুলবে ভাবছে।

—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চপ কাটলেট ভেজে বিক্রি করা ?

—হ্যাঁ, ব্যবসাটা চলে ভালো। আমি দেখেছি। তা, দুটোর জায়গায় তিনটেও দেয়া যায়। তোকে নিতে ওরা রাজী আছে। ওরা পাচজন, তুই এলে ছ'জন। ছ'জনে একটা করে চালাবি। ওদের বলেছি ব্যাংক থেকে লোনের ব্যবস্থা আমি করে দেব। গুছিয়ে নিতে মাস খানেক। একমাস কোনোরকমে চালিয়ে নে, তারপর শুরু করে দে। বুকে-সুখে চালাতে পারলে মন্দ হবে না। পরে না হয় ওটা সাইড ইনকাম হিসেবেই থাকবে।

নিলয় নিরুত্তরে হেঁটে চলল অনেকক্ষণ, তারপর কুঠার সঙ্গে বলল—কিছুদিন দেখা ভালো না? যদি...

বড় দুঃখের মধ্যেও হাসি পেলে জগদীশদার। কিন্তু একই সঙ্গে হাসি এবং একটা তিক্ত মন্তব্য চেপে সে বলল—তখন স্বযোগ না-ও থাকতে পারে। তাড়াহুড়া নেই, ভেবে দেখ্।

বাস এসে গিয়েছিল। ‘চলি রে’ বলে জগদীশদা বাসে উঠে পড়ল।

১০

ট্যান্ডিতে তুরূপ সেন আর জ্যাকি খান্ধাটা। ওরা যাচ্ছে নিলয়ের বাড়ি। মেজাজ খুশ। কারণ তুরূপ কায়দা করেই জমি তৈরি করেছে। নিলয় যাতে ফেরাতে না পারে। ইন্টারভিউ ওকে দিতেই হবে। তারপর স্টোরি তৈরি করা তুরূপের ছ'ঘণ্টার মামলা। ওঠিক কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে সাবজেক্টটা ধরবে জানে শুধু খান্ধাটা। ও নিয়ে ওদের বহু আলোচনাও হয়েছে। ওরা এখন তৈরি।

তিন পেগ করে জিন অ্যাণ্ড লাইম খেয়ে ওরা ট্যান্ডিতে উঠেছে। হুইস্কি ওদের প্রিয় পানীয় হলেও ইন্টারভিউ নিতে যাবার সময় হুইস্কি ওরা খায় না। গন্ধটা অনেকে বরদাস্ত করতে রাজী নয়, স্বয়ং একই পথের পথিক হলেও। জিনের গন্ধ মালুম পাওয়া যায় না। জিনের যা ধর্ম, সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ার নেশা গাঢ় হয়ে

উঠছিল। অবশ্য গুৱা অভিজ্ঞ ব্যাপাৰী, ঠিক সময়ে নেশাৰ ও বাশ টেনে ধৰতে জানে।

—পাম্ বাটা বাটা বাটা বাটা বাটা। তুৰুপ হাঁটুতে তাল ঠুকতে কতে গুনগুন
কৰে গান ধৰল। মাইকেল জ্যাকসনেৰ জগবম্পেৰ কায়দায়।

থাষাটা মেয়েলী গলা কৰে জমাটি একটা হিন্দী ছবিৰ গানেৰ সূত্ৰে জবাব দিল—
তুৰু তুৰু তুৰু মেৰে তুৰু...উ...উ...। গলা ভেঙে তিন বকম স্বৰ বেৰ কৰল থাষাটা।

তুৰুপ থাষাটাৰ দাবনায় চাপড মেৰে বলল—জবাব নেই। দে, সিগাৰেট দে।

—বুৱালি তুৰুপ, আমাৰ মনটা শালা খিচখিচ কৰছে, একটা ইনোসেণ্ট
লোককে...। থাষাটা তুৰুপেৰ সিগাৰেট ধৰিয়ে দিয়ে বলল।

—উপায় নেই রে থাষাটা! দিস ইজ ছা সিসটেম। ক'টা ডাক্তাৰ কুগীৰ
জ্ঞানেৰ পৰোয়া কৰে? তুই জানিস নৰ্থে কোনো লোকেৰ পেটে আপেনেডিক্স নেই?

—যাং, আপেনেডিক্স ছাডা মানুহ হয়? তুই ইয়াৰ্কি কৰছিল।

—ইয়াৰ্কি নয় বাবা। ডক্টৰ গু'ই আৰ ডক্টৰ চ্যাটাৰ্জি মিলে নৰ্থেৰ সব লোকে
আপেনেডিক্স কেটে বাদ দিয়েছে। পেটে বাখা? আপেনেডিক্সটা একুনি কেটে
কেলতে হবে, বাৰ্ট কৰে গেলে বাঁচানো শক্ত...আমাৰ আড়াই হাজাৰ প্লাস নাৰ্গি
হোম। অপাৰেশনে ৰিস্ক একটু-আধটু আছেই। ছ' একটা মায়ো পড়ে। সৰি
বাঁচাতে পাৰলাম না, ভগবানেৰ ওপৰে কাৰো হাত নেই। টাকাটা অবশ্য অপাৰেশনে
আগেই নেয়া হয়ে থাকে। জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম। সৰ্বত্ৰ এই জিনিস—
এনি প্ৰফেশন, এনি মাৰ্ভিস। নাচাৰালি, আমাৰা, মানে গুয়াৰেৰ বাচ্চা সো-কলড
বুদ্ধিজীৱী, আলাদা হতে পাৰি না। আফটাৰ অল আমাৰা হিচ্ছ জাতিৰ বিবেক
আমাৰা পচে না গেলে জাতটা পচে কি কৰে? উই আৰ সিম্পলি ডুইং আণ্ডয়া
ডিউটি টু দ্যা নেশন বাই হেলপিং ইট টু ৰট্। আমাৰ আই ক্লিয়াৰ?

—ইয়েস, আজ ক্লিয়াৰ আজ মাই কনশেন্স।

—যা নেই তাৰ সন্ধে আবার তুলনা কেন? বহুদিন ধৰে ও শালাকে খুঁজে পাও
যাচ্ছে না।

—তবে প্ৰকাশদাৰ সন্ধে প্ৰফেশনাল এথিক্স-ফেথিক্সেৰ বাত ঝাড়ছিলি কেন?

—আমাৰা বুদ্ধিজীৱী। জে. জে. টি. টি।

—মতলব?

—জে. জে. টি. টি—যখন যেমন তখন তেমন। উই দ্যা গুয়াৰেৰ বাচ্চা বুদ্ধিজীৱী

যখন যেমন তখন তেমন। আমাদের কাজ হচ্ছে টু রাইট অ্যাণ্ড টক্ টু আওয়ার বেস্ট ফেল্ফ-ইন্টারেস্ট। বুঝলি ?

—বুঝলাম। তোমার শালা নেশা হয়েছে।

—বোম্বেষ্টে, তুই কি বলছিল যে ? তিন শেগ জিনে তুরূপ সেনের নেশা ? বলিস না, বলিস না, শুনলে লোকে হেসেই মরে যাবে। এই যে ভাই, বাঁদিকে দাঁড় করাও।

ট্যান্সি থেকে নামল ওরা দু'জন। তুরূপ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল—আচ্ছা ব্রাদার, স্বধামাধব হাউসিং এস্টেটটা কোন্‌দিকে ?

ট্যান্সি-ড্রাইভার মিটার তুলে দিতে দিতে বলল—সোজা চলে যান এই রাস্তা ধরে। ডান দিকে দেখতে পাবেন।

—বেশি হাঁটতে হবে ?

—না, মিনিট পাঁচেক।

—খ্যাংক ইউ। বলে তুরূপ হাঁটতে লাগল।

—জায়গাটা পশ্চিম মনে লাগছে না। খাষাটা মন্তব্য করল খানিক পরে।

—মিডল ইনকাম গ্রুপের ফ্ল্যাট হবে পশ্চিম এলাকায় ? নেশা কার হয়েছে বুঝতে পারছিলি ?

—আরে বাবা, অরুণকুমারের ডামি...

—বেস্তেরি, তুই শালা ক্যামেরার বাইরে কিস্তি জানিস না। শোন, ওর এক্সাইটেড মোমেন্টের কয়েকটা স্ল্যাপ আমার চাই।

—পাবি শালা, খাষাটার আত্মপ্রত্যয় নিখাদ, লে, সিগারেট খা।

সিগারেট ধরিয়ে কাঁধের ঝোলা থেকে ডায়েরি বের করে নিলয়ের ঠিকানা দেখে নিল তুরূপ। ডাইনে স্বধামাধব হাউসিং এস্টেটের গেট। তিন কাঁক বাড়ি, একেক কাঁকের চেহারা একেক রকম। দামের হেরফেরে গড়পরতা চেহারার ওপর রং-নকশার এধার-ওধার।

ওরা গেট পেরিয়ে প্রথম বাড়ির কাঁকটার দিকে এগোতে লাগল।

নিলয় তখন নিনার দেয়া মাসকাবায়ী জিনিসের ফর্দটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। কম কম আনলেও দেড়শো টাকার কমে হবে না। বাবুসোনার এক কৌটো ছুধের দামই চল্লিশ টাকার মতো। মা'র ওষুধও ফুরিয়ে এসেছে। হাতে যা আছে তাতে ফর্দের কেনাকাটা, মায়ের ওষুধ হরলিঙ্গ, দিন কয়েকের কাঁচা বাজার বেশন হয়ে যাবে। তারপর ?

ভারপর আবার ঈশ্বরের কাছে অরুণকুমারের জন্ম আরোগ্য ও অনন্ত জীবন-
 যৌবনের প্রার্থনা জানিয়ে যেতে যেতে 'হা টাকা, হা টাকা' করে হস্তে হস্তে বেড়ানো।
 রাজারের পাওনা আদায়ের চেষ্টা নিরর্থক—এটা পরিষ্কার। নিনার চারপাছা চুড়ি
 আর কানের ঝিং ছুটিতে হাত দেয়া, ও নিজে থেকেই দিতে চাইবে, অসম্ভব। ধার
 দিতে পারে এবং দেয়ার ইচ্ছা আছে এমন মানুষ নিলয়ের জানা নেই, অন্তত মনে
 পড়ছে না আপাতত।

এক আছে পুস্তি। ওর কাছে হাত পাতা যায়। দুটো জিনিস—আমৃত জানানো
 এবং হাত পাতা—হয়তো পুস্তির কাছেই একমাত্র অসংকোচে করা যায়। কিন্তু টাকাটা
 তো আসবে পুস্তির বয়ের কাছ থেকে—কৌশলে হাতানো কিংবা বলে আনা। হয়তো
 পুস্তি হাতানোই পছন্দ করবে, স্বামীর কাছে দাদাডাইকে ছোট করতে চাইবে না।
 কিন্তু নিলয় মনের সান্ন পাচ্ছে না।

আরেক আছে বত্তভাণ্ডার—নিজেদের আলমারির লকারেই। ভাবতেই শিউরে
 উঠল নিলয়। মার কাছে উলঙ্গ হলেও রাজার মতো ঠাঁড়ানো যায়। মা তাঁর সর্বস্ব
 দিয়েও সম্ভানকে রাজবেশে সাজিয়ে দেবেন। কিন্তু রাজস্বহীন সেই রাজা ভারপর
 রাজবেশ বিক্রি করে স্ত্রী-পুত্রের অন্নসংস্থান করবে।

অন্তএব হে অরুণকুমার, হে ঈশ্বরের শ্রিয় পুত্র, আইস, পাণী সকলকে তাহাদের
 দুঃখতাপ হইতে পরিত্রাণ করহ। ঈশ্বরপুত্র কহিলেন, যে আমাতে আইসে, যে আমার
 সত্যে হৃদয় রাখে, তাহার হৃদয় আমাতে সূর্যের মতো আলোক দেখিরা লাহলী হয়।
 এ সমস্ত গভীর জটিল বিষয় চিন্তার জন্ম অনন্ত রাত পড়ে আছে সামনে। আপাতত
 ফর্দের জিনিসগুলো এনে দেয়া যাক। নিনার সংসারযাত্রা সরল হবে।

বাজারের খলে হাতে নিলয়ের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা তুরূপ আর খাষাটার।

—আরে মশাই, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। ভাগ্য ভালো আমাদের, দেখা
 হয়ে গেল। তুরূপ অমায়িক ও অন্তরঙ্গ।

চলচ্চিত্র-সংবাদিকতায় দুই বিখ্যাত ব্যক্তি তুরূপ সেন, জ্যাকি খাষাটা। নিলয়
 ওদের বহুবার দেখেছে, যদিও আলাপ-পরিচয়ের প্রয়োজন বা সুযোগ হয়নি।

—আপনারা! আনুন, আনুন। নিলয় বিস্মিত ও স্তব্ধ।

নিলয়ের বাইরের ঘরে বসে তুরূপ আর খাষাটা মুহূর্ত চোখে চোখে ইশারত
 বিনিময় করল। মর্মার্থ—'দেখছিল ব্যাটার অবস্থা?' 'তা-ই তো দেখছি।'

—আমার এ রকম হোমলি পরিবেশ ভারি ভালো লাগে। তুরূপ একেবারে পারিবারিক হয়ে উঠল, বলল পায়ে ওপর পা তুলে।

—আমার দেশের ঘর বিলকুল মনে পড়ল। খাষাটা বিলকুল মিথো বলল, বোম্বোতে ওর বাবা নামকরা টেক্সটাইল মিলের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভাইজার।

নিলয় ওদের একটি শব্দও বিশ্বাস করছিল না, তবু মুখে হাসি মাখিয়ে বিনয়ের অবতার হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর ওদের মতলব আঁচ করবার চেষ্টা করছিল।

—নিলয়বাবু, তুরূপ বলল, আমরা আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাই।

—আমার ইন্টারভিউ? ঠাট্টা করছেন? নিলয় বলল।

—কেন, আপনার সঙ্গে ইন্টারভিউ কি বিনোদন-বার্তার আকর্ষণ বাড়তে পারে না? বড় বড় নায়করা ডামি ছাড়া অচল। দর্শকরা কি তা জানে? দরজাটা কাইগুলি বন্ধ করে দিন। আমরা কনফিডেনশিয়ালি আলাপ করতে চাই। তুরূপ বলল মাঝখানের দরজাটা দেখিয়ে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিলয় বলল—ডামি যে ব্যবহার করা হয় এটা বোধ হয় অনেকেই জানে। নায়কদের পক্ষে লাইফ রিস্ক করে শট দেয়া সম্ভব নয়, ওদের লাইফের দাম অনেক, তাছাড়া ফিজিক্যাল ফিটনেস অগ্রাণ্ড স্কিলও অনেকেই থাকে না। তাই রিস্ক-শটে ডামিদের দরকার হয়। আমার মনে হয় না দর্শকদের কাছে এটা খুব একটা নতুন নিউজ।

তুরূপ: সাধারণভাবে ডামিদের নিয়ে আমারও মাথাব্যথা নেই। বাট ইউ আর এ ভেরি ভেরি স্পেশাল ডামি। আপনার সঙ্গে অরুণকুমারের চেহারার অন্তত মিল থাকার ফলে আপনাকে যেভাবে ইউজ, আই শুড সে এক্সপয়েট, করা যায় তা কি অল্প ডামিকে দিয়ে সম্ভব?

প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিলয় বলল—আমি ওর ডামি হবার অনেক আগে থেকেই অরুণকুমার সুপার-স্টার।

তুরূপ: আরে মশাই, তা কি আপনার কাছ থেকে আমাকে জানতে হবে? কিন্তু আপনি ওর ডামি হবার পর থেকে ও যে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে তার খবর আপনি না বলতে চাইলেও আমাদের জানা আছে। এমন অনেক রিস্কি ব্লোজ শটের জন্য অরুণকুমার বাহবা পায় বেগুলো লং-শটে অল্প ডামি দিয়ে করলে কখনোই ঐ থেকে হতে পারে না।

নিলয়ের অজান্তে ওর মুখে তিক্ত হাসির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল। চোখ দুটো দেয়ালে অরুণকুমারের সঙ্গে ওর একটা সিনেমার দৃশ্যের ছবির ওপর স্থির।

কামেরার ক্লাশ-গানের হঠাৎ-আলোর বলকে চমকে উঠল নিলয়। ও তাকাল খাষাটার দিকে। তৎক্ষণাৎ আবার শাটার টিপল খাষাটা। আবার আলোর বলক।

—আ্যমেজিং, আ্যমেজিং, ঐ মোমেন্টে ঠিক যেন অরুণকুমার, লোভ সামলাতে পারলাম না। খাষাটার মুখ খুশিতে সারলো শিশুর মতো।

বিনা অহুমতিতে ছবি তোলার জন্ত নিলয় রাগে ফেটে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সামলাতে সাহায্য করল খাষাটার শিশুর মতো মুখ। কিন্তু ঐ অশাপবিদ্ধ মুখে তুরুপের দিকে তাকিয়ে তার বাঁ চোখের এক সেক্টিমিটার মাপের নিপুণ কারুকাজ দেখার বা অর্থ অহুধাবন করার মতো চতুর নিলয় নয়।

—শ্রীজ, খাষাটার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল নিলয়, আমার ছবি কাগজে ছাপবেন না।

—মিথো কেন আপনার আপত্তি বুঝতে পারছি না, ইন্টারভিউ দিন, ছবি-টবি দিয়ে ছাপা হবে, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন। এতদিন যে সার্ভিস দিয়েছেন কি পেয়েছেন তার দাম? আপনার ইনকাম মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। অরুণকুমারের তুলনায় কিছুই না। তার চেয়েও বড় জিনিষ আপনার কাজের কোনো অ্যাগ্রিসিয়েশন নেই। তুরুপ বলল।

নিলয় : অরুণকুমারের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না, আর্টিস্টের সঙ্গে ডামির তুলনা হয় না। তাছাড়া, সিনেমা শিল্পের মাথারা, অরুণকুমার নিজেও, আমাদের পাবলিসিটি দেয়া পছন্দ করেন না। বিনোদন-বার্তার মতো নামকরা কাগজে আমার ইন্টারভিউ বেকনোর ফল আমার পক্ষে খারাপ হবে।

তুরুপের মুখ হঠাৎ গম্ভীর দেখাল।

—না বেকলেও আপনার স্ববিধা হবে না। ব্যাণ্ডো সাহেব আমাদের প্রোজেকশন দেখিয়েছেন। কয়েকখানা স্টিলও আমরা তৈরি করিয়ে নিজেছি। বুঝতেই পারছেন হু'বোতল স্বচের টাকা আমরা অমনি অমনি খরচ করিনি। ইন্টারভিউ অর না ইন্টারভিউ, ওগুলো আমরা ছাপবই।

—আপনাদের লাভ?

—আপনি কি বলছেন নিলয়বাবু? যে সিনে অরুণকুমার আহত হল তার স্ট্রিক্টর গুলি ছাপতে পারলে যে কোনো কাগজ লাখ খানেক কপি বেশি বিক্রি করতে পারবে। পরের ইস্যুগুলোতেও ফলো-আপ নিউজ থাকবে। আপনি নিউজ-ওয়ার্ল্ডের লোক হলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন। যা-ই হোক, ছবিগুলো আমরা ছাপছি।...

তবে ছবিগুলোকে আমরা নিশ্চয়ই ইন্টারপ্রেট করব। কি কায়দায় করব তা নির্ভর করছে আপনার ওপর।

—আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। নিলয়ের মুখ ফ্যাকাশে।

—আপনার বোঝার দরকারও নেই। নিলয়বাবু, আপনি কি ভাবছেন জানি না, কিন্তু অরুণকুমার স্বস্থ হয়ে ওঠার পর আপনার প্রফেশনাল লাইফ কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের ওপর। কো-অপারেশন বিগেটস্ কো-অপারেশন। আপনি বেশি আর জানতে চাইবেন না। সাহায্য করুন, সাহায্য পাবেন। নিন এটা রাখুন। তুরূপ তার ঝোলা থেকে দু'খানা দশ টাকার নোটের হাজার টাকার বাণ্ডিল নিলয়ের সামনে রাখল।

—এ কি? টাকা কিসের? নিলয় বিভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করল।

—আপনার কো-অপারেশনের দাম বা পুরস্কার। দেখুন নিলয়বাবু, দু'হাজার টাকা আপনার-আমার কাছে অনেক। কিন্তু বিনোদন-বার্তার কাছে নাথিং। একটা ভালো স্টোরির জগ্ন আমরা কত টাকা খরচ করি তা লোকে ধারণাও করতে পারে না। টাকাটা তুলে রাখুন। তাহলে এবার আমরা শুরু করি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো টাকার বাণ্ডিল দুটো তুলে নিল নিলয়।

ঝোলা থেকে টেপ-রেকর্ডার বের করল তুরূপ—নিলয়বাবু, আমাদের ইন্টারভিউ রেকর্ড করে রাখব। নিউজ বা কারো বক্তব্য ডিসটর্ট করা আমি ভীষণ অপছন্দ করি। প্রফেশনাল এথিক্স মেনে চলা আমার একটা দুর্বলতা! সাংবাদিকতা মানে মিথ্যাচার নয়। আচ্ছা, শুরু করা যাক।

টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপল তুরূপ।

—আচ্ছা, নিলয়বাবু, আপনি তো অরুণকুমারের ডামির কাজ করেছেন বহু ছবিতে?

—হ্যাঁ, ওঁর চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার একটু মিল থাকায়...

—একটু নয়, অনেকটাই। অল্প দূর থেকে দেখলেও লোকে আপনাকে অরুণকুমার বলে ভুল করবে। সেজগ্ন আপনার বিশেষ অ্যাডভানটেজ আছে। বড় অভিনেতার চেহারার সঙ্গে ডামির চেহারার মিল থাকলে দু' তরফেরই সুবিধা। আপনার কি মনে হয়?

—অক্ষয়কুমারের স্ববিধার কথা আমি বলতে পারব না। তবে আমার স্ববিধা নিশ্চয়ই। ঊঁর ছবিতে আমি কাজ পাই।

—অক্ষয়কুমারের কাছে তাহলে আপনি কৃতজ্ঞ ?

—অবশ্যই। তবে তার চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ ভগবানের কাছে, কারণ তিনি আমাকে অনেকটা অক্ষয়কুমারের মতো করে তৈরি করেছেন।

—আচ্ছা, নিলয়বাবু, ধূলুর স্বপ্নের যে দৃশ্যে অভিনয় করার সময় অক্ষয়কুমার আহত হন, সেই দৃশ্যে তখন তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছিলেন তো আপনি ?

—হ্যাঁ, আমি।

—এই স্টিলগুলো কি সেই দৃশ্যেরই ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, দেখলে মনে হয় না যে আপনি অক্ষয়কুমারকে আঘাত করছেন ?

—এ...এ...এ...তো অভিনয় !

—না, না, আপনি উত্তেজিত হবেন না। অভিনয় তো বটেই। চমৎকার অভিনয় করেছেন আপনারা। অক্ষয়কুমার বড় অভিনেতা, কিন্তু আপনার অভিনয়ও অপূর্ব হয়েছে। এগুলো স্টিল। আমি সিনটার প্রোজেকশনও দেখেছি।

—ও !

—নিলয়বাবু, আপনার ডামি হয়ে না থেকে অভিনেতা হতে ইচ্ছে করে না ?

—বোকার মতো ইচ্ছে করে লাভ কি ?

—বোকার মতো ইচ্ছে বলছেন কেন ?

—অক্ষয়কুমারের মতো চেহারা নিয়ে তাঁর ডামি হওয়া যায়, আলাদা একজন অভিনেতা হিসেবে সিনেমায় জায়গা পাওয়া অসম্ভব।

—ঠিকই বলেছেন আপনি। এর জগ্গে কি আপনার মনে কোনো ক্ষোভ নেই ? কোনো রাগ নেই ?

—ক্ষোভ ? রাগ ? কার বিরুদ্ধে ?

—ধরুন, অক্ষয়কুমারের বিরুদ্ধে।

—আমাকে কি আপনার পাগল বলে মনে হচ্ছে ? যার জগ্গ আমি করে খেতে পারছি তার বিরুদ্ধে থাকবে আমার রাগ ? বরং ভগবানের বিরুদ্ধে রাগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। কারণ আমাদের মতে তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

—ডামিকে সাধারণত কি ধরনের কাজ করতে হয় নিলয়বাবু? তাদের কি বিশেষ ট্রেনিং দরকার হয়?

—ভুরুপবাবু, এসব আপনি আমার থেকে ভালো জানেন।

—তবু আমাদের পাঠকদের জ্ঞান বলুন না।

—সাধারণত ডামির প্রয়োজন হয় রিস্ক-শটে হিরোকে শারীরিক ব্লক থেকে বাঁচানোর জ্ঞান। মনে করুন, হিরো বাড়ির পাইপ বেয়ে ছাদে উঠছে বা দারুণ স্পীডে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী খাদের পাশ দিয়ে। আপনি আশা করতে পারেন না কোনো দামী হিরো এ ধরনের শট দিতে গিয়ে তার লাইফের রিস্ক নেবে। তাছাড়া আরেকটা স্তবিগও হয় যদি হিরোর সঙ্গে ডামির চেহারার বেশ মিল থাকে। সেখানে ডাবল রোলে অভিনয়ের সময় শট, টেকিং ও এডিটিংয়ের কামেলা কমিয়ে আনা যায়।

—যেমন ধূসর স্বপ্নে?

—হ্যাঁ, যেমন ধূসর স্বপ্নে।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে অনেক রোলে হিরোর সাকসেসের মূলে অনেকটা অবদান আপনারদের, অথচ আপনারদের কোনো স্বীকৃতি নেই, টাকাপয়নার প্রশংসা না তোলাই ভালো। হিরোর তুলনায় আপনারা যা পান...

—না...না...অভিনয় অনেক সূক্ষ্ম জিনিস। তার সঙ্গে সার্কাসের খেলোয়াড়ের তুলনা হয় না ভুরুপবাবু।

—আনালজিটা টেনেছেন ভালো। কিন্তু আমারও একটা আনালজি আছে, আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে। বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী-কমন্ত্রী যে ভাষণ দেয়, সেগুলো লিখে দেয় তাদের সেক্রেটারিরা। বাহবা পায় নেতারা। এমন কি, অনেক সময় এসব ভাষণ আবার বই হয়ে বেরোয়। মানুষ পড়ে ধন্তি ধন্তি করে, আহা কি দেশপ্রেম, কি ইতিহাস-চেতনা, সমাজনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতির কি গভীর জ্ঞান। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, সেক্রেটারি মশায়ের বুকের ভেতরটা কি তখন খচখচ করে না?

—মানুষ যখন, করে বই কি। তবে এটা মেনে নিয়েই তো চাকরি করা।

—তাহলে আপনার মনটাকেই বা স্বীকার করেন কি করে?

—আপনার তুলনাটা ঠিক হয়নি। একজন ডামির কাজ আর একজন উচ্চশিক্ষিত সেক্রেটারির কাজে অনেক তফাত।

—মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আসল জায়গাটায় মিল আছে। দু'জনেই নিজের সত্তার অংশ অল্প একজন মানুষকে নিঃশব্দে দিয়ে যায় তাকে ভুলে ধরবার জন্য।

—নিঃস্বার্থভাবে নয়। তারা এর জন্য টাকা পায়। টাকা পাওয়ার শর্তও এটা।

—কিন্তু যা পাওয়া উচিত সে টাকা তারা পায় না। মর্ঘাদার প্রথম বাদই দিলাম। দেখুন, মানুষের মন বলে একটা বস্তু আছে। সে এটাকে সাধারণ মানুষের জিনিসপত্রের প্রতিদিন বেড়ে-যাওয়া দামের মতো মেনে নিতে পারে বলে আমার মনে হয় না। মনের কোণে অল্প-বেশি বেদনা দুঃখ জ্বালা থাকবেই। সকলের ক্ষেত্রে মাত্রাটা হয়তো সমান নয়।

—থাকতে পারে। আমি শুধু আমার মনটাকেই জানি।

—যাক, বাদ দিন ও প্রসঙ্গ। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে অরুণকুমারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন ছিল? আই মীন, আপনারা কি বন্ধু ছিলেন?

—আপনি কি বলছেন তুরুপাবু? অরুণকুমারের বন্ধুবান্ধবদের আপনি আমার চেয়ে ভালো চেনেন। আমার মতো অতি সাধারণ একজন মানুষ অরুণকুমারের বন্ধু হতে পারে কি? স্ট্যাটাস মানতেই হবে। বন্ধুত্ব সমানে সমানেই হয়। উনিশ-বিশ তফাতেও চলে। কিন্তু অরুণকুমার আর নিলয় মজুমদারে চলে না। উনি নিশ্চয়ই আমাকে অপছন্দ করেন না। কিন্তু বন্ধুত্ব? না...না...।

—টাকাপয়সা আর জনপ্রিয়তাই কি একজন মানুষের বড়ত্বের মাপকাঠি?

—আপনি কি বলেন জানি না, সমাজ তা-ই বলে। অবশ্য প্রতিভাও একটা মস্ত বড় জিনিস। সেখানেও অরুণকুমার একালের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, আর আমি বড় জোর একজন মিডিওকার জিমস্টার্ট।

—অরুণকুমার নিশ্চয়ই অসাধারণ প্রতিভাবান অভিনেতা। কিন্তু তার অভিনয় জীবনের নেপথ্যে আপনার অবদানও কম নয়। তাহলে বন্ধুত্ব হতে পারে না কেন? বহু অসাধারণ মানুষের সাধারণ বন্ধু ছিল।

—বিষয়টা কি আলোচনা করবার মতো জরুরী? বাদ দিন না—

—না নিলয়বাবু, বাদ দেবার বিষয় এটা নয়। হয়তো আমার কৌতূহল অ্যাকাডেমিক, কিন্তু আমি কেবলই ভাবি যখন জীবিকার প্রয়োজনেই হোক বা শিল্পের প্রয়োজনেই হোক দুটে। মানুষের সত্তা সাময়িকভাবেও অভিন্ন হয়ে যায়, তখন বাইরের জীবনেও তাদের খুব কাছাকাছি আসাই স্বাভাবিক।

—আপনার ধারণা ভুল। ডামি আমি একলা নই। তাদের অভিজ্ঞতাও আলাদা নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

—আমি কিন্তু অর্ডিনারি ডামিদের সম্বন্ধে বলছি না। দে আর জার্স্ট নন-আইডেনটিটি, বাট ইউ টু আর এক্সচেঞ্জিং আইডেনটিটিজ—আপনি আর অরুণকুমার।

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। তবে আপনার জেনে রাখা ভালো আমারও কোনো আইডেনটিটি নেই। প্লীজ, এ নিয়ে আর প্রশ্ন করবেন না।

—না করতে হলেই খুশি হতাম। কিন্তু আপনার ভালোর জগুই করা দরকার। আপনি কি জানেন যে কিছু লোক রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে আপনি ইচ্ছে করে অরুণকুমারকে আঘাত করেছেন?

—মিথো কথা। বানানো গল্প। শয়তানি।

—কিন্তু লোকের মুখ আপনি বন্ধ করবেন কি করে?

—অরুণকুমারকে আঘাত করে আমার লাভ? উনি অস্থস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে আমাকে কি অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে জানেন? ওয়া মিথোবাদী, বদমাশ...

—ওরা বলছে ঈর্ষা, ঈর্ষাই আপনার অরুণকুমারকে আঘাত করার কারণ। অরুণকুমারের জগু আপনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন বারবার, বহু ডিম্ফিকাল্ট শটে ওকে উতরে দিয়েছেন, অখচ উনি আছেন সম্রাটের মতো, আপনি...

—মিথো, মিথো, মিথো। অল ব্লাডি লায়ারস...

—সেইজগুই আমি বুঝতে চাইছিলাম আপনাদের সম্পর্কটা ঘণার না বন্ধুত্বের।

—কি বুঝেছেন আপনি?

—বুঝতে পারিনি নিলয়বাবু। ইন্টারভিউর জগু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

খুট করে বোতাম টিপে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করে দিল তুরূপ।

খাখাটা ইতিমধ্যে কয়েকবারই তার বোম্বটে নামের মর্ঘাদা রক্ষা করে নিলয়ের বিশেষ বিশেষ অভিযান্ত্রিক মুহুর্তে ক্যামেরার শাটার টিপেছে।

—নিলয়বাবু, তুরূপ বলল, আপনি যদি চান আমাদের ইন্টারভিউর ক্যাসেটের একটা কপি করে দিচ্ছি।

—দরকার হবে না। নিলয়ের গলায় অসীম ক্লাস্তি।

—আরেকটা ফ্রুগলি অ্যাডভাইস আপনাকে দিচ্ছি নিলয়বাবু, আপনি স্থলক্ষণার সঙ্গে একবার দেখা করুন।

—কেন?

—আমি যতদূর দেখেছি ওর মতো নটোরিয়াস মেয়েছেলে ফিল্ম লাইনে দ্বিতীয়টি নেই। ওকে আমড়াগাছি করে এলে আপনার পক্ষে ভালোই হবে।

—আমাকে পান্ডা দেবে কেন ? হয়তো দেখাই করবে না ।

—করবে, করবে, তুরূপের হাসি বহুশ্রম, আচ্ছা, তাহলে এবার ওঠা যাক ।
ধনুবাদ এবং নমস্কার ।

নিলয় নিঃশব্দে হাত তুলল ।

রাতায় নেমে তুরূপ বলল—যাক, আরেকটা নতুন অ্যাঙ্গেল পাওয়া গেল ।

খাষাটা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল তুরূপের দিকে—মতলব ?

—আরে বুদ্ধ, স্থলক্ষণার সঙ্গে ওকে দেখা করতে বললাম কেন ? নজর রাখতে হবে ও যায় কিনা, জাস্ট এ নাইস বিট অব স্কাণ্ডাল...হাঃ...হাঃ...

—শালা চুতিয়া আছিস মাইরি তুই, ব্যাটাকে একেবারে চৌপট করে দিলি ।
তুরূপকে বাহবা জানাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল খাষাটা ।

মাঝখানের দরজাটা খুলে দিতেই নিনার প্রশ্নের মুখোমুখি হল নিলয় ।

—কারা এসেছিল ? দরজা বন্ধ করে এত কি শলা-পরামর্শ ?

মা বসে আছেন খাতে । পাশে বাবুসোনা । মা'র মুখেও প্রশ্ন ও হুশিস্তার ছায়া ।

নিলয় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন বোধ করছে না । নিজেই অনেক বুদ্ধির অভিজ্ঞ বোদ্ধা ভাবার সামান্য গোপন আশ্রয়-গরিমা তার ছিল । কিন্তু ক'দিনে সেই জায়গাটা একেবারে শূন্য, এমন কি আশ্রয়-বিধ্বাসের দুর্বল শিকড়গুলিও উপড়ে যাবার মুখে । মাহুঘের জটিল অরণ্যে সহসা সে দিশাহারা পরযাত্রী । কাউকে অন্তরালের আশ্রয় দেবার সাধ্য তার নেই । সে নিজেই নগ্ন, অসহায় ; তুরূপ সেনের মতো মাহুঘেরা আজ তাকে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে । দু'হাজার টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে যে ইন্টারভিউটা তুরূপ কিনে নিয়েছে, নিলয় বুঝতে পারছে না, গতামুগতিক কিছু কথাবার্তার জন্ত এত টাকা সে কেন দিল । ইন্টারভিউ দিতে যাতে সে বাধ্য হয় সেজন্ত ইচ্ছিতে ভয় দেখাতেও ছাড়েনি । কিন্তু কেন ? তুরূপ সেন তার মতো মোটাবুদ্ধির মাহুঘ নয় । খেলা নিশ্চয়ই একটা আছে, কিন্তু নিলয়ের ধারণার বাইরে সেটা ।

—টাকাটা বেখে দাও । দশটাকার নোটের বাণ্ডিল ছুটে নিনাকে দিল নিলয় ।

—টাকা কোথায় পেলে ? এত টাকা !

—তুরূপ সেন এসেছিল জ্যাকি খাষাটাকে নিয়ে । ওরা দিয়েছে ।

তুরূপ সেন জ্যাকি খাষাটার পরিচয় নিনার জানা ।

ওরা তোমাকে টাকা দিল কেন ?

—আমার ইন্টারভিউর দায় ।

—তুমি জগদীশদাকে জিজ্ঞেস না করে ইন্টারভিউ দিতে রাজী হলে কেন ?

—উপায় ছিল না । তাছাড়া দু'হাজার টাকা...

—তুমি ওদের উদ্দেশ্য জান না । টাকা দিয়ে ইন্টারভিউ নেয় বলে আমি শুনি নি ।

—জানলেও উপায় ছিল না, ইন্টারভিউ আমাকে দিতেই হত ।

—না দিলে ?

মুহূর্ত খেমে নিলয় বলল—টাকার প্রয়োজন আমাদের আছে । কিন্তু টাকার লাভে আমি ইন্টারভিউ দিইনি নিনা । তুরূপ সেনের কলমকে সকলেই ভয় করে । আমি ওর উদ্দেশ্য জানি না । হয়তো আমার ক্ষতিই করবে । কিন্তু ইন্টারভিউ না দিলেও ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, তাই টাকাটা নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে ।

নিলয়ের বিভ্রান্ত মুখের দিকে মুহূর্ত তাকিয়ে রইল নিনা । তারপর টাকাটা রাখবার ছত্র আলমারি খুলতে লাগল ।

মা বললেন—বোস্ নিলু ।

নিলয় খাটে বসল ।

—তোমার কি কোনো বিপদ হয়েছে বাবা ? ক'দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে তুই যেন সব সময় কি ভাবিস ।

—ছোটখাট একটা গোলমাল । আমাদের লাইনে এ হয়েছেই থাকে । মিথ্যে ভাবে তুমি শরীর খারাপ করো না । সব ঠিক হয়ে যাবে । নিলয় ম্লান হাসল ।

সব ঠিক হয়ে যাবার আশ্বাস কিন্তু মায়ের কানে বিশ্বাসযোগ্য শোনা়ল না । তিনি ধু বললেন—দেখিস বাবা, বুকে-শুনে চলিস ।

মাঝবয়েসী গোলগাল লোকটি। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা বাঁ কান ঘেঁষে সিঁথি কাটা, চুলের নিচে সরু কপাল। অস্বাভাবিক ঘন জ্বর নিচে কৃতকৃতে দুটো চোখ। খলখলে মাংসল মুখে স্তম্ভ গোঁফের কারুকর্ম। পরনে গিলে-করা আন্দির পাঞ্জাবি, চণ্ডা পাড়ের দামী ধুতি, পায়ের চপ্পল জোড়ার দাম নিলয়ের ধারণার বাইরে। গলায় শোনার চেন-হারে নিলয়ের অচেনা এক গুরুদেবের ছবি সহ ত্রিকোণ লকেট—রোমশ বুকের আরামে আশ্রিত। হাতের মোটা আঙুলে দামী পাথর-বসানো আংটির সংখ্যা ও জৌলুস লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে চেহারায় একটা অভদ্র আভিজাত্য। লোকটাকে কখনো দেখেছে বলে নিলয় মনে করতে পারল না।

—নিলয়বাবু, আমাকে আপনি চিনবেন না, লোকটা জাঁকিয়ে বসে বলল, কিন্তু আপনাকে আমি ভালোমতোই চিনি, মানে, নিজের প্রয়োজনেই চিনে নিতে হয়েছে। আমি আপনাদের লাইনের লোক নই। আমার নাম কৃষ্ণপদ মল্লিক। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি, গোটা কয়েক বার্ডি-টাড়ি আর তিনটে ব্যবসা নেড়ে-চেড়ে খাই। ই্যা. নিচে নতুন কনটেক্স গাড়িটা রেখে এসেছি। বানচোং ড্রাইভারটা আজকে আসেনি। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি। গাড়িটা ড্যামেজ করে দেবে না তো কেউ। দিনকাল যা হয়েছে অকহতব্য।

—না, সে ভয় নেই। এখানে মোটামুটি ভদ্রলোকেরাই থাকে।

—কিন্তু শালার ভদ্রলোকের ছেলেগুলো যে ভদ্রলোক নয়। যাক যেজগ্রে আসা, কি কৃষ্ণপদই যে মশাই ফিলিম করবার শখ চাগিয়েছিল! দুবস্ত যৌবন বলে কোনো ছবির নাম আপনি শুনেছেন?

স্বৃতি হাতড়ে নিলয় বলল—না।

শুনলেও মনে নেই। কম দিন নয়, বছর আটেক ছবিটা আটকে আছে। অরুণকুমার হিরো, নতুন হিরোইন। তিন-চারদিনের কাজ মাত্র বাকি ছিল। অরুণকুমারের বায়নাঙ্কায় ছবি আটকে গেল। গেল তো গেলই। এমন ডাঁট মশাই ইয়ের বাচ্চাটার, একবার না বলেছে তো না-ই, কিছুতেই ই্যা করাতে পারলাম না।

নিলয়ের কাছে ব্যাপারটা গোলমলে ঠেকতে লাগল।

—অরুণকুমারের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার চুক্তি হয়েছিল। লিখিত চুক্তি ছাড়া উনি কাজ করেন না।

—তা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি না মানলে আমি কি করতে পারি বলুন? কৃষ্ণপদ নিরুপায়ভাবে ঘাড় নাড়ল।

নিলয় হেসে ফেলল।—আপনি এত বিষয়সম্পত্তির মালিক, এতগুলো ব্যবসা চালান, আপনি জানেন না চুক্তিভঙ্গ করলে কি করতে হয় ?

—জানি বই কি নিলয়বাবু, নিশ্চয় জানি। কিন্তু ঐ যে গরিবের ঘোড়ারোগ হয়েছিল। আমি চুনোপুঁটি, অরুণকুমার রাঘব বোয়াল। ওর সঙ্গে কোর্ট-কাছারি করে আমি পারব কেন ?

—তাহলে কোর্টে আপনি গিয়েছিলেন বলুন ?

—না ষাওয়ার মতোই। কৃষ্ণপদ নিলয়ের প্রপঞ্চটাকে এড়িয়ে গেল।

—যাই হোক, আমাকে এ গল্প শুনিয়ে আপনার লাভ ?

—আছে বই কি, আছে বই কি লাভ, নইলে মশাই, সাত-সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে আসি।

—বলুন, আমি কি করতে পারি।

—তিন-চারদিনের কাজ হলেই ছবিটা শেষ হয়ে যায়। আপনি অরুণকুমারের বদলি হিসেবে কাজটা তুলে দিন। দশ হাজার টাকা আপনাকে দেব—পুরোটাই মাগাম।

বিস্ময়কর টাকার অঙ্কটা শুনে নিলয়ের বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত কয়েকটা লাফ দিল। দশ হাজার টাকা! নিরাপদ নিশ্চিত কয়েকটা মাস। ভেবে-চিন্তে ভবিষ্যতটাকে ঢলে সাজাবার মতো সময়। কিন্তু বাপারটা নিঃসন্দেহে জটিল, ঘোরালো। এক ঝাঁক প্রপঞ্চ ধাওয়া করে এল নিলয়ের মাথায়। মিনিট খানেক চুপ করে বসে থেকে নিজেকে গুছিয়ে নিল ও।

তারপর বলল—কৃষ্ণপদবাবু, দশ হাজার টাকা আমার কাছে লোভনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কাজে হাত দেয়ার আগে আমাকে সবদিক ভেবে দেখতে হবে। কেননা, আমার ভবিষ্যতের প্রপঞ্চ আছে। কিছু মনে করবেন না, আমার কতকগুলো প্রপঞ্চ আছে। উত্তর দেয়া না-দেয়া আপনার ইচ্ছে, কিন্তু না জেনে আমার পক্ষে এগনো সম্ভব নয়।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মিনে-করা রূপোর ডিবে থেকে নাকে নশ্চি ঠাসল কৃষ্ণপদ।

—আপনি বখন আমাকে খুঁজে বের করেছেন, ধরে নিতে পারি ফিল্মে আমি কি কাজ করি তাও আপনি জানেন। অরুণকুমারকে চটিয়ে আমার পক্ষে কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। আপনার সঙ্গে অরুণকুমারের গোলমাল কি মিটে গেছে ?

—সে আমি মিটিয়ে নেব। তার জন্ত চিন্তা করবেন না।

—মিটেই যদি যায় তাহলে ঔর কাজ ঔকে দিয়েই করান না ।

—ও যে আবার কাজ করতে পারবে, পারলেও কবে পারবে তার ঠিক নেই ।

—তাহলেও বদলি দিয়ে কাজ করিয়ে নিজের নাম খারাপ করতে উনি রাজী হবেন কেন ? ঔর মতো অভিনয় তো আমি করতে পারব না ।

—ওকে রাজী করানোর দায়িত্ব আমার । আর অভিনয় ? লোকে আসল-নকলে কারাক বুঝতেই পারবে না এমন ক্যামেরাম্যান আমার হাতে আছে ।

—তার মানে অরুণকুমারের গেইট, এক্সপ্রেশন, ক্লোজ-আপ থাকবে না । দর্শককে বোকা বানানোর জন্য ক্যামেরাম্যান অ্যাঙ্কেলগুলো ঠিক করে নেবে । লং-শটে ঔর সঙ্গে আমার পার্থক্য বোঝা যায় না । কিন্তু ভয়েস, ডেলিভারি পাব কোথায় ?

শিখের ক্রমালে গৌর পর্বস্ত গড়িয়ে আসা নস্ত্রি-মেশা নাকের জল সশব্দে মুখে কুঞ্চনদ বলল—গলাও ভাড়া পাওয়া যায় । চোখ বুজে শুনেলে বুঝতে পারবেন না । কে কথা বলছে, অরুণকুমার না আর কেউ । সব বন্দোবস্ত আমার করা আছে । রাজী হয়ে যান মশাই, রাজী হয়ে যান ।

বাঃ, চমৎকার, নিলয় ভাবল, দ্বিতীয় অরুণকুমার দেবে শরীর, অবয়ব, তৃতীয় অরুণকুমার দেবে কণ্ঠ । তৈরি হবে প্রথম অরুণকুমারের জীবন্ত বিগ্রহ । প্রথম আসল এক এবং অদ্বিতীয় অরুণকুমার দেবে শুধু তার নামের ঐশ্বর্য । কত টাকার বিনিময়ে । দশ হাজার নিশ্চয়ই নয় । তিরিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেক তার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে । এজন্য রোগশয্যা থেকে টয়লেটে যাবার কষ্টটুকুও তাবে স্বীকার করতে হবে না ।

—ধরুন, নায়কের সমস্যার সমাধান হল । কিন্তু নায়িকা ? নিলয় জিজ্ঞেস করল

—আরে মশাই, আমিই প্রথম ওকে চান্স দিয়েছিলাম । ঐ প্রথম ঐ শেষ মাগী এখন হোটেলের নাচে । তু তু করে ডাকলেই ছুটে আসবে ।

কুঞ্চনদর কথাবার্তার অশিক্ষিত অমার্জিত পয়সার গরম নিলয়ের ভালো লাগছিল না । কিন্তু দশ হাজার টাকার অঙ্কটা ভালো-লাগা মন্দ-লাগার অনেক ওপরে অরুণকুমারের যদি সম্মতি থাকে তাহলে নিলয়ের কাজটা নিতে বাধা কোথায় ?

—অল্প বোলের আর্টিস্টদের পাবেন ? নিলয়ের প্রশ্ন ।

—ওদের কোনো কাজ নেই । দু'একটা ছুটকো লোক লাগবে । ও রামা-শ্রামাবে দিয়ে করিয়ে নেব ।

—বেশ, আমি রাজী আছি, নিলয় খানিকক্ষণ ভেবে বলল, কিন্তু অরুণকুমারের ে

এতে আশঙ্কি নেই তা আপনাকে লিখে দিয়ে আমার সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। আমি বামেলার জড়াতে চাই না।

—আবার লেখাপড়ার বক্কাট কেন, কৃষ্ণপদর বকমকে আংটি-পরা আঙুলে নসিয়ার কৌটোটা খেলা করতে লাগল, দশ হাজার কাশ-ডাউন পাবেন কাজ শুরু করার আগেই, রসিদও দিতে হবে না। ইনকাম-ট্যাক্সের কোনো বামেলা থাকবে না আপনার। বলুন, এটুকু কাজের জন্য দশ হাজার টাকা কি কম হল আপনার পক্ষে? সন্দ্বিগ্ন হয়ে উঠল নিলয়। কৃষ্ণপদর খেলাটা সে ধরতে পারছিল না।

—মাপ করবেন। লেখাপড়া না হলে একাজ নেব না। নিলয়ের গলায় শেষ কথা বলার স্বর।

—দেখুন, পনেরো পর্বন্ত উঠতে পারি।

—তাহলেও না।

—এখন তো আপনার কাজকর্ম নেই। কবে যে আবার কাজ পাবেন...

লোকটার নোংরা ব্যবসায়ী বুদ্ধি ঠিকই আছে। খোঁজখবর নিয়েই এসেছে।

উত্তপ্ত হয়ে নিলয় বলল—সেটা আপনার না ভাবলেও চলবে। আমার ফাইনাল কথা আপনাকে বলে দিয়েছি। মানা না-মানা আপনার ইচ্ছে।

—উত্তেজিত হবেন না। এই নিন আমার কার্ড, কৃষ্ণপদ উঠে দাঁড়াল, যদি পরে ভেবে আমার প্রস্তাবটা ভালো মনে হয় টেলিকোন করে জানিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন পনেরো হাজার টাকা বড় কম নয়। অত টাকা ঘরে তুলতে আমাকেও যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। টাকা কি কেউ মশাই অমনি অমনি ছাড়ে? আর, টাকা রোজগার করতে হলে রিস্ক একটু-আধটু নিতেই হয়। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

নিকন্তরে দরজা খুলে দিল নিলয়।

নিনা কান সতর্ক রেখেছিল। কৃষ্ণপদ চলে যেতেই ও এসে বলল—শোন, জগদীশনার মত না নিয়ে এক পা-ও এগোবে না। তোমাকে দেখছি এখন অনেকেই দরকার হচ্ছে। কিন্তু দরকারগুলো আমার তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।...লক্ষ্মীটি, তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। সেই সুযোগে কেউ তোমাকে বিপদে না ফেলে। নিনার গলা নয়ম হয়েছে এল।

—ভয় নেই। আমি এন্টুনি জগদীশনার কাছে যাচ্ছি। দেরি হলে ভেবো না। বাড়িতে গুকে না পেলে খুঁজে বের করতে হবে। কৃষ্ণপদ লোকটা আমাকে ভাবিয়ে ডলেছে।

জগদীশদা বাড়িতেই ছিল।

কৃষ্ণপদ মল্লিকের নাম শুনেই সে লাফিয়ে উঠল।

—হারামজাদা কেষ্টপদ তোর কাছে গিয়েছিল! বাটা পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় কিছু চেনে না। বঁকা রাস্তায় সহজে পয়সা তোলায় ফিকিরে আছে সর্বদা। হাড়-বজ্জাত। কি মতলবে গিয়েছিল তোর কাছে?

আত্মস্তু নিলয় বলল জগদীশদাকে।

জগদীশদাও মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিল।

তারপর বলল—বাটার মতলব জাঁচ করা শক্ত। টাকাপয়সা ওর বিস্তর। কিন্তু বেশির ভাগই দু'নশ্বরী। জানিস তো ফিল্মে দু'নশ্বরী টাকাই বেশি। আট-ন বছর আগে ও একবার ছবি করতে নেমেছিল। বোধ হয় মতলব ছিল কিছু কালো টাকা সাদা করে নেবে। তাতে দোষ দেখছি না, অনেকেই কালো টাকা খাটিয়ে সাদা করবার জায়গা এটা। আমাকে টানবার চেষ্টা করেছিল। আমার লোকটাকে ভালো লাগেনি, আমি রাজী হইনি। তা, কাজ শুরু হল। ছবির নাম দুয়ন্ত যৌবন। ওর একটা বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল—নন্দিনী মতিলাল—এখন মিস্ পম্পা নাম নিয়ে ক্যাবারে নাচে। নন্দিনী হিরোইন। অরুণকুমার হিরো। অরুণকুমারের সঙ্গে তিন লাখ টাকার মৌখিক চুক্তি হয়েছিল, লেখাপড়া হয়েছিল এক লাখের। কেষ্টপদ শুরু থেকেই নানা রকম ফিকির করতে লাগল। পাগল-ছাগল দেখে কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নিল ফিল্মে চান্স দেবে বলে। তাদের ভালো রকমই টুপি পরাল। তারা লাইনের লোক নয়, কিল খেয়ে কিল হজম করতে বাধ্য হল। এতেই শেষ হলে ওকে ঠেক খেতে হত না। কিন্তু সবাইকেই ও বোকা বানাতে লাগল। টাকা আদায় করতে লোকের প্রাণাস্ত। শেষ পর্যন্ত অরুণকুমারের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েই ও মার খেল। লিখিত চুক্তির এক লাখ টাকা অরুণকুমারকে দিয়েছিল। বাকি টাকা নিয়ে আজ-কাল করছিল। অরুণকুমারের কাছে সব খবরই পৌছয়। সে মালাটিকে চিনে নিয়েছে। একদিন সোজা বলে দিল বাকি টাকা তার বাড়িতে পৌছে না দিলে আর ডেট দেবে না। কেষ্টপদের গায়ে কলকাত্তাই জমিদারী রক্ত। তার আঁতে লেগে গেল। সে অরুণকুমারকে কোর্টের ভয় দেখাল। সাপের মাথায় পা। কেষ্টপদের মতো দশটা বড়লোক অরুণকুমারের ট্যাঁকে। তার ওপর জানিল তো ওর মেজাজ। বলে

দিল, বাকি দু'লাখ কেন আরো দশ লাখ দিলেও সে কাজ করবে না। কেষ্টপদ যা পারে করুক। বাস, ছবির দফা গয়া।

—কৃষ্ণপদ কোটে যায়নি? নিলয় জিজ্ঞেস করল।

—ঐ বোকামিটা করেনি। তাতে শুধু টাকার শ্রাদ্ধই হত। অরুণকুমারকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করবার চেষ্টা করেছিল। অরুণকুমার একবার বেঁকে বললে শিবের বাপের অসাধি। কেষ্টপদের কয়েক লাখ টাকা বাস্ফবন্দী হয়ে পড়ে রইল, দুবস্তু ঘোবনের ইতি। কিন্তু প্রব্র হছে ব্যাটা ঐ রদ্দি ছবিটার পেছনে এত রিক্স নিয়ে আবার টাকা খরচ করতে চাইছে কেন। জগদীশদা নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল যেন।

—ধরুন, ও আমাকে অরুণকুমারের জায়গায় নিয়ে ছবি শেষ করল, তাহলেও ছবি বাজারে ছাড়তে পারবে না। অরুণকুমার নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না ছবি বিলিঙ্গ হলে। নিলয় বলল।

—কেষ্টপদের মাথায় কি প্যাচ আছে কে জানে। ও হয়তো ভাবছে অরুণকুমার শিগগির সুস্থ হচ্ছে না। এ সময় অরুণকুমারের নতুন ছবি হিসেবে ছবিটা ভালো বিক্রি পাবে। আর অরুণকুমারও কিছু করতে পারবে না, কারণ লিখিত চুক্তির টাকা তাকে দেয়া আছে। কেষ্টপদ বলবে, অরুণকুমার অক্ষম বলেই বদলি দিয়ে তাকে ছবি শেষ করতে হয়েছে। যা শোনা যাচ্ছে অরুণকুমার বছর খানেকের আগে কাজ করবার মতো সুস্থ হবে না। কেষ্টপদর হালফিল খুঁটির জোর অনেক। বছর দুয়েক হল ও নেতা হয়ে বসেছে। সামনের ইলেকশনে নমিনেশনও পাবে সন্দেহ। আমার মনে হচ্ছে ও পার্টির মাথাদের কাছ থেকে ভরসা পেয়েছে। ঝটপট কাজ শেষ করে ছবিটা বাজারে ছেড়ে দিতে পারলে ঐ মড়া ছবি এখন প্রচুর টাকা দেবে। বিলিঙ্গ পেতে অসুবিধা হবে না। অরুণকুমার হিরো—ছবির বিলিঙ্গ পেতে সাত দিন। বুঝি নিলয়, ব্যাপার এইটেই। কেষ্টপদ এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায়—টাকাকে টাকা, অরুণকুমারের ওপর বদলা নেয়াও হল।

—অরুণকুমার ছাড়বে কেন?

—কি করবে অরুণকুমার? সে সুস্থ থাকলে আপত্তি তুলতে পারত, তার জায়গায় বদলি দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে বলে, এটা বে-আইনী। এখন যা অবস্থা তাতে আইন কেষ্টপদর দিকেই থাকবে। বছরদিন ছবিটা আটকে আছে, প্রযোজকের প্রচুর টাকা ক্ষতি। এ অবস্থায় সে যদি এ পথ নিয়ে থাকে তাতে অস্বস্তি হয়নি। কোর্ট

মনে হয় এ রকমই বলবে। অরুণকুমার কি বলতে পারবে যে দু'লাখ কালো টাকা সে পায়নি বলে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল? তারপরেও আছে, কেউপদ এখন নেতা। ওদের পার্টির চেহারা চমৎকার। ক্যাডার বেশির ভাগ গুণ্ডা, মস্তান, ওয়াগন-ব্রেকার, আর প্রথম সারির নেতারা সব সমাজের শিরোমণি—উকিল, ব্যারিস্টার, শিল্পপতি, মিম-স্টার, কে নয়। কেউপদকে ঠেকায় কে?

—আমি রাজী না হলে আমার ওপর হামলা হবে না তো? নিলয় শঙ্কিত।

—হবে না জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে হলেও সুরক্ষা করতে পারবে না। চাপ দেবার চেষ্টা করছে দেখলেই আমাকে জানাস। কারা এইসব মালকে ঠাণ্ডা করতে পারে আমি জানি। তুই চিন্তা করিস না। ও তো বলে গেছে তুই যদি মত পালটাস তবে ওকে টেলিফোন করে জানাতে। তুই চেপে বসে থাক। এ কাজ নেবার প্রস্তুতি ওঠে না।

—এতদিন কেউ পাত্তা দিল না, অরুণকুমার বিছানা নিতেই দেখছি আমি খুব দামী লোক হয়ে উঠেছি।

—এ দামও কিন্তু তোর নয় রে, অরুণকুমারেরই। জগদীশদা বলল। বলেই কথাটার নিষ্ঠুর সত্যে সে নিজেই লম্বিত হল।

মণিবৌদি চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—কি গো অরুণকুমারের ছবি, দেখা নেই কেন? নিলয়ের হাতে চায়ের পেয়ালার দিয়ে মণিবৌদি বলল।

—ছবি মালা পরে দেয়ালে ঝোলবার চেষ্টা করছে। হেসে উত্তর দিল নিলয়।

—ছি, ছি, কি যে বল! নিনা কেমন আছে? বাচ্চা?

—বাবুসোনা ভালোই আছে, এ ব্যয়েসে সবাই ভালো থাকে। নিনা স্বস্থ আছে, কিন্তু ভালো আছে বলতে পারি না। আমার জন্মেই।

—তুই বড্ড ক্রাসট্রেটেড কথাবার্তা বলছিস নিলয়, জগদীশদা পেয়ালার লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, মণি, নিলয় আজ আমাদের সঙ্গে থাকবে।

—ননা। নিলয় যুঁছ আপত্তি করল।

—কেন, কি রাজকার্য তোর? শোন, আমি আজ বেরুচ্ছি না। তুই তো বাড়িতে বলে এসেছিল যে আমার কাছে আসছিল? জগদীশদা বলল।

—তা বলে এসেছি।

—তবে আর কি। নিনা ভাববে না। আজ কষে গাঁজানো থাক। মণি, ভালো করে দু'একটা আইটেম কর দিকি।

—এই তো, বৌদির ওপর উৎপাত শুরু করলেন।

—জিজ্ঞেস করে দেখ, তোদের বৌদিকে, মণিবৌদির দিকে তাকিয়ে হাসল জগদীশদা, আমি উৎপাত না করলে ওর মন খারাপ হয় কিনা।

ভালো লাগার সঙ্গে লজ্জার মেশামিশি চাপা দিতে কণ্ঠে ঈষৎ কৃত্রিম তীক্ষ্ণতা আনল মণিবৌদি—যত বয়স বাড়ছে মুখও তত আলগা হচ্ছে। যাই ভাই, তোমরা গল্প কর। এই শোন—

জগদীশদাকে ডাকার স্বর শুনেই নিলয় বুঝল।

—না বৌদি, এগারোটোর সময় ঠা ঠা য়োদে দাদাকে আবার বাজারে পাঠানো চলবে না। ঘরে যা আছে তা-ই খাব। লৌকিকতা করলে ভাবব আমি আপনাদের আপন নই।

—তুই খেপেছিল নিলয়, জগদীশদা বলল, ও বললেই আমি বেরুচ্ছি নাকি। তোর সঙ্গে কি আমার ভদ্রতার সম্পর্ক। তাহাড়া পকেটের অবস্থাও সুবিধের নয়।

মণিবৌদি মুখের নিরুপায় ভঙ্গি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিলয়ের মন হঠাৎ শাস্ত নিরুপদ্রব আশ্রয়ের আরাধন বোধ করল। মানুষ কি শুধু টাকায় সম্পদে সচ্ছলতায়ই বাঁচে? কণ্ঠে, ভালোবাসায় প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধেও তো বাঁচে। সে বাঁচায় বাঁচার আনন্দ কি কম? জগদীশদার কাছে এলে তার আন্তরিকতা, জীবনকে বাস্তব অথচ সহজভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি মনের মধ্যে একটা শাস্ত দৃঢ়তা এনে দেয়। মনে হয় মানুষ হারে তখনই যখন সে হার স্বীকার করে নেয়। জগদীশদা জীবনের মালিগা কুশ্রীতা দৈন্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না (নিতাদিনের লোকদের সে অস্বীকার করে কি করে!), কিন্তু পরাজয়কে সে কোনোমতেই স্বীকার করে না। পিছু হটতে হয় অনেক সময়, কিন্তু সেটা তার পরাজয় নয়, রণকৌশল। জগদীশদার নীরব যুদ্ধে রণহংকার নেই, কিন্তু নিরাসক্ত নির্ভীক যোদ্ধার মানসিকতা সে ছড়িয়ে দেয় কাছের মানুষদের মনে।

—কিবে, কি ভাবছিল?

জগদীশদার প্রশ্নে নিলয়ের খেয়াল হল যে অনেকক্ষণ সে নির্বাক হয়ে আছে।

—না, মানে, এমনিই চূপ করে ছিলাম।

—বেশি ভাবিস না! কাজ আর ভাবনাকে যে পর্যন্ত মেলাতে পারবি সে পর্যন্তই

ভাববি, তার বেশি ভাবলে ভাবনা অস্থিৎ দাঁড়াবে।...আচ্ছা, তুই বিতু সান্যালকে চিনিস ?

—না।

—লাকটার অনেক গুণ ছিল। উচুদরের ক্যামেরাম্যান। কিন্তু হেন দোষও নেই যা ওর ছিল না। তাই আউট হয়ে গেল লাইন থেকে। কালে-ভাঙে দেখা হয়। কি করে কেউ জানে না। কিন্তু নেশা-ভাঙ মেয়েমানুষ আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছে। সেদিন দেখা হতে তোর কথা জিজ্ঞেস করল। হঠাৎ তোর সম্পর্কে ওর ইন্টারবেস্ট কেন জিজ্ঞেস করতে পাশ কাটিয়ে গেল। বুঝলাম না কি ব্যাপার। তোর কাছে গেলে একদম পাত্তা দিবি না।

নিলয়ের মনের মধ্যে তুরূপ সেনের ঘটনাটা কাঁটার মতো খচখচ করছিল। কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে বলতে পারল না। অথচ তুরূপের তাকে এক ধরনের ব্রাকমেল করে ইন্টারভিউ আদায় করা এবং তার দু'হাজার টাকা নেয়া দুটো খবরই জগদীশদাকে বলতে পারলে সে শান্তি পেতে পারত। বিনোদন-বার্তার পক্ষ থেকে তার ইন্টারভিউ নেয়াটাই একটা রহস্য। সাদামাটা ঘটনায় কি এমন রহস্যের আকর্ষণ আছে যে তুরূপ সেন অন্যায়সে দু'হাজার টাকা তাকে দিয়ে গেল ? তার মানে এই আপাত-সহজ ব্যাপারটার পেছনে এমন কিছু আছে যা নিলয়ের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। তার ইন্টারভিউটাকে তুরূপ সেন কিভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরে চমক সৃষ্টি করবে তা নিলয়ের বুদ্ধির বাইরে, কিন্তু জগদীশদা হয়তো আন্দাজ করতে পারত। কিন্তু ভয় ও দু'হাজার টাকার প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণের কাহিনী জগদীশদাকে বলতে বাধে। অবশ্য শিগগিরই জগদীশদা জানবে, বিনোদন-বার্তায় রিপোর্ট বেরুলেই। সে পর্বস্ত অপেক্ষা করাই ভালো। দেখা যাক তুরূপ সেন কি করে। বিপদ-আপদ হলে তখন জগদীশদার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে। তাকে নিলয় আগে জানায়নি বলে সে অভিমান নিয়ে বলে থাকবে না। জগদীশদা তেমন মানুষই নয়।

—আচ্ছা জগদীশদা, নিলয় বলল, আমরা এইভাবেই পড়ে পড়ে মার খাব ?

জগদীশদা চারপাশে বিড়ির ধোঁয়ার জাল তৈরি করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আন্তে আন্তে বলতে লাগল—আমার কি মনে হয় জানিস, গোটা দেশটার দিকে তাকালে ? আমরা যেন মৃত বা মৃত্যু কিছুকে আগলে বসে আছি। প্রাণপণে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি এ মৃত বা মৃত্যু নয়, সামান্য অস্থিৎ, সাধারণ চিকিৎসা হলেই স্থিৎ হয়ে উঠবে। অথচ দরকার সংকারের জন্ত তৈরি হওয়া। ঘরের ভেতরে মড়া

নিয়ে বাড়ির বাইরের বাগানে চন্দ্রমল্লিকা ফোটারানোর কথা ভাবা যায় না। অথচ বড় বড় মাথারা তা-ই করছে। আমরা যারা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, সমস্তটা জড়িয়ে ভাবতে শিখিনি বা শেখানো আমাদের হয়নি, তাদের কি করার আছে? নিলয়, তুই একাই শুধু ডামি নোস। এক অর্থে দেশের বেশির ভাগ মানুষই কয়েকটা লোকের ডামি। যখন আমার যুক্তি তর্ক বুদ্ধি সমস্ত হারিয়ে যায়, কয়েকটা মানুষের তৈরি করা হাওয়ার সঙ্গে আমি ভেসে যাই, তখন কি আমি ডামি নই সেই লোকগুলোর?

নিলয় হেসে বলল—এসব তত্ত্ব কি আমার মাথায় ঢুকবে?

—আমার মাথায়ও যে ভালোভাবে ঢোকে তা নয়। মনে হয় এই পর্বস্ত। যেখানে বড় করে ভাবতে পারি না, সেখানে যার যেটুকু সাধ্য সংভাবে বাঁচার আর বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। ঠ্যা, ছোট মাপের যুদ্ধের জগৎ নিজেকে তৈরিও রাখতে হবে। এইভাবে মানুষের মনে সত্যিকারের বড় মাপের যুদ্ধেরও মানসিকতা তৈরি হবে। তখন যদি কিছু হয়। এখন যুদ্ধটা একক, বড় জোর ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে। আনরা তো বড় করে ভাবতেই শিখিনি।

জগদীশদা চুপ করে নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। আর নিলয় ব্যক্তিগত সমস্যা-গুলোর মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতেও এই মুহূর্তে সেগুলো জগদীশদার কাছে মেলে দরতে পারল না নতুন করে।

একসময় জগদীশদা বলল—তোব জগৎ আমি ভাবছি। রাস্তা একটা ভেবে বার করবই। তোব সংসারটাকে তো ভেসে যেতে দেয়া যায় না।

—কই গো, চান করতে যাও। রান্নাঘর থেকে মণিবৌদির তাড়া এল।

খেয়ে-দেয়ে আড্ডা গল্প-গুজবে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলের দিকে হালকা মনে জগদীশদার বাড়ি থেকে বেরল নিলয়।

বিকেলের ফিরতি বাসে বিশেষ ভিড় ছিল না। নিলয় জানলার ধারের সিটে কয়েকটা ঠাণ্ডা মাথায় নানা কথা ভাবছিল। জগদীশদা ষতদিন আছে বৌ-বাচ্চা নিয়ে তাকে অন্তত উপোস করে মরতে হবে না। জগদীশদা তাকে রাজা-উজীর বানিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু খেটে-খেতে-চাওয়া মানুষদের জগৎ হাজারো বুদ্ধি আছে তার মাথায়। শুধু বুদ্ধিতে কাজ হলে অবশ্য সংসারে এত লোকের এত সমস্যা থাকত না। আর যে দু'টি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন তাও মেলে জগদীশদার কাছে। তার

যোগাযোগগুলোকে সে কাজে লাগাতে জানে। কোন্‌ বাস্তৱ কাৰ সাহায্যে কাৰ কোন্‌ সমস্ত্ৰৰ সমাধান সহজে হবে তা সে ভেবেও নিতে পাৰে নিমেষে। আৰ পাৰে বাহুস্বৰ মনে কাজ কৰবাৰ একটা মানসিকতা এনে দিতে।

মোক্ষা কথা, বেঁচে থাকাৰ জন্তু যে কাজ লেইখানে সংস্কাৰমুক্ত হতে পাৰলে জগদীশদা তাকে পথ বাতলে দেবাৰ ক্ষমতা ৰাখে। দিতে আগ্ৰহী। লড়াই কৰে বাঁচা মানে যে যাৰ সীমাৰ মध्ये যতটুকু পাৰা যায় আদায় কৰে নেয়া নয়। জগদীশদা মনে কৰে লড়াই কৰে বাঁচা মানে জীবনটাকে সামগ্ৰিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্ৰ মনে কৰা। লড়াই শব্দটাকে সে ছোট কৰতে ৰাজী নয়। লড়াই মানে শুধু মালিকের কাছ থেকে দাবি আদায়ের স্লোগান নয়। লড়াই তাৰ চেয়ে ডের বড় জিনিস। কিন্তু সেই বড় জায়গায় পৌছতে হলে সবাৰ আগে দৰকাৰ কাজ কৰা, কাজকে সন্মান কৰতে শেখা। কাজকে সন্মান কৰতে না শিখলে কাজের জন্তু দাম আদায়ের লড়াইয়ের ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। জগদীশদা বলে, কাজ কৰে, কষ্ট কৰে বাঁচতে চেষ্টা কৰা প্ৰথম দৰকাৰ। জানি, চেষ্টা কৰলেই বাঁচাৰ মতো কাজের সুযোগ সকলের নেই। কিন্তু চেষ্টা যে কৰে সেই বোঝে কষ্টের দাম, কাজের দাম। এয়াই পাৰে সত্যিকাৰের লড়াই কৰতে। অনেক ঘাম ঝৰিয়ে একজন সৈন্ত তৈরি হয়। আমবা সব তালপাতাৰ সৈন্য। যুদ্ধও হচ্ছে সেই ৰকম। অথচ যুদ্ধের জন্তু তৈরি হওয়া জৰুৰী হয়ে পড়েছে।

সাবা হুপুৰ নিলয়ের পাশে গুয়ে গল্প কৰেছে জগদীশদা। বড় বড় বচন শোনাৰ, আপুৰাকা বলার ভঙ্গি ছিল না। নিতান্ত সাদামাটা ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি নিলয়কে শুনিয়েছে। নিলয়ের মধ্যবিত্ত মনের টানা-পোড়েন তাৰ সব বক্তব্যৰ মৰ্ম ধৰতে পাৰেনি, কিন্তু বিশ্বাস ও সাহসের ভূমি খোঁজাৰ প্ৰয়োজন সে বোধ কৰেছে, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালোভাবে বুঝে নেয়া সম্ভব।

বাগটা হিলটন স্ট্ৰীটের মোড় হয়ে যায়। 'হিলটন স্ট্ৰীট, হিলটন স্ট্ৰীট' কণাকটৰের চিংকাৰে হঠাৎ যেন ছাঁশ কিৰে এল নিলয়ের। মনে পড়ে গেল তুৰুপ সেনকে। সে নিলয়কে বলেছিল একবাৰ স্মলক্ষণাৰ সন্ধে দেখা কৰতে। . তড়িঘড়ি বাস থেকে নেমে পড়ল নিলয়।

তুৰুপ অবশু তাকে পৰিষ্কাৰ কৰে বলেনি স্মলক্ষণাৰ সন্ধে দেখা কৰে তাৰ কি সুবিধা হবে। বলেছে, মহিলাকে একটু তোষামোদ কৰে এলে নিলয়ের তাতে ভালো হবে।

হতে পাৰে, নিলয় ভাল, মহিলাটি ছুঁদে, অক্ষয়কুমাৰের মতো ব্যক্তিকেও সে

ভালো করেই বেঁধেছে। বড়লোকের মর্জির হৃদিশ মেলা ভার। অ্যান্ড্রিডেন্টের বাপারটাকে অরুণকুমার কিভাবে নিয়েছে নিলয় তা জানে না। সাধারণত ছর্বলকে মেবে সবলেব বড় আনন্দ। সবলে সবলে লড়াই সাজানো কুস্তির আসর, নেপথ্যে আপস-লাভের বাটোয়ারা। অরুণকুমার যদি মনে করে থাকে সেদিনের অ্যান্ড্রিডেন্টের জন্ত নিলয় দায়ী তবে আর দেরি না করে অগ্রত্ৰ অন্নজলের সন্ধানে যাওয়াই তার উচিত। স্থলক্ষণার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলে অরুণকুমারের মনোভাব বোঝা যেতে পারে। আর স্থলক্ষণা যদি সদয় হয় অরুণকুমারও নির্দয় হবে না আশা করা যায়। কিন্তু স্থলক্ষণা কি রাজী হবে তার সঙ্গে দেখা করতে ?

খানদানী পাড়া হিল্টন স্ট্রীটের বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস স্নো-হ্যাভেনের বিপুল দুগ্ধশুভ্রতার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল নিলয়। সে কি যেচে অপমানিত হতে যাচ্ছে ? স্থলক্ষণা বড় বেশি স্ট্যাটাস-সচেতন, আর নিচের স্ট্যাটাসের মানুষদের সঙ্গে দুর্বাবহার না করলে স্ট্যাটাস বজায় থাকে না বলেই বোধ হয় তার বিশ্বাস। স্থলক্ষণার দুর্বাবহারের শিকারদের এ রকমই ধারণা। তুরূপ সেন তাকে এ কি ফাঁপরে ফেলল ?—নিলয় ভাবল। নাকি অগ্র কোনো মতলব আছে তুরূপ সেনের ? সেটার আন্দাজ পেতে হলেও তো স্থলক্ষণার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

যা থাকে কপালে—বুক ঠুকে এগিয়ে গেল নিলয়।

গেটের দারোয়ানের চোখে বিশ্বয়। সে কোনো প্রশ্ন করল না। অরুণকুমারের সম্ভ্রান্ত সুন্দর সাদৃশ্যের ছাড়পত্র !

চত্বরে টেবের ময়ত্র বাগানে উচ্চকোট মহিলাদের পদচারণা, বেঞ্চে বেঞ্চে ইংলিশ-মিডিয়মে পালিশ করা ইংরেজী, বয়কাট্-ববছাঁটের বাংলা, আঁকাড়া রাজস্থানী-গুজরাতি। পরিচারিকাদের তস্বাবধানে মাল্টি-শাশানালের শিশু-খাণ্ডের বিজ্ঞাপনের শিশুরা।

নিলয়ের ষষ্ঠ ইন্ড্রিয় চোখে চোখে অজস্র কানাকানির অম্ভভূতি দিচ্ছিল তাকে।

সে পা চালিয়ে লিফ্‌টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

লিফ্‌ট-মান তাকে সেলাম জানাল। হতে পারে এটা তার চাকরির প্রয়োজনে অর্জিত অভ্যাস ; কিন্তু নিলয়ের মনে হল সে অরুণকুমারের প্রাপ্য সেলাম থেকেই খানিকটা চুরি করে নিয়েছে।

লিফ্‌ট-নিলয়কে পৌছে দিল পরিবেশদূষণ-মুক্ত এগারো তলার নির্মল বাতাসে, যেখান থেকে নিচে তাকালে গ্রহত ক্লাস্ত নগরীকে আশ্চর্য জীবন্ত ও সুন্দর মনে হয়।

অরুণকুমারের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল টিপল নিলয়। ভেতরে একটি পাখি মিষ্টি ডেকে উঠল ছ'বার।

দরজার ছ'ইঞ্চি ফাঁকে একটা সতর্ক মুখ উঁকি দিল।

—কাকে চাই ?

—স্বলক্ষণা দেবী আছেন ?

—আছেন। আপনি ভেতরে আসুন।

অত্যন্ত সহজে দরজা খুলে গেল। অবিশ্বাস্য সহজে। সেই সাক্ষাতি-পরা সন্ত্রাস্ত চাকরটিকে চিনতে পারল নিলয়, যে একবার তাকে অরুণকুমারের শরীরচর্চার ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেও নিশ্চয়ই চিনেছে নিলয়কে, নিলয়কে না হোক অন্তত অরুণকুমারের সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্যকে, নইলে এত সহজে প্রবেশাধিকার মেলা অযৌক্তিক।

—বলুন।

ডুইংকমের লোকায় নিলয়কে বলিয়ে চাকর বলল—কি বলব মেমসাহেবকে ?

—আমি গুঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। বলুন, নিলয় মজুমদার...নাম বললে উনি কি চিনবেন...আপনি বরং বলুন...

ভরসা দিল চাকর—আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না স্যার। মেমসাহেবকে আমি যা বলবার বলছি। আমার নাম স্যার, ভিকি। বাপের দেয়া নাম ছিল ভক্তকৃষ্ণ। সাহেব পালটে ভিকি করেছেন। নামটা খুব ইস্‌মাট, না স্যার ?

—হ্যাঁ, চমৎকার নাম। তা, তোমাদের কুকুর-টুকুর নেই তো ভিকি ? কুকুরকে আমার ভীষণ ভয়। তুমি মেমসাহেবকে খবর দিতে গেলে আর কুকুর আমাকে তেড়ে এল...

—না স্যার, কুকুর আমাদের নেই। মাঝখানে ছিল একটা, মেমসাহেব আমার সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন ভিকি। তা, সে বাটা স্যার, শুধু কার্পেটে মৃতবে। কিছুতেই বাথরুমে যাবে না। মেমসাহেব স্যার ওকে ভীষণ ভালোবাসতেন, কিন্তু ভালো ভালো কার্পেটগুলো নষ্ট করা কাঁহাতক সহ হয় বলুন, শেষ পর্যন্ত মেমসাহেব এক বন্ধুকে দিয়েই দিলেন কুকুরটা। তিন দিন ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল মেমসাহেবের। আমার কিন্তু স্যার একটুও দুঃখ হয়নি, গলা নামাল ভিকি, বলুন স্যার, ভিকির সঙ্গে মিলিয়ে কুকুরের ডিকি নাম রাখা...আপনি কিন্তু স্যার মেমসাহেবকে বলে দেবেন না যেন...

—আরে না না...

—আপনাকে স্মার ডিকি দেখলেও কামড়াতে আসত না, ব্যাটার কিন্তু স্মার কামড়ানোর অভ্যাস ছিল খুব।

—কেন, আমাকে ছাড় কেন? আমি কে এমন মহাপুরুষ?

—আপনার সঙ্গে স্মার, সাহেবের এমন মিল না, ডিকি আপনাকে সাহেব বলেই মনে করত।

—না ভিকি, কুকুর তুল করে না। ওদের মাহুয় চেনার ব্যাপারটা অশ্রবকম! কিন্তু তুমি যে আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছ, মেমসাহেব তোমাকে বকবেন না?

—না স্মার, এখন বকবেন না। এখন শব্দটায় বিশেষ মোচড় দিল ভিকি।

—ভিকি, ভিকি। পাশের ঘর থেকে স্থলক্ষণার ডাক।

গলাটা চেনা নিলয়ের, এবং মনে হল যেন একটু জড়ানো। শ্রদ্ধা ও বিনয়ের ভঙ্গিতে নিজেকে আড়ষ্ট করে রাখল নিলয়।

—এই রে, চলে এসেছে। ফিসফিস করে বলে ভিকি ছুটল।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ভিকি? স্থলক্ষণার প্রশ্ন।

নিলয় উৎকর্ষ।

—এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—ইডিয়ট, ঢুকতে দিলে কেন আমাকে জিজ্ঞেস না করে? যে-সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই তুমি দরজা খুলে দেবে? তুমি জান আমি কে? জান?

—জানি মেমসাহেব, আপনি সবার বড় আর্টিস। আপনার সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। জজগুলো গাধার বাচ্চা বলে আপনাকে গ্রাশানাল আণ্ডয়ার্ড দেয়নি। গড়গড় করে মুখস্থের মতো বলে গেল ভিকি।

—গুড, ভেরি গুড।

রীতিমতো মত্ত স্থলক্ষণা। ঘামতে ঘামতে ভাবল নিলয়। মাতাল স্থলক্ষণার মূর্তি তার জানা নেই। মানে মানে সরে পড়বে নাকি? নাঃ, দেখাই যাক, হয়তো মাতাল স্থলক্ষণা স্বাভাবিক স্থলক্ষণার মতো অতটা বিপজ্জনক নয়।

—এই, এই ইডিয়ট ভিকি, আমার প্রশ্নের উত্তর কোথায়? লোকটা উইদাউট মাই পারমিশন ক্ল্যাটে ঢুকতে পেল কি করে?

—ভদ্রলোককে একেবারে আমাদের সাহেবের মতো দেখতে। আগেও এসেছেন। তাই...

—ও, তাহলে ছাট ডামি বয়, নিলয় না কি যেন...বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে
স্বলক্ষণা ডুইংকমে এসে দাঁড়াল।

কাঠের পুতুল নিলয় অনেকটা ঝুঁকে নমস্কারের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। এক নজরে
যেটুকু দেখল স্বলক্ষণাকে তাতেই দ্বিগুণ ঘামতে লাগল সে। ফিনফিনে স্বচ্ছ ড্রেসিং
গাউনের পেছনে সমস্ত অবয়বের রেখাগুলো স্পষ্ট। কটকটে লাল রঙের অতি সংক্ষিপ্ত
ব্রা-প্যান্টি। ঠোঁটের কালচে লাল লিপস্টিকের আশ্রয় আর মুখের গোলাপী পেণ্ট
ধেবড়ে গেছে এখানে-সেখানে। টেনে টেনে চোখের পাতা মেলে রাখছে স্বলক্ষণা।
টলমল পায়ের ওপর শরীরটা ছলছে অল্প অল্প।

কোনোমতে এসে সোফায় গা ছেড়ে দিল স্বলক্ষণা। বসবার আদেশের অপেক্ষায়
নিলয় দাঁড়িয়ে। ভিকি দরজার কাছে।

—সিট ডাউন, সিট ডাউন। নাচের ভঙ্গিতে আন্দোলিত হল স্বলক্ষণার হাত।

নিলয় বসল জড়সড় হয়ে।

—বলুন ইয়ং হ্যানসাম, কি করতে পারি আপনার জন্য।

নিলয় হঠাৎ আবিষ্কার করল তার বলবার কিছু নেই।

—মানে...ভাবলাম...এই...। শব্দগুলোকে হাতড়াতে লাগল নিলয়।

—বলুন, বলুন...। বুকের ওপর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল স্বলক্ষণার।

—যদি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি...মানে স্ত্রীর দয়ালুই আমার
সব...। নিরর্থক কয়েকটা শব্দ আউড়ে গেল নিলয়।

স্বলক্ষণার ওপর তার কথার কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে না নিলয় লক্ষ্য করল।
কোনো ভদ্রমহিলাকে এভাবে মাতাল হতে নিলয় কখনো দেখেনি। মনের ভেতরে
ভয় আর শঙ্কার আড়ষ্টতা সরিয়ে বিস্ত্রী বিরক্তি।

সে চুপচাপ বসে রইল। সামনে স্বলক্ষণার নির্লজ্জ উপস্থিতি। ওকে এখন আর
নিলয়ের বিন্দুমাত্র ভয় করছে না। কুশলী গবেষকের মতো নিলয় স্বলক্ষণাকে
দেখতে লাগল।

—ওক্, ইট্, স্ টু হট্, টু হট্। ঝাঁফুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্বলক্ষণা।

এখানেই সাক্ষাৎকারের ইতি ভেবে নিলয়ও দাঁড়াল।

হঠাৎ নিলয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ওকে আবিষ্কার করল স্বলক্ষণা। নিলয়ের
মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রাখবার চেষ্টা করতে করতে অদ্ভুত হাসির সঙ্গে বলল—বড়
গরম, না ?

—ই্যা।

—কাম অনু। ঠাণ্ডায় বসে গল্প করি। মুহূর্তে নিলয়ের একখানা হাত স্থলক্ষণার দখলে।

পরিস্থিতিটা ভালো করে বুঝে ওঠবার আগেই নিলয় দেখল স্থলক্ষণা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। নিলয় বাধা দিতে পারছে না বা কি তার করণীয় ভেবে পাচ্ছে না। ভিকির দিকে তাকাতে সে তার অবস্থানের সঙ্গে অত্যন্ত বেমানানভাবে নিলয়কে চোখ মারল।

অবিশ্বাস্য বেড-রুমের ঠাণ্ডা আরামে নিলয়কে নিয়ে গিয়ে তার হাত ছেড়ে দিল স্থলক্ষণা। পেছনে ধীর সৌজন্তে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। স্থলক্ষণা গড়িয়ে পড়ল বিছানায়—আঃ...

বিরাট ঘরটার আশ্চর্য সজ্জা অলঙ্করণ আর হিমশীতলতার মধ্যে হতভয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে নিলয়।

—কাম অনু। স্থলক্ষণার বিলোল আহ্বান।

পাথরের থামের মতো দুটো পা নিলয়কে মেঝের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে।

বিছানায় কয়েকটা গড়াগড়ি দিয়ে উঠে এল স্থলক্ষণা। নিলয়ের পাশ দিয়ে ষাবার সময় আলতো করে ওর গালে টোকা দিয়ে হাসল। দেয়ালের কাছে গেল স্থলক্ষণা, কি যেন করল, অলৌকিক দেয়াল থেকে রিমঝিম বাজনা ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। নকশা-কাটা কাচের কারুকার্যের আড়াল সরে গেল আঙুলের ছোঁয়ায়, রঙিন বোতলের সম্ভার থেকে একটা তুলে নিয়ে বিছানার পাশে নিচু গোল টেবিলে রাখল স্থলক্ষণা। কাট-গ্লাসের দুটি পাত্রে ঢালল সেবা ছইন্সি।

—এসো। লেট্‌স্‌ হাব এ নাইস টাইম। স্থলক্ষণা বসল বিছানার কিনারে।

—মাপ করবেন, আমি ড্রিক করি না। ঘরঘরে আওয়াজ বেরুল নিলয়ের গলা থেকে।

—আই সী।

একে একে ছুটি গ্লাসের মদ গলায় ঢেলে দিল স্থলক্ষণা। চোখ বুজে কপাল কুঁচকে বসে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর উঠে দাঁড়াল। গালের মাংস স্নায়বিক আক্রমণ খিরখির করে কাঁপছে। চোখের হাসিতে কামনা-ক্রুরতা।

—তুমি জান না ইয়ং হ্যানসাম, আমি কি ভীষণ আনহাপি। আমি সব ছেড়েছি অরণের জন্তু...বার্ট হি...ওর অ্যাফেয়ার্সের শেষ নেই...কিন্তু আমি স্থলক্ষণা...আই

ডোনট্ কেয়ার, কাম অন্, লেট্‌স্ এনজয়...

হাতের এক টানে ড্রেসিং গাউনটা স্থলক্ষণার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। নিপুণ আঙুলে ব্রা-পাণ্ডি খুলে গেল। নিলয়ের সামনে স্থলক্ষণার উলঙ্গ অঙ্গীল অস্তা-যৌবন।

দৃষ্টিহীন পাথুরে চোখে তাকিয়ে আছে নিলয়। অরুণকুমার-স্থলক্ষণা—প্রম-পূর্ণতা-বৈভব! মুখোশের অন্তরালে হা হা করছে শূন্যতা। এরই নাম সুখ? এরই নাম সম্পদ? ঘুণায় কঁকড়ে যাচ্ছে নিলয়। এদেরই কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছে সে?

নিলয়ের শুষ্ক মৃত গাছের মতো কঠিন শরীরের ওপর এসে আছড়ে পড়ল স্থলক্ষণা। বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলতে থাকল বারবার—প্রিজ...প্রিজ...ইউ আর সো মাচ লাইক অরুণকুমার অব ফিকটিন ইয়ারস ব্যাক...

প্রসাধন আলকহল আর অন্নাত শরীরের কটু গন্ধে নিলয়ের মনে হল সে একুনি তার বুকের ওপর রাখা স্থলক্ষণার মাথায় বমি করে ফেলবে।

—ভূঃখিত, আমি ইমপোটেন্ট।

এক ঝটকায় স্থলক্ষণাকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে কোনো দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে এগোল নিলয়।

পেছন থেকে সাপের মতো হিমহিস করে উঠল স্থলক্ষণার গলা—ইউ বাস্টার্ড!

১২

দু'দিন ধরে নেহাত দরকার না পড়লে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না নিলয়। বেরুতে ইচ্ছেও করে না। আবার কখন কি উৎপাত দেখা দেয় কে জানে। তার চেয়ে চার দেয়ালের মধ্যে মা-নিনা-বাবুসোনার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে। যদিও নিলয় ভালোই জানে চার দেয়ালের নিরাপত্তার জ্ঞাণ্ড প্রয়োজন টাকার। টাকা ঘরে বসে পাওয়া যাবে না। আপাতত তুরূপ সেনের দেয়া দু'হাজার টাকা নিরাপত্তার যোগান দেবে। কিন্তু তারপর? মা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে, অর্থাৎ নিয়মিত সংসার-খরচের ওপরেও টাকার দরকার। আসবে কোথা থেকে? নিলয় চিন্তা না করবার চেষ্টা করে। অবশ্য বুখা চেষ্টা।

নিলয়ের মনের মধ্যে আরো একটা কাঁটা বিঁধে আছে। স্থলক্ষণার সঙ্গে দেখা করার ঘটনা নিনাকে বলার জ্ঞাণ্ড বারবার মনের ভেতর থেকে তাগিদ এসেছে। নিনার

কাছে কোনোদিন কোনো কিছুই সে গোপন করেনি। কিন্তু বলতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছে। নিনা ওকে অবিশ্বাস করবে না, এ বিশ্বাস নিলয়ের আছে। বড় জোর ওর বোকামিকে একটু খোঁটা দেবে। তবু নিলয় বলতে পারেনি। দৃশ্টার বীভৎসতাই ওকে নীরব করে রেখেছে।

মাহুষের পদস্থলন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা যে এত কদর্য নির্লজ্জ একটা অভ্যাস হতে পারে তা নিলয়ের ধারণার মধ্যে ছিল না। ইঁা, স্থলক্ষণার ক্ষেত্রে এটা যে অভ্যাস তাতে নিলয়ের সন্দেহ নেই। অধঃপতনকে কতপানি স্বাভাবিক করে নিতে পারলে মাহুষ তার পরিবেশ আশপাশের মাহুষকে পর্যন্ত ভুলে যেতে পারে!

এই কুৎসিত অভিজ্ঞতার ভাগ নিনাকে দিতে মন থেকে সায় মেলেনি নিলয়ের। কিন্তু গোপনতার অস্ত্রদাহ বড় কম নয়। কারণ ওদের দু'জনের মধ্যে কোনো আড়াল নেই, কোনোদিন আড়াল সৃষ্টির চেষ্টাও ওরা করেনি। সত্যিকারের ভালোবাসা-বন্ধুত্ব আড়াল রাখতে দেয় না। যত গোপনেই পর্দা টানা হোক একজনের মনের কোণায়, অগ্ৰজন তার উপস্থিতি টের পাবেই, হয়তো জানবে না পর্দাটার রঙ-নকশা।

নিনা কয়েকবারই ওকে বলেছে এই ক'দিনে 'তুমি বোধ হয় কিছু লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে।' নিলয়ের উত্তর প্রশ্নটার বারবার ঘুরে আসা ঠেকাতে পারেনি। আশ্চর্য মাহুষের মন, আশ্চর্য মাহুষের সম্পর্ক। সামান্য গোপনতা নিলয়কে দিচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা, আর নিলয়ের মনের সেই গোপন যন্ত্রণা নিনার মনেও টেটে তুলছে। অথচ স্থলক্ষণা নির্বিকার বাড়িচারে অভ্যস্ত, অরুণকুমারও নিশ্চয় তা-ই। ওদের মনে কি পরস্পরের কোনো আড়ালই আবেগ উৎকর্ষা প্রশ্ন সৃষ্টি করে না? অথচ সম্পর্কটা নাকি হৃক্ষেত্রই এক—ভালোবাসার, বন্ধুত্বের এবং স্বামী-স্ত্রীর। নিলয়ের বারবার অস্তুত সব প্রশ্ন জাগে। কোন প্রয়োজনে অরুণকুমার-স্থলক্ষণা একসঙ্গে থাকছে? দেহ? টাকার বাদেব ইয়ত্তা নেই এ প্রয়োজন তারা যত্নতত্র মেটাতে পারে। সঙ্গ, সান্নিধ্য? অবিশ্বাস্য ঘৃণা আর বঞ্চার ওপর দাঁড়িয়ে সঙ্গ-সান্নিধ্য? তাহলে কি বিপুল সম্পদ আর অবিশ্রান্ত ভোগের নেশায় বৃন্দ হয়ে থাকতে থাকতে মনের জানলা দিয়ে বাইরের নীল অকাশে তাকাতেও ভুলে যায় মাহুষ? ভূস্থিহীন অবিরাম ভোগ থেকে হৃদয়হীনতা—স্থূথের অস্থূথ। বিস্ত ভোগ আর হৃদয়হীনতার পাপবৃত্ত। অলস সময় বারবার নিলয়কে এইসব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।

এ সময় হঠাৎ নাটুর আবির্ভাব।

চার বছরে বোনের বাড়িতে এই তার দ্বিতীয় আগমন। প্রথমবার এসেছিল বছর

তিনেক আগে। শ'চারেক টাকা ধারের আবেদন নিয়ে। টাকার ষে-প্রয়োজন নাটু জানিয়েছিল তাতে বা ফেরত পাবার সম্ভাবনায় নিনার বিদ্‌মাত্র আস্থা ছিল না। লজ্জায় মুখ বুজ থাকবার মতো মেয়েও ও নয়। তাই নিলয়ের উপস্থিতিতেই প্রচণ্ড জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল নাটুকে। নিলয়ের ভূমিকা ছিল নির্বাক দর্শকের। নতুন আঙ্গীয়েব সঙ্গে তার সামনেই নিনার এই ব্যবহারে নিলয় লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু নাটুর কীর্তিকলাপের ষেটুকু তার জানা ছিল তাতে নিনাকে বাধা দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বোন-ভগ্নীপোতের এই ষড়যন্ত্রে (!) নাটুর আঙ্গসঙ্গানে (!) ভীষণ ষা লেগেছিল। বেরিয়ে ষাবার সময় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল এ বাড়িতে ষদি আর কখনো পদার্পণ করে তাহলে সে মল্লধা-সন্তান নয়।

তারপর থেকে সত্যিই সে আর আসেনি। নিলয় মাঝে মাঝে নিনাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—‘তোমার বড়দা প্রতিজ্ঞা রেখেছে। একদিনও এল না তারপর। মিটিয়ে নাও না, হাজার হোক তাই।’ নিনার স্পষ্ট জবাব—‘তুমি হয়তো মনে করছ অপমান করেছি বলে ও আসে না। আসলে তা নয়। আমার দাদাদের তুমি জান না। ধান্দার স্ত্রিবিধা থাকলে লাখি খেলেও হাজার বার আসত।’ নিলয় তর্ক বাড়াইনি। ভাইদের সম্পর্কে বোনের এ তিক্ততা অকারণে নয়।

—আসুন বড়দা, আসুন, নিলয় অভ্যর্থনা জানাল, আপনি তো এমুখো হওয়া ভুলেই গেছেন।

নিনার বড়দা, সম্পর্কের মর্ষাদা দেখাতেই হয় নিলয়কে।

—আরে নিলয়বাবু, সময় কোথায় আমার। পার্টির প্রোগ্রাম লেগেই আছে। আজ থানা ষেরাও, কাল রেশন অফিসে আফিসারকে কড়কানো, পরশু কোর্ট, বুঝলে, এক মুহূর্ত সময় নেই। এলাকার পুরো চার্জে আমি। কবরু কবে বলে গেল নাটু।

—আপনি পার্টি করেন? জানতাম না।

—কেন, স্ত্রী বলেনি তোমাকে?

—না।

—বুঝেছি। সেদিন বাড়িতে সামান্য একটা ব্যাপার হয়েছিল। মানে সামান্য বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম আর কি। তা, বাপবে বাপ, সে কি রাগ, ভাত না খেয়ে চলে এল। তাই ভাবলাম, ষাই দেখি রাগ পড়েছে কিনা। তা ষা বলছিলাম নিলয়বাবু, ভেবে দেখলাম এ শালা দেশের ভালো করতে হলে পার্টি করতেই হবে। ষাহা ভাবা তাহা কাজ। পার্টি আমাকে আগেই টোপ দিয়ে রেখেছিল। আমার

হাতে ভালো ভালো ছেলেপুলে আছে তো...হাঃ হাঃ...তাই আমি ই্যা বলতেই পাটি আমাকে লুফে নিল। আরে, আমাকে তো কেউ দামই দিল না। কিন্তু পাটি আমার কদর বুঝেছে। আজ ও সন্নাটে আমাদের পাটি মানেই যুবনেতা নাটু রায়। অল্প পাটি করা শুচিয়ে দেব শালাদের এবার। প্যাঁদানো সব শুক করেছি...হাঃ হাঃ। অনাবিল হাসি ছড়িয়ে দিল নাটু।

—এই, ও ঘরে বসে বসে তোর বক্তিতে শুনছিলাম, ঘরে ঢুকেই দাঁত খিঁচিয়ে শুরু করল নিনা, তোকে আমার বাড়িতে কে আসতে বলেছে।

—দেখেছ নিলয়বাবু, নিনার কথা গায়েই মাখল না নাটু, বড় ভাইকে কি রকম ডাঁটাচ্ছে। দোষ অবশ্য আমাদেরই। বাবা-মা'র একটাই মেয়ে, আমাদের হুঁভাইয়ের একটা মাত্র বোন। আদর পেয়ে পেয়ে বাদর হয়েছে একটা। হাঃ হাঃ।

—ই্যা, খুব আদর পেয়েছি, হাড়ে হাড়ে আদর পেয়েছি, নিনা বাঁজিয়ে উঠল, এখন কি তালে এসেছিল তাই বল।

—এই নিনা, কি হচ্ছে! নিলয় অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

—আরে নিলয়বাবু, তুমি মিথো লজ্জা পাচ্ছ, নাটু বলল, আমাদের ভাই-বোনে এ রকম খুনসুটি লেগেই আছে।

—খাক, প্রচুর ঝাকামো হয়েছে। এবার কি বলবি বল। নিনা বলল।

—বলব আবার কি। তোরা কেমন আছিস দেখতে এলাম। তা, শুধু কি ঝগড়াই করবি, চা-টা খাওয়াবি না?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নিলয় বাস্তব হয়ে উঠল। নিনার ব্যবহারে সে লজ্জা পাচ্ছিল।

—এসেছিল যখন, চা এক কাপ পাবি, নিনা বলল, ছোড়দাকে ছেড়েছে?

—ছাড়বে না মানে। যুবনেতা নাটু রায় অমনি অমনি কাটায় না। যে কথা সেই কাজ।

—কোর্ট খালাস করে দিয়েছে না জামিনে আছে?

—জামিনেই আছে। তবে ও আমি ঠিক খালাস করিয়ে নেব, দেখিস।

—বুঝেছি। বাড়ি বিক্রির মতলব ছেড়েছিস?

—কোথায় যে কি শুনিস...

—ঠিকই শুনেছি।

—আমি কি পাগল নাকি। আরে, ঐ জমিতে আমি পাকা বাড়ি তুলব। এ আর

সেই ফেকলু মহম্মদ নাটু রায় নয়, যুবনেতা নাটু রায়, মনে রাখিস। খবর নিস কলোনিতে, দেখবি আমার কি সম্মান।

নিনা ঠোট উলটে বলল—সম্মান না কচু। তোকে লোকে ভয় করে।

—কি যে বলিস তুই স্বরো, আমি কি বাঘ-ভাল্লুক যে লোকে আমাকে ভয় করবে। বাদ দে বাজে তর্ক। বাবুসোনা কোথায় ?

—ও ঘরে, মা'র কাছে আছে।

—মা ?

—হ্যাঁ, আমার মা। নিলয় বলল।

—তোমার মা কি এখন এখানে আছেন ?

—হ্যাঁ।

—গুড, ভেরি গুড। নাটুর ভক্তি বিজ্ঞানোচিত।

—বাস্, আমি চা করে আনছি।

নিনা ভেতরে চলে গেল। নাটু পকেট থেকে কিং-সাইজ দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। সম্পর্কের বড়ত্ব বজায় রাখতেই সম্ভবত নিলয়কে নিতে বলল না। মোক্‌ম টানে একবুক ধোঁয়া গিলে আশ্বে আশ্বে নাক-মুখ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলল—তারপর ?

—এই, চলে যাচ্ছে আর কি।

—নতুন করে ভাব, বুঝলে, নতুন করে ভাব। তোমরা ইয়ংমান, তোমরা দেশের জন্তু না ভাবলে, না করলে, কে ভাববে, কে করবে।

নাটুর বলার স্বর শুনে নিলয়ের মনে হল সে তার কোনো নেতার অমুকরণ করার চেষ্টা করছে। নেতা হবার শিক্ষানবিশী চলছে বোধ হয় ওর। হালফিল কোনো কোনো ডাকসাইটে নেতার ষা ব্যাক-গ্রাউণ্ড দেখা যাচ্ছে তাতে অবশ্য নাটুর যোগ্যতা প্রমাণীত।

হাসি চেপে নিলয় বলল—যাকে তাকে দিয়ে কি দেশের কাজ হয়। কত সাক্ষিকাইস দরকার।

—ঠিকই বলেছ। এই যে স্কটুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, ওয়্যাগন ভাঙা আর পুলিশের ওপর বোমা মারার চার্জ এনে মামলায় ঝুলিয়ে দিল, এই যে কলঙ্কের কালি ওর মুখে লেপে দিল, এসবই যে স্কটু হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে, সে তো শুধু দেশকে ভালোবাসে বলেই ..

নাট্যের বক্তৃতায় বাধা দেবার ইচ্ছা নিলয়ের ছিল না, কিন্তু মুখ দিয়ে বিশ্বয় ও প্রশ্নের যুগ্ম ধ্বনিটা স্বতঃই বেরিয়ে এল—ঊা! !?

—হ্যাঁ, আমাদের পলিটিক্যাল অপোজিটরা চাইছে আমাদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লোকের চোখে আমাদের হেয় করতে, কিন্তু দেখে নিও ওরা পারবে না, নাট্যের গলায় আবার বক্তৃতার স্বর, আমরা জানি স্মট্যের মতো দেশপ্রেম সবার থাকে না, দেশের জন্ত এত বড় তাগ স্বীকারও সবাই করতে পারে না, কিন্তু সবাই যদি দেশের কথা ভেবে ঠিকভাবে যার যার নিজের কাজ করে যায়, তাহলেই চড়চড় করে দেশ এগিয়ে যাবে। শিল্পপতি, ব্যবসাদার, শ্রমিক-কর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, চোর-ডাকাত, আলুওলা, পটলওলা...

—চোর-ডাকাত ?

—ওটা ফোলোর মুখে বেরিয়ে গেছে, নাট্য হাসল, ভেবে দেখলে আমি কিন্তু ভুল বলিনি। চোর-ডাকাত যতই চুরি ডাকাতি করুক পুলিশ ঠিকভাবে কাজ করলেই তারা ধরা পড়বে। তা তো করবে না, ধরবে স্মট্যের মতো পেট্রিয়টদের।

—না বড়দা, চুরি ডাকাতি কালোবাজারি যাতে না হয় সেভাবে দেশটাকে তৈরি করতে পারলে তবেই অল্পস্বল্প অপরাধ হলেও তা দমন করা সম্ভব।

—দূর দূর, ও বইতে লেখা থাকে। কাজে হয় না।

—পৃথিবীতে এমন বহু দেশ আছে যেখানে অপরাধ জনসংখ্যার তুলনায় হিসেবের মধ্যেই আসে না। তারা রোগের আসল জায়গাটা ধরেছে।

—এই যে নিলয়বাবু, বিশ্বয়ে নাট্যের চোখ গোল হয়ে উঠল, ভূমি কম্যানিস্টদের মতো বলছ! সব প্রচার, মিথ্যা প্রচার! আমেরিকার কথা তুলছিই না, গুরুদেব দেশ মাইরি, কি নেই! আমাদের দেশেও যা ফুঁড়ি-কার্তার ব্যবস্থা আছে কম্যানিস্টদের দেশে তাও নেই। তবে ?

নাট্যের মোক্ষম যুক্তির সামনে নিলয় থ বনে গেল। এরপর আর কোন বিষয়ে নাট্যের সঙ্গে আলোচনা করা যায় ভাবতে ভাবতেই নিনা চা আর নারকেল চিনি দিয়ে মাখা চিঁড়েভাজা নিয়ে ঘরে এল। যাক, শুধু এক পেয়লা চা ঠেকানোর মতো কাণ্ড যে নিনা করেনি তাতে নিলয় খুশি হল।

নাট্য গদগদ হয়ে বলল—দেখলে নিলয়বাবু, যত গালাগালি করুক; দাদাকে ভালোবাসে।

—খেয়ে বিদেয় হ; মুখ বামটা দিল নিনা।

এক গাল চিঁড়ে মুখে দিয়ে আরাম করে চিবোতে চিবোতে চিবোনের ফাঁকে ফাঁকে নাষ্টু বলল—আরে নিলয়বাবু, তুমি ফিলিমে কি কাজ কর জানতাম না। স্বরো কখনো বলেনি। কাগজে নাকি বেরিয়েছে তুমি অরুণকুমারের ডামির কাজ কর। তোমাকে নিয়ে নাকি কি সব গোলমাল লেগেছে ! অরুণকুমার জখম হওয়ার সময় তুমি ছিলে বলছে।

নিলয় বুঝতে পারল বিনোদন-বার্তায় তার ইন্টারভিউটা বেরিয়েছে, এবং ভুরূপ সেন সস্তবত উলটোপালটা লিখে গেছে।

চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল নিলয়—কি লিখেছে জানেন ?

—নাঃ। ফালতু কাগজ পড়ার সময় আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তুমি আর কাল পেলে না ? ডামিগিরি আবার একটা কাজ !

নিলয় মদন মনে বলল, হ্যাঁ আমি ডামি। তুমি কি শালা ? তুমি ডামি নও ? মুখ বলল—কি করা যাবে বলুন, এটাও একটা প্রফেশন।

নাষ্টু কি ষেন বলতে থাকছিল, তাকে বাধা দিয়ে নিনা বলে উঠল—তোর মতো মস্তানি করে খায় না।

—বলি না, বলি না, নিনার কথা গায়েই মাখল না নাষ্টু, একটা বোগাস কাগজ আমাকে সমাজবিধোধী বলেছিল, তা আমার ছেলেরা এ অপমান সহ করতে না পেয়ে গুনের প্রেসটা জালিয়ে দিয়েছে।

—নিজেই বলে দিচ্ছি তোরা কি। নিনা বলল।

—আমার ওপর রাগটা তোরা এখনো গেল না দেখছি, চায়ে মৌজ করে চুমুক দিল নাষ্টু, শোন, কাজের কথাটা আগে সেরে ফেলি, পরে হয়তো তুলেই যাব। হাজার বামেলা মাথায়...। এক ভদ্রলোক তোমাকে দিয়ে কিছু কাজ করতে চান নিলয়বাবু, তুমি যদি রাজী থাক ভালো পয়সা দেবে।

—কি কাজ ? নিলয় তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নাষ্টুর দিকে।

—কিন্তুই কাজ। ঠিক কি করতে হবে জানি না, বিজ্ঞাপনের ছবি-টবি হবে। লোকটার অগাধ পয়সা, ভালো টাকাই দেবে মনে হলু।

নিনা ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে—এই, গুলপট্টি মারার জায়গা পালনি ? ওকে হার দরকার সে ওর কাছে সোজা হুজি না এসে তোরা কাছে গেছে এ আমার বিশ্বাস করতে হবে ? ভূই কে বে ? তোকে কোনো ভদ্রলোক পাত্তা দেয় ?

বিশ্বুমাঞ্জ মেজাজের হেরফের হল না নাষ্টুর, তেমনি সহজভাবেই বলল—কেন

আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে তা জানি না। আমাদের পাটির খুব কাছের লোক, সেই স্ত্রেই আমার সঙ্গে আলাপ। আরে, আমার কি পজিশন তুই ভাবতে পারবি না। হাতে পাজি মজলবারের দয়কার কি, আমি ভুললোকের কার্ড রেখে যাচ্ছি, নিলয়ের পোষায় করবে, না পোষায় করবে না। আমি এর মধ্যে নেই। বিজনেস ইজ বিজনেস। ফেল কড়ি মাথ তেল। আমার বন্ধু বলে তোমাকে খাতির করতে হবে না ওকে। বলে একটা কার্ড পকেট থেকে বের করে নিলয়ের হাতে দিল নাটু।

নিলয়ের সঙ্গে মুহূর্ত চোখাচোখি হল নিনার।

—দেখতে পার। নিলয়কে বলল নিনা।

—এই তো ভালো মেয়ের মতো বুদ্ধি। নাটু হাসিমুখে বলল।

—কিন্তু দাদা, প্রস্তুতটা তুই এনেছিস বলেই আমার খটকা লাগছে। নিনা বলল। নাটু এবার হেসেই উড়িয়ে দিল।

তারপর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে, নিনার গালমন্দ খেয়ে, বাবুসোনাকে আদর ও নিলয়ের মাকে প্রণাম করে, স্নেহ-ভালোবাসা ও গুরুজনে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নাটু বিদেয় হতে নিনা বলল—ব্যাপারটার মধ্যে অনেকগুলো ফাঁক আছে।

—আমারও মনে হচ্ছে। দেখি না যোগাযোগ করে। আড-ফিল্ম হলে কুইর, এতদিন কেউ চিন্ত না। বোধ হয় তুরূপ সেনের দৌলতে কিছু স্থখ্যাতি বা কুখ্যাতি হয়েছে। আড-ফিল্মে আমাকে দেখানোর এখন বিশেষ আকর্ষণ আছে। বিজ্ঞাপন-ওলাদের মাথায় অনেকরকম বুদ্ধি পেল। অরুণকুমারের ডামি, দেখতে নাইনটি পারসেন্ট অরুণকুমার, বিজ্ঞাপন লোকের চোখ ধরবেই। আসলে সেই অরুণকুমার। দেখ, দেখ, লোকটাকে দেখতে একেবারে অরুণকুমারের মতো। কি রকম খুঁজে খুঁজে জোগাড় করেছে! আমি বরং এই কার্ডের নম্বরে একবার রিং করে দেখি।

নিনা ঘাড় নাড়ল।

নাটুর দেয়া কার্ডখানা নিলে বেরিয়ে পড়ল নিলয়।

এদিকে নির্জনতা কিঞ্চিৎ বেঁচে আছে। মধ্য শহরের আইটাই-করা ভিড় এখনে নেই। তার ওপর রোদের ঝাঁচ প্রচণ্ড। সাড়ে এগারোটোর মধ্যেই পথঘাট প্রায় ফাঁকা। খন্ডেরহীন অলস দোকানী, ছায়ার আশ্রয়ে বেওয়ারিশ কুকুর, রিকশাওলার। রাস্তার ধারে রিকশা রেখে নিজেরা আড়াল-আবডাল খুঁজে নিয়েছে। জনা তিনেক অফিসঘাত্রীকে শুধু দেখা যাচ্ছে সামনের গুমটিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের উদ্দেশে

দৌড়বার চেষ্টা করতে। নিলয়ের হাসি পেল। 'সাড়ে এগারোটা'র বাসে উঠছে। হাজিরা দেবে ক'টায়? বাসে উঠেই শুরু হবে ড্রাইভার কনডাক্টর থেকে গোটা পরিবহন ব্যবস্থার আত্মশ্রদ্ধ। কেউ কাজ করে না মশাই, কেউ কাজ করে না, দেখেছেন বাসটা ছাড়বার কথা সাড়ে এগারোটা'য়, এগারোটা পয়ত্তিরিশ হয়ে গেল, কাজের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেলে দেশের আর থাকে কি বলুন তো। দশটার পরের বাসে যেদিনই উঠেছে নিলয় এ ধরনের সংলাপ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং প্রায়শই লোকগুলোর পশ্চাদ্দেশে বুটের ডগা দিয়ে জোরালো ঠোকর দেবার প্রবল ইচ্ছাও হয়েছে। অবশ্য, সজে সজে এও মনে হয়েছে, ইচ্ছাপূরণ করলে শহরে জনমত কখনোই তার পক্ষে যাবে না। শহরের মোটামুটি সচ্ছল থেকে ওপরের দিককার মানুষের মানসিকতার বিশ্লেষণ ঘুরে গেছে। কেবলই পেতে চাইব, দেয়ার প্রসন্ন উঠলেই চোখ রক্তজবা। অথচ দেশের বেশির ভাগ মানুষের চাইতে এরা শতগুণ ভালো আছে।

বাসটা গুমটি থেকে বেরিয়ে গেল। জোরে হাঁটলে নিলয় ধরতে পারত। কিন্তু দৌড়ে বাস ধরার তাগিদ বোধ করেনি। দশটার অফিসে সাড়ে বারোটা-একটায় হা জেরা দেয়ার মহান দায়বদ্ধতা তার নেই। পোস্ট-অফিস পর্যন্ত হেঁটে গেলেও তার চলবে। দূরত্ব সামান্যই।

পোস্ট-অফিসে টেলিকোনের দায়িত্বে আসীন মহিলাটি নম্বর পেতে নিলয়কে যথেষ্ট সাহায্য করল। শোনা যায় আজকাল ধর্মবিশ্বাসী অনেকেই টেলিকোনে নম্বর ডায়াল করবার আগে ইষ্টমন্ত্র বা গুরুর নাম স্মরণ করে নেয়।

—নি, ধরেছে। বলে মুহূ হাসির সজে মহিলা রিসিভারটা নিলয়ের হাতে দিল।

—ধন্যবাদ। নিলয় রিসিভার নিল।

: হ্যালো, মিস্টার বাসু আছেন?

: আপনি কোন্ বাসকে খুঁজছেন? আমার দুটো গুয়ারের বাচ্চা আছে তারাও মিস্টার বাসু।

: জ্যা!

: হ্যা, হ্যা। আমার দুই ছেলে—দু'টি বিশুদ্ধ গুয়ারের বাচ্চা। যাক, আমাকে দিয়ে চলবে? আমি ডি. কে. বাসু। অল্প দু'জনকে পাবেন না। কোথায় পাবেন তাও জানি না।

: আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। নাস্টুবাবু আমাকে আপনার সজে বোগাবোগ করতে বলেছে।

: ওহ্‌হো, নিলয়বাবু, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং ।

: গুড মর্নিং । আমাকে আপনি কি কাজের জ্ঞান চাইছেন ? আড-ক্লিন ?

: ঐ ধরনেরই ছোট্ট কাজ । ...আচ্ছা, ষোল তারিখ মানে বৃহস্পতিবার আপনি ফ্রী আছেন ?

: তা আছি ।

: তাহলে দুপুর বারোটায় চলে আসুন আমার বাড়িতে । ঘণ্টা চারেক সময় নিয়ে আসবেন । আমার বাড়িতেই সমস্ত আরঞ্জমেন্টস আছে । ওখানেই সেবে নেব । সামান্য কাজ । পেমেণ্ট সকে সকে । আপনি নাস্টুবাবুর ভগ্নীশক্তি, আপনার খাতিরই আলাদা । হে, হে । ঐ কথাই রইল, বৃহস্পতিবার, দুপুর বারোটায় ।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ ।

নিলয় রিসিভার রেখে ভদ্রমহিলার হাতে একটি ছুঁটাকার নোট দিল । রসিদ লিপা হয়ে গেছে । মহিলা ডায়ার খুঁজে-পেতে কেবরত পরসা আর রসিদ নিলয়ের হাতে দিয়ে বলল—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা ডিজ্‌সেস করব ?

এক সেকেন্ডেও ভাবল নিলয় । —বলুন না, মনে করবার কি আছে ?

—আপনি নিলয় মজুমদার ?

নিলয় বুঝল বিনোদন-বার্তা তাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে । তবে অভ্যর্থনার আসনটা কেমন পাতা হয়েছে তা এখনো দেখা হয়নি । বিনোদন-বার্তার কাঁপটা জোড়া করতে হবে ।

চেষ্টাকৃত অবাধ হওয়ার ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে নিলয় বলল—নিলয় মজুমদার ? না, আমার নাম তুরূপ সেন ।

—তুরূপ সেন ! ভদ্রমহিলাকে বিহ্বল দেখাল ।

—হ্যাঁ, তুরূপ সেন ।

—আপনি বিনোদন-বার্তার তুরূপ সেন ? যিনি নিলয় মজুমদার আর অরুণকুমারকে নিয়ে দারুণ একটা আর্টিকেল লিখেছেন ?

চোখ কপালে তুলল নিলয় । —বিনোদন-বার্তার তুরূপ সেন, নিলয় মজুমদার, অরুণকুমার, আর্টিকেল—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । আমার নামও কিন্তু তুরূপ সেন—করি তালের ব্যবসা । তবে অরুণকুমারকে সিনেমায় দেখেছি ।

—যাকগে, হতাশভাবে ভদ্রমহিলা বলল, আপনার সঙ্গে কিন্তু অরুণকুমারের চেহারার দারুণ মিল ।

—হ্যাঁ, নিদারুণও বলতে পারেন। নমস্কার। বলে, ভদ্রমহিলাকে দুর্বোধ্য হাসি উপহার দিয়ে নিলয় তাড়াতাড়ি পা চালান।

ভদ্রমহিলা অসম্ভব জটিল অঙ্কটা বুঝতে না পেয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

নিলয়ের পেটের মধ্যে দুর্বৃত্ত হাসি পাক খাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল হো হো করে হেসে হাসিটাকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তার মতো বিখ্যাত ব্যক্তির এটা করা সাজে না, তাই হাসিটাকে পেটেই চেপে রাখতে হল। মহিলা নিশ্চয়ই দু'রাতির ধাঁধাটার জালায় ঘুমোতে পারবে না। তারপরেও বহুদিন, হয়তো ষড়দিন বেঁচে থাকবে, এই না মেলাতে পারা রহস্যের গল্প লোককে বলে যেমন আনন্দ পাবে তেমনি ভুগবে একটা অস্বস্তিতেও। অস্তত একটি মাহুঘের মনেও সে নিলয় মজুমদার তুরূপ সেন-টেনকে তালগোল পাকিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু অরুণকুমার তো স্বরাজ্যে স্বরাট, যেমন ঐ মহিলার মনে, আরো লক্ষ লক্ষ মাহুঘের চিন্তা ভাবনা কামনায় স্বপ্নে। এ চিন্তায় নিলয়ের উল্লাস নিশ্চিত হল।

বিনোদন-বার্তার কপিটা জোগাড় করা দরকার। কিন্তু বড় রাস্তার মোড়ে ছাড়া পাওয়া যাবে না। যেতে-আসতে এক মাইল। এই রোদে? থাক এখন। তাছাড়া, নিলয় হঠাৎ আবিষ্কার করল, অরুণকুমারের দু'নম্বরী চেহারাটা নিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে বিনোদন-বার্তা কেনা তার পক্ষে অতি কঠিন কাজ। তুরূপ সেন নিশ্চয়ই তার ছবি ছেপেছে। নইলে মহিলা তাকে চিনল কি করে?

অতএব নিলয় বাড়ির পথ ধরল।

আবাসনের গেটের কাছাকাছি রাস্তার ধারের অস্থায়ী চায়ের দোকান থেকে একটা ডোকরা বেরিয়ে এসে নিলয়ের সামনে দাঁড়াল। চেনা মুখ। এমন চেনা মুখ যা না চেনা থাকলেই মাহুঘ খুশি হয়।

—আরে দাদা, আপনাকে দেখলে মনে হয় ভিজে বেড়াল। আপনার যে এত গুণ জানতাম না মাইরি। তা দাদা, গুরুকে প্যাদালেন কেন?

ছোকরার স্ব-অত্যাচারিত শরীরটা তার একথানা সপাট চড়ে ক'হাত দূরে গিয়ে পড়তে পারে—নিলয় ভাবল। কিন্তু ভাবনা পৰ্ব্বভূই।

বাস্তবে নিলয় একেবারে বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে বলল—কি বলছ তুমি? উনিই আমার এভরিথিং। ওকে আমি মারতে পারি? কে বলছে এসব?

—বলছে না, আবার বলছেও।

—কোনো কাগজ-টাগজ বুঝি?

—হাঁ, বিনোদন-বার্ভা। আপনি দেখেন নি? আপনার ইন্টারভিউ ছেপেছে।
 —ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কি ছেপেছে দেখিনি।
 —যা লিখেছে অ্যা-ও হয় অ-ও হয়। সিগ্রেট খাবেন?
 —দাঁও।

সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ছোকরার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার
 জন্য নিলয় ওকে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ দিল। সিগারেট ধরানো হতে বলল—আজ
 তবে চলি ভাই। পরে দেখা হবে।

—নিলয়দা, একদিন গুরুর স্যাটিং দেখাবেন মাইরি? ছোকরা সিগারেটের স্বেদে
 আরজি পেশ করল।

—দেখবে, এ আর কি। চলি তবে।

বাড়ি ফিরতে নিনা বলল—এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরোয়! কি দেখাচ্ছে!
 নিলয় হাসল—এরই মধ্যে বুড়ো বানিয়ে ফেলতে চাও? আর, কেমন দেখাচ্ছে?
 কেন, অরুণকুমারের মতো।...এই তোমার দাদার কেসটা কিন্তু জেতুইন। বাড়িতে
 স্যাটিংয়ের ব্যবস্থা আছে, তার মানে রীতিমতো পয়সাওলা লোক। নাটুদার নাম
 বলতে দেখলাম বেশ খুশি হল।

—মেইজন্টেই ভয়, নিনা বলল, কি কাজ, কত দেবে?

—জিঞ্জেস করার চান্স পেলাম না। তার আগেই লাইন ছেড়ে দিল। বৃহস্পতিবার
 দুপুরে যেতে বলেছে। ঘণ্টা চারেকের কাজ—ওর বাড়িতেই। পেমেণ্টও সঙ্গে সঙ্গেই
 দিয়ে দেবে বলেছে। নাটুদার দেখলাম খুব খাতির।

—দয়া করে ও নামটা বারবার করো না। সাবধানে এগোবে বলে রাখছি।
 এখনো বলছি আমার দাদাদের তুমি চেনো না। দাঁও, জামা-গেঞ্জি খুলে দাঁও, কেচে
 দিচ্ছি।

নিলয় হাসি-হাসি মুখে শাটের বোতাম খুলতে লাগল।

১৩

জগদীশদা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। অগুদিন স্টুডিওতে কাজ থাকলে,
 কাজের পরেও আড্ডা চলে অনেকক্ষণ। আজ আর দেয়ি করেনি। কাজ শেষ হতেই

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

মন-মেজাজ ভালো না। জগদীশদা বেশ বুঝতে পারছে ফিল্ম-লাইনে নিলয়কে আর করে খেতে হবে না। ছেলেরটা ভালো। জগদীশদাই গুকে এ কাজে টেনে এনেছিল। তাতে অবশ্য দোষের কিছু হয়নি। যার কোনো কাজই ছিল না তাকে একটা কাজের সুযোগ করে দিয়েছিল। রোজগারপাতি মন্দ করছিল না। অন্তত চলে যাবার মতো। নিনা মেয়েটাও বড় ভালো; ওদের দু'জনকে একটা ঘরের ঠিকানা দিতে পেরে জগদীশদা বড় আনন্দ পেয়েছিল। নিজেকে ওদের অভিভাবকের মতো ভাবতে ভালো লাগে।

জগদীশদার মনে, একটা গোপন আশা ছিল, যা সে কোনোদিন কারো কাছে প্রকাশ করেনি। আজ নিলয়ের যে চেহারাটা তাকে অরুণকুমারের ডামির বেশি কিছু হবার সুযোগ দিচ্ছে না, কয়েক বছর পরে সেই চেহারাটাই হবে তার নায়ক হবার ছাড়পত্র।

অরুণকুমার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বয়সটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে। কিন্তু বয়স নিঃশব্দে গুড়ি মেয়ে এগিয়ে চলেছে। তাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য ব্যায়াম, ম্যাসাজ, ভিটামিন, ডায়েটিং। অশ্রুদিকে বয়সকে সাহায্য করার জন্য আছে প্রকৃতি, প্রতি সন্ধ্যায় মদের কোয়ারা এবং অনিবার্ভভাবে রমণী। পয়তালিশ বছর বয়সটাকে এখন কড়া মেক-আপেও তরুণ নায়কে নামিয়ে আনা যায় না। ঘনিষ্ঠ ক্যামেরা কখনো কখনো অসতর্ক হয়ে ধরে ফেলে মুখের অবাস্তিত কোনো রেখা, চুলে দু'একটা সূক্ষ্ম রুপোলী দাগ, মাংসের টিলে-ঢালা ভাব, জায়গায় জায়গায় অজ্ঞাতে সঞ্চিত বয়সের মেদ। তবু মাহুষ এখনো এসব ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। কারণ অরুণকুমারের অসাধারণ অভিনয়-কমতা। বয়সের অসঙ্গতি অভিনয়ে সে অনেকটাই পুষিয়ে দিতে পারে। আর আছে দীর্ঘ কুড়ি বছর নায়ক চরিত্রে একাধিপত্য করার ইমেজ। অরুণকুমারকে নায়ক ভাবা দর্শকের পুরনো গভীর অভ্যাস। কিন্তু আরো কয়েক বছর পরে যখন অসঙ্গতি মাত্রাছাড়া জায়গায় চলে যাবে তখন দর্শকের অভ্যাসও যা থাকবে। অরুণকুমার বুদ্ধিমান, ঐ জায়গায় পৌঁছবার আগেই সে সরে যাবে।

জগদীশদা জানে তখন নিলয়ের সামনে খুলে যাবে গন্ধর্বলোকের দরজা। প্রযোজক-পরিচালক নিলয়ের মাধ্যমে দর্শকের অভ্যাসটাকে ব্যবহার করতে চাইবে। নিলয়ের কাছে আসবে অক্ষরহীন সুযোগ। আর মাত্র চার কি পাঁচটা বছর। কিন্তু জগদীশদার হিসেব ভুল করে দিয়ে কি যে কাণ্ড হয়ে গেল একটা! তবু যদি বা ঘটনাটা আস্তে

বাস্তে থিতিয়ে যেত, বিনোদন-বার্তায় রিপোর্ট বেরুনোর পর আর কোনো আশাই
 নেই। সেদিনও নিলয় এসেছিল। কিন্তু তুরূপ সেনকে ইন্টারভিউ দেয়া বা স্থলক্ষণার
 দিকে দেখা করার খবর তো বলেনি। কেন এমন বোকামি করল নিলয় ? তুরূপ সেনটা
 মহা শয়তানি, কি চাল চলেছে কে জানে। হয়তো ইন্টারভিউ না দিয়ে উপায় ছিল না
 নিলয়ের। কিন্তু হতভাগাটা মরতে স্থলক্ষণার কাছে গিয়েছিল কেন ?

স্টুডিওতেই জগদীশদা প্রথম শোনে বিনোদন-বার্তার বাণী। মাহুষের অক্ষমতা
 আক্রোশের আশ্রয় খোঁজে। অরূণকুমার আহত হওয়ায় বহু লোকের রুজি-রোজগারে
 হাত পড়েছে। নিজেদের দুঃস্বার্থ আসল কারণ খুঁজে বের করার ক্ষমতা কারোই
 নেই, প্রতিকার দূরস্থান। তাই ডাইনি খোঁজার সংস্কার ভেতরে ভেতরে কাজ করে
 চলে। অরূণকুমারের দুর্ঘটনার জন্ত যেন নিলয়ই দায়ী এমন একটা গুঞ্জন কিছুদিন
 ধরেই চলছিল। নিলয় ইচ্ছে করে অরূণকুমারকে মেরেছে এ ধরনের কথা কেউ
 বলেনি। কিন্তু, সতর্কভাবে কাজ করা উচিত ছিল, অরূণকুমারের লেগে ষাওয়ার মানে
 বুসি, ঘুসি একটা চালালেই হল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইচ্ছাকৃত অপরাধের দায়িত্ব ওরা
 নিলয়ের ঘাড়ে চাপায়নি, অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্তই দায়ী করেছে। তবে ভুলটা বড়
 মারাত্মক, কয়েক হাজার মাহুষের অন্নবজ্রের প্রসঙ্গ এর সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু বিনোদন-বার্তার রিপোর্টে তুরূপ সেনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বেশ মোটাভাবেই
 ওদের কাছে ধরা পড়েছে। নিলয় ইচ্ছে করে অরূণকুমারকে মেরেছে এমন মারাত্মক
 কথা ওরা খোলাখুলি বলতে শুরু করেছে। ওরা একবারও ভেবে দেখেছে না এটা
 কতখানি আবাস্তব। মাহুষ এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন না হলে বিনোদন-বার্তার মতো
 কাগজ লাখ লাখ বিক্রি হয় ? তুরূপ সেনেরা মাহুষের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা আর স্বভাবের
 নোংরা দিকটাকে ভাঙিয়ে খেতে ট্রেনিং নিয়েছে, যাকে ওরা বলে সাংবাদিকতা। যে
 যত বেশি মাহুষের মনের মতো মিথ্যা লিখতে পারে বা দুর্বলতার জায়গাগুলিতে
 গুড়মুড়ি দিতে পারে সে তত বড় সাংবাদিক।

স্টুডিওতেই জগদীশদা বিনোদন-বার্তার এক কপি আনিয়ে পড়ে নিয়েছিল।
 আগাগোড়া তুরূপ সেনের চূড়ান্ত বদমায়েশি। খোলাখুলি না বলেও সমস্তই বলা।
 তুরূপ সেন জানে এই মুহূর্তে লক্ষ মাহুষের মন চাইছে অরূণকুমারের আক্রমণকারী
 এক জল্লাদকে আবিষ্কার করতে। নইলে অরূণকুমারের দুর্ঘটনা বাসি খবরে দাঁড়িয়ে
 যাচ্ছে—চমকপ্রদ কিছু আর এতে থাকছে না। অতএব খুঁজে বের কর এক জল্লাদ,
 সৃষ্টি কর এক নতুন চমক। নিলয় সেই জল্লাদ, সেই নতুন চমক। আইন বাঁচিয়ে

জনমতের আদালতে তাকে অভিযুক্ত কর। জনমত নামক আদালতের রায়ে বিনোদন-বার্তার বিক্রি বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ বৃদ্ধি।

ধর্মাত্মিকরণে এই অধর্মের বিরুদ্ধে নিলয় যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। কারণ বিচার বড়ই ব্যয়সাধ্য। এবং জাগতিক কারণে অধর্মের সঞ্চয়ে যাবতীয় সম্পদ বিধায় ধর্ম অধর্মে সম্পূর্ণ সমর্পিত। অর্থাৎ বিনোদন-বার্তা যা ইচ্ছা ছাপুক নিলয় প্রতিবাদ জানানোর ক্ষমতা রাখে না, বা, জানালেও পত্র প্রকাশের মতোই তা সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে বিনোদন-বার্তার ক্ষতি না হয়ে বৃদ্ধিই ঘটবে। জনে জনে এসব বলে বোঝানোর সারা জগদীশদার নেই। তাই সে বিরক্ত হয়ে স্টুডিও থেকে চলে এসেছে।

জগদীশদা শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবছিল। অবশ্যই নিলয় সম্পর্কে। মণিবৌদিকে সবই বলেছে জগদীশদা। মণিবৌদি বিনোদন-বার্তাটা পড়তে নিয়ে গেছে, ও ঘরে।

যোগ্যতার জোরে বেঁচে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। যোগ্যতা বলতে সাধারণ গড় যোগ্যতা। অসাধারণের চিরকালই অসাধারণ। ইতিহাসের পাতায় তাদের কাহিনিকলাপ লেখা থাকে।

কিন্তু ইতিহাসই লেখা হত না যদি না কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সাধারণ কাজ মূলতাকে বাঁচিয়ে রাখত। অথচ আজ আমরা এমন জায়গায় পৌঁছেছি যে সাধারণ মানুষের সাধারণ কাজ করে বেঁচে থাকার সুযোগ ক্রমেই কমে আসছে। বেঁচে থাকার গড়াই নিচ্ছে অদ্ভুত অস্বস্থ চেহারা। সাধারণকে অসাধারণ বানানোর মদ্রিয়া চেষ্টায় সে হচ্ছে আরো অক্ষম, আরো খর্ব। আর সাধারণ কাজের সীমিত সুযোগের জন্ত সাধারণদের মধ্যে চলছে অস্বস্থ প্রতিযোগিতা।

দাঁকা পথে চলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে মানুষ। এসবই ঘটছে, ঘটতে থাকবে মানুষের সহজাত বাচার আকঙ্কায়। নিলয়ের মতো সং সক্ষম একজন মানুষের কি বেঁচে থাকার অধিকার নেই? অকিসের কেরানী বা কারখানার শ্রমিকের কাজ সে ভালো-ভাবেই করতে পারত। সে যোগ্যতা তার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যোগ্যতা এখন আর শেষ কথা নয়। সুযোগ আদায়ের গলিঘুঁজি না চিনলে বা গ্রহ-নক্ষত্রের আশ্রয় যোগাযোগ না ঘটলে যোগ্যতার সোজা রাস্তা শেষ পর্যন্ত খোলা ময়দানে পৌঁছে দেয়, যেখানে প্রকৃতির অক্লপণ দান বাতাস প্রচুর মেলে, কাজের বিনিময়ে অর্থ মেলে না। নিলয় ময়দানেই পৌঁছে যেত, মারপথে জগদীশদা তাকে তুলে নিয়ে অদ্ভুত একটা কাল্পের গাড়িতে জুতে দিয়েছিল যে গাড়ির লক্ষ্য নিশানা গতি বড়ই অস্থির, অনিশ্চিত।

গাড়িটা হঠাৎ ধমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিলয়ের মাথা নেই একে আবার চালু করবার। কারণ, ঠিকভাবে দেখতে গেলে এটা কাজই নয়, অভিনয়ের কাজ তো নয়ই, বলা যায় কাজের অভিনয়।

অর্থাৎ নিলয়কে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তিনটি, না, চারটি প্রাণীর বেঁচে থাকার মালমশলা যোগানোর মতো দুর্ভাগ্যের গোড়াপত্তন করতে হবে তাকে। অথচ অর্থ নেই, অভিজ্ঞতা নেই, অসাধারণত্বের লেশমাত্রও নেই। না, না, জগদীশদা চিন্তার মধ্যেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল, উপায় একটা বের করতেই হবে। সে কখনো হার স্বীকার করেনি, নিলয়কেও হারতে দেবে না। কিন্তু তার আগে এই অস্থায়ের প্রতিকার না হোক অন্তত প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

মণিবৌদি ঘরে এসে বিনোদন-বার্তাখানা জগদীশদার হাতে দিয়ে বলল—কি লিখেছে ছাতা-মাথা।

—লোকে গিলছে। তারিয়ে তারিয়ে গিলছে। জগদীশদা উঠে বলল।

—কিছু করার নেই আমাদের? মণিবৌদির কপালে দুশ্চিন্তার আঁকাবঁকা রেখা।

—ভাবছি, জগদীশদা অশ্রমস্বভাবে বলল, আমি একবার বেঞ্চব। ফিরতে দেরি হতে পারে। আচ্ছা মণি, অমিয়দার ঘর দুটো কি ভাড়া হয়ে গেছে?

—না। কালই দিদি বলছিল চেনাজানা লোক না পেলে ওরা ভাড়া দেবে না।

—ওদের গিয়ে বলে এসো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে। আমাকে জিজ্ঞেস না করে যেন কাউকে কথা না দেয়। পাঞ্জাবি গায়ের গলাতে গলাতে জগদীশদা বলল।

মলয় পাত্র টেকনিসিয়ানস্ ইউনিয়নের সেক্রেটারি। করিতকর্মী ব্যক্তি। বলে ভালো, লেখে মন্দ না, জন-সংযোগের কলাকৌশল রপ্ত করেছে চমৎকার। অর্থাৎ যাকে সংগঠনী প্রতিভা বলে সে গুণটি তার আছে। মিনেমার জগতে প্রবেশ পরিচালকের তত্ত্বায় বা চতুর্থ সহকারী হিসেবে। সেখানে প্রতিভার তেমন পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রতিভা তার স্ব-ক্ষেত্র খুঁজে নিয়েছিল। নেতৃত্ব দেবার সহজাত ক্ষমতা ছিল। দাবিদাওয়ার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং শেষ পর্যন্ত দেখে নেবার মানসিকতা আছে মলয় পাত্রের। বহু যুদ্ধের সৈনিক। কিছু বিশ্বনিদ্দুক অবশ্য নানা কথা বলে। ঘোড়ার ঢাল-তলোয়ারগুলো নাকি অনেকসময়ই টিনের। জগদীশদা বিশ্বাস করে না। যেখানে লড়াইটা আধেরি নয়, সামান্য অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের, সেখানে সবার

স্বার্থ সমানভাবে দেখা সম্ভব নয়, ষোদ্ধাদের কপালে নিন্দামন্দও তাই জুটবেই। কিন্তু এত লোকের বিশ্বাস ও সমর্থনের পেছনে ষোগ্যতার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে।

মলয় খাতির করে বনাল জগদীশদাকে। —বহু জগদীশদা, বলুন কি খবর। চা খাবেন তো?

—তা খেতে পারি।

চাকরকে ডেকে চা দিতে বলল মলয়।

অনেকদিন অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে আসা হয়নি জগদীশদার। এর মধ্যে ঘরের সাজসজ্জায় দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো পরিবর্তন ঘটেছে। দেয়ালে কিকে সবুজ ডিসটেম্পার। নড়ধড়ে পালিশ না পড়া টেবিল-চেয়ারের জায়গায় মাঝারি দামের স্টীলের কানিচার। দু'জোড়া টিউব লাইট। স্টীলের ব্যাকে গোছানো ফাইল-পত্র। ঘরের এক কোনায় ছোট টেবিলে নতুন টাইপ-রাইটার। আধা-সম্পন্ন ভদ্র চেহারার অফিস।

অবশ্য টেবিলের ওপর রাখা শস্তা সিগারেটের প্যাকেটের পরিবর্তন ঘটেনি।

—ঘরটা বেশ সাজিয়েছ দেখছি। জগদীশদা বলল।

—কই আর তেমন পারলাম। ফাগুে টাকাই নেই। পয়লে দর্শনধারী। অফিস-টফিস ছিমছাম না হলে লোকে গুরুত্ব দিতে চায় না। মলয় সিগারেট ধরাল।

—আপনি তো সিগারেট খান না।

—সিগারেট আমার ঘাস ঘাস লাগে। বিড়ি না হলে জমে না। হ্যাঁ, যা বলতে আসা, বিনোদন-বার্তার কাণ্ডটা দেখেছ?

—দেখেছি। সিগারেটের নোয়া ছাড়তে ছাড়তে সতর্কভাবে বলল মলয়।

—কাজটা কি ওদের উচিত হয়েছে?

—না। কিন্তু করলে আপনি ঠেকাবেন কি করে?

—তা বলে যা ইচ্ছে তাই লিখবে? মাহুষের ক্ষতি করার অধিকার ওদের নেই নিলয়ের কি সর্বনাশ হয়ে গেল বুঝতে পারছ।

চাকর দু'পেয়লা চা দিয়ে গেল।

—নিন, চা খান। মলয় বলল।

জগদীশদা চায়ে চুমুক দিয়ে পেয়লা নামিয়ে রাখল।

—ভূমি কোনো স্টেপ নিতে পার না?

—আমি কি স্টেপ নেব? গোটা সিসটেমটা পচে গেছে। হিউম্যান কনসিডারেশন

পর্যন্ত নেই। যে যেমন করে পারছে ফয়দা তুলছে। আপনি আমি চিৎকার করলে কি হবে? আমার লোকজনেরা কাজের অভাবে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। আমার কাছে এসে ধরনা দিচ্ছে। আমি কি করব? কাজ থাকলে, তবে তো অনিয়ম অবিচার হলে আমি নাক গলাতে পারি। কাজ তৈরি করার ক্ষমতা আমার নেই। এই তো অবস্থা। নিজের লোকজনের জন্তুই করতে পারছি না। নিলয়বাবুর জন্তু কি করব?

—আমি নিলয়ের কাজের জন্তু তোমাকে বলতে আসিনি। ইউনিয়নের একজন সভ্য হিসেবে আমি চাই এই অস্থায়ের প্রতিবাদ করা হোক।

—তাই বা হয় কি করে? নিলয়বাবু আমাদের ইউনিয়নের সভ্য নন। সভ্য হতেও পারেন না। উনি টেকনিসিয়ান নন, আর্টিস্ট। আপনি আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারেন। আরেকটা কথা, আপনাকেই বিশ্বাস করে বলা যায়, গোটা ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ হলে কাজ হত। তা হবে না। এ নিয়ে আমি মুখ খুললে আমার লোকেরাই বিরক্ত হবে। ওদের সেক্টিমেন্টে যুক্তি নেই, যুক্তি আর সেক্টিমেন্ট দুটো আলাদা জিনিস, দুটো মিললে ভালো, না মিললেও আমরা নিরুপায়। আমি জানি নিলয়বাবুকে আপনি খুবই স্নেহ করেন। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা।

দূর থেকে মিছিলের স্লোগান ভেসে এল ঘরে। ছুনিয়াকা মজদুর এক হো।

—চলি তাহলে মলয়। মিছিল-টিছিল যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। জ্যামে না আটকে পড়ি। জগদীশদা উঠে দাঁড়াল।

তারকা-তালিকায় দ্বিতীয় স্থানটি প্রবালকুমারের। অরুণকুমারের পরেই তার স্থান, যদিও জনপ্রিয়তা ও দক্ষিণার দাবিতে দু'জনের পার্থক্য উনিশ-বিশ নয়, দশ-একশো। তবে অরুণকুমারের মতো কিংবদন্তীর নায়ক হতে না পারলেও প্রবালকুমারের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যা চলচ্চিত্র-জগতে অন্য কোনো নায়কের নেই। প্রবালকুমার শুধু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর স্ববাদেই শিক্ষিত মানুষ নয়, লেখাপড়ায় তার আগ্রহ আন্তরিক, সংস্কৃতি-জগতের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, তিনটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তার আত্মীয়তা শুধুই বিখ্যাত জনের অঙ্গভূষণ নয়, এদের কাজকর্মে রীতিমতো সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে প্রবালকুমার। তার লেখা প্রবন্ধ গল্প বেরিয়েছে পত্র-পত্রিকায়, সেগুলো নিছক প্রবালকুমারের পিতৃস্মরণ জোরেই ছাপা হয়নি। অন্য যে কোনো

নামে বেকলেও পাঠক মহলে হৈ হৈ না হলেও ছিঁছিকারও পড়ত না। নানা মঞ্চ থেকে নানান বিষয়ে তার বক্তৃতায় কিম্বী নায়কের সচরাচর-দৃষ্ট অঙ্কতাকে আবিভান দিয়ে পুষ্টিয়ে নেবার অপচেষ্টা থাকে না, বরং বক্তৃতায় তার দাগট বহু ভাড়াটে বক্তাকেও লক্ষ্য দেয়। এটা বিষয়ের ওপর অধিকার ছাড়া হয় না। ফলে বিদগ্ধ সমাজেও প্রবালকুমারের বিশেষ স্থান আছে, যেটাকে স্থান বললে হয়তো অনেকের আপত্তি হতে পারে, সাময়িক আশ্রয় বললে কারোই আপত্তি হবার কথা নয়। ব্যক্তিগত জীবনেও প্রবালকুমার পরিচ্ছন্ন। মত্তশানে পরিমিত। একবারই মাত্র একটি নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কিঞ্চিৎ আদিক। ঘটায় স্ত্রীর দিক থেকে কলহের সূত্রপাত হয়। অবশ্য ব্যাপারটা সহজেই মিটিয়ে ফেলে প্রবালকুমার। তারপর থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ধরবার মতো কোনো অ্যাফেয়ার প্রবালকুমারের দিক থেকে ঘটেনি। একজন জনপ্রিয় তারকার পক্ষে এ যে কি কঠিন কাজ তা খুব কমই লোকই ধারণা করতে পারে।

এহেন প্রবালকুমার স্বাভাবিক কারণেই আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তার সভাপতিত্বে বিভিন্ন সময়ে অ্যাসোসিয়েশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহের জন্তু কয়েকবারই চলচ্চিত্র-শিল্পীরা পথ-পরিক্রমায় নেমেছে। এমন কি অরুণকুমার পর্যন্ত একবার খোলা লরীতে দাঁড়িয়ে প্রায় এক ঘণ্টা সংগ্রহের কাজ সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন সংকটময় জাতীয় সমস্যায় প্রবালকুমারের নেতৃত্বে শিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। তারা বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছে, জনগণকে নানাভাবে উৎসাহ করতে চেষ্টা করেছে। এ ছাড়াও তিনজন হস্ত শিল্পীর সাহায্যার্থে তিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রবীণতম অভিনেত্রী চারুপ্রভা দেবী পেয়েছেন তিন হাজার টাকা, বৃদ্ধ অভিনেতা জিতেন ব্যানার্জীকে চিকিৎসার জন্তু দেয়া হয়েছে এক হাজার টাকা, অতীতের প্রখ্যাত ভিলেন চরিত্রাভিনেতা বরুণ মুনশীর কন্যার বিবাহে সাহায্য করা হয়েছে দু'হাজার পাঁচশো এক টাকা। প্রবালকুমারের সুযোগ্য নেতৃত্বে আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন এইসব কাজ করেছে বিগত কয়েক বছরে।

কিম্বী ছুনিয়ার সকলের দুয়ারই জগদীশদার জন্তু খোলা।

প্রবালকুমারের ড্রয়িং রুমে বসে তার সঙ্গে জগদীশদার কথাবার্তা হচ্ছিল।

প্রবালকুমারের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দু'টি দেয়াল-জোড়া আলমারিতে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য বইয়ে দেশী-বিদেশী লোকশিল্পের মূল্যবান নমুনা

দেয়ালে টাঙানো অসাধারণ ছবির সংগ্রহে প্রকাশ পাচ্ছিল।

বেতের সোফায় মুখোমুখি প্রবালকুমার ও জগদীশদা। মাঝখানে বেতেরই নিচু টেবিলে দামী পোর্সেলিনের পেয়ালায় কফি। প্রবালকুমারের ঠোঁটে চুপুট। জগদীশদার ডান হাতের হুঁআঙুলের ফাঁকে বিড়ি। হুঁজুরের সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ, যদিও অবস্থানে পার্থক্য বিস্তর।

প্রবালকুমারের চুপুট ঠোঁট থেকে হাতে নামল।—আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?

—ভূমি এই অত্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাও। একটা মানুষকে নিয়ে বিনোদন-বার্তার পিংপং খেলা ভূমি বরদাস্ত করবে ?

—তুমিই সব অত্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কি আমার আছে ?

—না, নেই। কিন্তু এই অত্যায়ের প্রতিবাদ তুমি নিশ্চয়ই করতে পার।

—কেনন করে ?

—তুমি কাগজে বিবৃতি দাও, তাতেই কাজ হবে।

—কি বিবৃতি দেব ?

—লিখে দাও নিলয় মজুমদার সম্পর্কে বিনোদন-বার্তার আপত্তিজনক সংবাদেয় তোমরা তীব্র নিন্দা করছ। দরকার হলে বিনোদন-বার্তাকে তোমরা বয়কট করবে।

—বড্ড ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে না জগদীশদা ? প্রবালকুমার হাসল।

—ছেলেমানুষি কোথায় দেখলে ?

—কিন্ম-মাগাজিনে যা সব ছাপা হয় তার প্রতিবাদ করতে হলে আমাদের অল্প কাজ করার সময় থাকবে না। তা ছাড়া...

প্রবালকুমারের হঠাৎ থেমে যাওয়া লক্ষ্য করে জগদীশদা বলল—তা ছাড়া ?

—আপনি ভালোই জানেন জগদীশদা, আমি না চাইলেও বেশির ভাগ আর্টিস্টই চায় কিন্ম-মাগাজিনে তাদের নিয়ে লেখা হোক। কেছা ছাপা হলেও আপত্তি নেই, লোকের নজর টানতে পারলেই হল। কেছাতেও পপুলারিটি বাড়ে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এইসব কাগজ আর্টিস্টের কাজের অ্যাসেসমেন্ট করার চেষ্টা করে না। অভিনয়ের ব্যাপারে সবাই অসম্ভব ভালো, খুব ভালো, বেশ ভালো, ভালো। অর্থাৎ হুঁতরকেই আসল জায়গা ঠিক থাকছে। আপনাকে আর কি বলব, বাদের টাকা কিন্মে খাটে তাদের টাকায়ই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিনোদন-বার্তার মতো কাগজও চলে। আপনি কোথায় হাত দেবেন ?

—সেক্স-স্ব্যাণ্ডাল ছেপে বাজার মাত করা আর সেইসঙ্গে আর্টিস্টকেও পাবলিসিটি দেয়া এক জিনিস, কিন্তু একজনের ভাত মারবার মতো খবর ছাপানো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

—মেনে নিচ্ছি। কিন্তু করার কি আছে বলুন। অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্দেশের খবর আমি জানি না, কিন্তু সুলক্ষণা নিলয়বাবুর ওপর ভীষণ খেপে আছে, একটু আগে টেলিফোন করেছিল। ধরে নিতে পারি অরুণকুমারের মনোভাবও আলাদা নয়। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া মানে আমি আইসোলটেড হয়ে যাব। অরুণকুমারের ক্রপা কে না চায়? প্রবালকুমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল।

—তুমি অরুণকুমারের ক্রপাপ্রার্থী? জগদীশদার হাসিটা ঝাঁক।

—ক্রপাপ্রার্থী না হলেও বন্ধুত্বপ্রার্থী অবশ্যই। প্রবালকুমার সহজ হাসির সঙ্গে উত্তর দিল।

—তার মানে, নিলয়ের যা হয় হোক, তোমরা আঙুল টি নাড়বে না।

—এ আঙুল যে নিজের ইচ্ছেয় নড়তে পারে না জগদীশদা। তা ছাড়া বিনোদন-বার্তার মতো কাগজে কি লেখা হল না-হল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ফুচকা লোকে প্রচুর খায়, কিন্তু নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকায় ওটা থাকে না কিংবা ওটাকে প্রয়োজনীয় খাণ্ড বলেও কেউ মনে করে না।

—তোমার কাছে যা খেলা, অগ্নের তা মরণ। প্রবালকুমার, নিজের ভালোটাতে অক্ষত রেখে পরের ভালো করা যায় না। কি দরকার অ্যাসোসিয়েশন-ফাসোসিয়েশন করে? তোমরা স্লিম-ম্যাগাজিন ওয়ালাদের চটাতে পারবে না, অরুণকুমার-সুলক্ষণার মতো নামী-দামীদের ভালো লাগার ওপর নির্ভর করে তোমাদের সিদ্ধান্ত। লোকের ভালো তা হলে কি করে করবে? তোমাকে বরাবরই ভাবতাম অন্তর্দেশ থেকে আলাদা, তাই তোমার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু...

—কিন্তু কি জগদীশদা? প্রবালকুমার তার স্মার্টনেস বজায় রেখে হাসতে চেষ্টা করল, হাসিটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল না।

—তোমার কালচার্ড মাহুঘের ভক্তিটাও নিজের প্রচারেরই কায়দা। তুমি জান অরুণকুমারের মতো ম্যাটিনি আইডল হবার কমতা তোমার নেই, তাই ইনটেলেকচুয়াল সেজেছ। আরে বাবা, মাহুঘকে ভালোবেসে ত্যাগ স্বীকার করতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কালচার। তোমার পুঁথিপস্তরের ডেকোরেশন থাক। জগদীশদা বিড়ির শেষটুকু আশঙ্কিতে ফেলল।

প্রবালকুমারের মুখ-চোখে অস্বস্তি, বিরক্তি। তার সামনে বসে থাকা ভুচ্ছ মাহুঘটাকে সে এক্ষুনি চাকর ডেকে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু নীরুপায় প্রবালকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজেকে সংযত করল। সমানে সমানে সম্পর্ক রাখাই ভালো। নিচের মাহুঘদের জায়গা নিচেই। লোকটাকে জগদীশদা ডেকে ঘনিষ্ঠ হবার স্বযোগ সেই দিয়েছে। এখন সফল করা ছাড়া উপায় নেই। লোকটা ভালপালা ছড়ানোর বিচ্ছে ভালো জানে। ঠেকে অপমান করা মানে নিজেরও অপমান ডেকে আনা। প্রবালকুমার হিসেবে ভুল করতে রাজী নয়।

—ওঃ, গাল দিয়ে আর রাখলেন না। নিলয়বাবুর জন্তু করার কোনো উপায় থাকলে আমি সত্যিই করতাম। কিন্তু প্রলোভন অনেক। ঠুঁকে আমাদের আ্যাসোসিয়েশনের আওতায় আনা যায় না। উনি তো ঠিক আর্টিস্ট নন।

—হ্যাঁ, টেকনিসিয়ানও নয়। জগদীশদা আড়ামোড়া ভেঙে বলল।

—তার মানে ?

—এমনিই বললাম। চল।

হঠাৎ জগদীশদার মনে হল দূর থেকে মিছিলের সেই ধ্বনিটা ভেসে আসছে। ধ্বনিয়াকা মজহুর এক ছো। কান পেতে মুহূর্ত দাঁড়াল জগদীশদা। নাঃ, শোনার ভুল। প্রবালকুমারের বাড়ি যে এলাকায় সেখানে মিছিল ঢোকে না।

জগদীশদার মুখের চেহারা নিলয়-নিনাকে ভয় পাইয়ে দিল। রুক্ষ ক্রান্ত গষ্ঠীর ও বিরক্ত।

জগদীশদা চোঁকিতে বসে প্রথমেই হাত ঢোকাল কাঁধের কোলায়। নিনা নিলয় সামনে দাঁড়িয়ে। এমন মূর্তি কেন জগদীশদার—সে চিন্তা ওদের হৃৎজনেরই মনে।

ব্যাগ থেকে বিনোদন-বার্তার কপিটা বের করে ফরফর করে পাতা উলটে একটা জায়গা দেখিয়ে জগদীশদা বলল—কি লিখেছে এগুলো ?

নিনা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। নিলয়ও ঝুঁকে পড়ল কাগজের ওপর।

প্রথমে বড় হরফে :

“অকথিত কাহিনী

অরুণকুমার কি সত্যিই দুর্ঘটনার শিকার ?”

তারপর স্পন্দর অফসেট ছাপায় দীর্ঘ কাহিনী :

“আপনারা কি জানেন অরুণকুমারের একজন ডামি আছেন? খুঁকির দৃশ্যে সাধারণত বড় অভিনেতারা ডামির সাহায্য নিয়ে থাকেন—সিনেমার খবর ধারা রাখেন ডামির সঙ্গীতেও তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন। তাহলে আর বিনোদন-বার্তা আপনারদের নতুন কি শোনাল? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরও আপনারা এখনই পাবেন।

দেখুন তো নিচের ছবি দুটো। একজন নিশ্চয়ই অরুণকুমার। অগ্রজন? কি বললেন? অগ্রজনও অরুণকুমার? না, ইনি অরুণকুমার নন। ইনি অরুণকুমারের ডামি নিলয় মজুমদার। আশ্চর্য মিল দু’জনের চেহারায়, তাই না? নিলয়বাবুকে সামান্য মেক-আপ দিলেই অরুণকুমারের সঙ্গে তার পার্থক্য খুঁজে বের করা সম্ভবই শক্ত।

সেই অর্থে নিলয়বাবু একজন ‘বিশেষ’ ও ‘মূল্যবান’ ডামি। এ রকম একজন ডামি থাকলে নায়কের বামেলা-বক্সি কমে যায়। যে ডামির সঙ্গে অভিনেতার চেহারার মিল নেই তাকে দিয়ে কাজ করানোর অসুবিধা বিস্তর। পরিচালকরা হাড়ে হাড়ে তা টের পান। কিন্তু কোনো বড় নায়কের যদি নিলয়বাবুর মতো ডামি থাকে তাহলে পরিচালক ও নায়ক দু’জনেরই প্রচুর সুবিধা। রিস্ক-শট, নিতে গিয়ে পরিচালককে কপাল চাপড়াতে হয় না। যে লোকটি নায়কের বদলি হিসেবে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল, পেছন থেকে নেয়া শটেও সে যে বদলি তা দর্শকের চোখে ধরা পড়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবরাই হয়েছে। তাই কাছের রিস্ক-শট, অনেক সময় খুঁকি নিয়ে নায়ককে নিজেকেই দিতে হয়। নায়করা এটা পছন্দ করেন না। কিন্তু নিলয়বাবুর মতো ডামি হলে অরুণকুমারের মতো নায়করা নিশ্চয়ই নির্বঙ্কিতে কাজ করতে পারেন। সেইজগতই বলছিলাম নিলয়বাবু একজন ‘বিশেষ ও মূল্যবান’ ডামি।

কিন্তু নিলয়বাবু যত বড় ডামিই হোন না কেন তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নিশ্চয়ই বিনোদন-বার্তার পাঠকদের নেই। আমাদের আগ্রহের কারণ অগ্রজ।

আপনারা কি জানেন যেদিন অরুণকুমার আঘাত পান সেদিন স্ন্যাটিংয়ে সেটে ছিলেন মাত্র দু’টি ব্যক্তি? অরুণকুমার আর তার ডামি নিলয় মজুমদার? প্রচণ্ড মারপিটের দৃশ্যে অরুণকুমারের বৈত চরিত্রে অভিনয়। অভিনয় করছিলেন অরুণকুমার, বৈত চরিত্রের অন্তর্গতে তাঁর ডামি নিলয় মজুমদার। সেই সময় অরুণকুমারের আঘাত লাগে বা...।

সেই দৃশ্যের তিনটি স্টিল ফোটো, তিনটি বিশেষ মুহূর্তের, একমাত্র বিনোদন-বার্তাই পেয়েছে সংগ্রহ করতে। ছবি তিনটি আমরা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। কে অরুণকুমার

আর কে নিলয় মজুমদার বোঝা সত্যিই মুশকিল, না ? তৃতীয় ছবিটিতে দেখুন—যিনি আহত হবার ভঙ্গিতে তিনি অরুণকুমার, উদ্ভতমুষ্টি অগ্ৰজন নিলয়বাবু। আহত হয়ে নার্সিং হোমে যাবার আগে এটাই অরুণকুমারের শেষ ছবি।”

—বাণ্ডো সাহেব ! নিলয় অশ্রুটে বলল।

—ও বাটা মাতালের মাথা ঠিক আছে, জগদীশদা বলল, তোকে এমনিই প্রোজেকশন দেখিয়ে দিয়েছে। তুরূপ সেন ছ'বোতল দামী মদ খাইয়ে প্রোজেকশন দেখেছে, তিনটে স্টিলও বার করে এনেছে। দেখ, দেখ, আরো কি লিখেছে দেখ, সবটা পড়া হয়ে গেল ?

—না।

“পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ্য করে থাকবেন ছবিটির প্রযোজক পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান সেদিনের দুর্ঘটনা সম্পর্কে একেবারেই মুখ খুলছেন না।

অরুণকুমার স্মাটিংয়ের সময় বাইরের লোককে থাকতে দেন না। স্মাটিংয়ের সময় ছিলেন শুধু অরুণকুমার, তার ডামি, প্রযোজক, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও কয়েকজন কর্মী। কর্মীরাও মুখে ফুলপ এঁটেছেন। অবশ্য কর্মীমহলে নানারকম আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে। তাঁরা ক্ষুব্ধ। অবশ্যই নিলয়বাবুর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ। তাঁরা নিলয়বাবুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে দায়ী করছেন। তাঁদের ধারণা নিলয়বাবু সতর্ক হয়ে কাজ করলে অরুণকুমারের আঘাত লাগত না।

কর্মীদের ক্ষোভের কারণ আছে। অরুণকুমার আহত হওয়ায় তাঁদের অনেকেই আজ বেকার। কিন্তু তাঁদের অভিযোগে কি কোনো সত্যতা আছে ? নিলয়বাবু কি এতই নির্বোধ যে বেপরোয়া কাজ করে গোটা সিনেমা শিল্পকে, সেই সঙ্গে নিজেকেও বিপদে ফেলবেন ? অরুণকুমারের জগ্গই ইনডাস্ট্রিতে নিলয়বাবুর কদর। না, নিলয়বাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁকে আমাদের মোটেই নির্বোধ মনে হয়নি, বরং আমাদের তাঁকে মনে হয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ভদ্র ও বিবেচক। নিলয়বাবুর এইসব গুণাবলীই দুর্ঘটনার রহস্যটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। আমাদের প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমরা তাঁর সৌজশ্চে বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হয়েছি, কেন যে কোনো কোনো মহল থেকে তাঁকে দায়ী করা হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা নিঃসন্দেহ যে সচেতনভাবে নিলয়বাবু অরুণকুমারকে আঘাত করেননি, করতে পারেন না।”

,—এ যে পাথার গবেষণা। আমার মতো মুখ্যও এসব লিখে কি হয় বুঝতে পারছে

না। নিনা মস্তব্য করল।

—আমাদের দেশে সত্যিকারের গাধা আর হারামীর সংখ্যা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। নইলে এগুলো ছাপাও হত না, বিক্রিও হত না, জগদীশদা অশালীন শব্দ ব্যবহার করেও নিবিকার, কদ্দুর হল? ইন্টারভিউটা এসেছে?

—না।

—তাড়াতাড়ি পড়। ছাইপাঁশ অনেকটা এখনো পড়তে হবে।

—না পড়লাম।

—না, তোদের পড়া সরকার।

“নিলয়বাবুর সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি তুরূপ সেনের সাক্ষাৎকার আমরা হুবহু ছেপে দিলাম।”

এরপর সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছে।

“আপনারা লক্ষ্য করবেন ডামি নিলয়বাবু সব সময় অরুণকুমার সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। নিজের আর্থিক দুর্বস্থা, কাজের স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদির জন্তু নিজের যোগাতার অভাব বা ভাগাকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু তবুও তার চাপা ক্ষোভ ঈর্ষা ক্রোধ গোপন থাকেনি। সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সংঘত রাখতে, তবু সময় সময় তার গোপন যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। মুখে ফুটে উঠেছে উদ্বেজনা ও বেদনার নানা অভিব্যক্তি।

আমাদের ক্যামেরাম্যান জ্যাকি খাষাটা এমন কয়েকটি মুহূর্ত ধরে রেখেছেন তাঁর ক্যামেরায়, তা থেকে তিনটি আপনাদের উপহার দিলাম।

.. আমরা বলতে চাই অ্যান্ড্রিডেন্ট ইজ অ্যান্ড্রিডেন্ট। নিলয়বাবুর ঘৃষিতেই যদি অরুণকুমার আহত হয়ে থাকেন তাহলেও তিনি দায়ী নন। নিলয়বাবু অবশ্য বলেছেন তাঁর ঘৃষি অরুণকুমারের পেটে লাগেইনি। তাঁর পেটে আঘাত লেগেছে পড়ে থাকার সময়, চেঁচালের কাগে। যদি ধরেও নেয়া যায় যে নিলয়বাবুর ঘৃষিই অরুণকুমারের আঘাতের কারণ, সে ক্ষেত্রে আমরা মনে করি তিনি সম্মানে এ কাজ করেননি।

বছরের পর বছর ধরে নিজের অনেকটাই তিনি ধার দিচ্ছেন অরুণকুমারকে। অথচ ভ্রূভাবে জীবনযাপন করার মতো অর্থও তাকে দেয়া হয় না, সম্মান মর্বাদা খ্যাতি তো অবাস্তব করন। অরুণকুমারের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে নিলয়বাবু কি যন্ত্রণা ভোগ না করে পারেন? ফ্রাসট্রেশন কি তাঁর পক্ষে অনিবার্য নয়? কে বলতে

পারে যে সেই মুহূর্তে সাজানো ঘুঁষিটাই বজ্রমুষ্টি হয়ে ওঠেনি ? আমরা নিলয়বাবুকে দায়ী করছি না। শুধু মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনার দিক থেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি। যদি এই ব্যাখ্যা সত্যি হয়, তাহলে সমস্ত ঘটনাটার জন্ত দায়ী নিলয়বাবু নন, দায়ী ইনডাস্ট্রির বঞ্চনা, ইনডাস্ট্রির দীর্ঘ বঞ্চনাই হয়তো নিলয়বাবুকে সেই মুহূর্তে আত্মবিশ্বাস্ত করে ফেলেছিল।

যদি নিলয়বাবুর ঘুঁষির আঘাতেই অরুণকুমার আহত হয়ে থাকেন তাহলে এ ভাড়া ঘটনার আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। সজ্ঞানে নিলয়বাবুর পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব, অসম্ভব, অবিশ্বাস্ত। অগ্ন্যধায় টেবিলের কোনায় আঘাত লাগা সম্পর্কে নিলয়বাবু যা বলেছেন তা-ই একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প বলে আমরা মনে করি।”

নিলয় নিনার পাশ থেকে সরে এসে জগদীশদার পাশে বসল। নিনা তখনো পড়ছে।

—তুই সেদিন আমাকে বলিসনি কেন যে তুরূপ সেন তোর কাছে এসেছিল ? জগদীশদা জিজ্ঞেস করল।

নিলয় নীরব।

—বল কেন চেপে গিয়েছিলি।

—তুরূপ সেন ইন্টারভিউর জন্ত আমাকে দু’হাজার টাকা দিয়েছে। নিলয় মুখ নিচু করে আন্তে বলল।

—শুধু তা-ই ?

—ইন্টারভিউ না দিলে স্টিলগুলো ছেপে যা হচ্ছে তা-ই লিখত।

—তুই অমনি ভয় পেয়ে গেলি। এখনো যা হচ্ছে তা-ই লিখেছে। তুই স্টু. ডিও পাড়ার গুজবটাকে একেবারে কাগজে এনে ফেললি। আমি ভেবেছিলাম আন্তে আন্তে সব খিতিয়ে যাবে। কিন্তু আর কোনো রাস্তা রইল না। অরুণকুমার খেপেই আছে, আরো খেপে যাবে। কাগজগুলো এ নিয়ে গবেষণা চালাবে বছরদিন। . . . তোকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে, বুঝি সবই।

নিনা কাগজটা জগদীশদার হাতে দিয়ে নিলয়কে বলল রীতিমতো চড়া স্বরে - তুমি বিনোদন-বার্তার বিরুদ্ধে যামলা কর। আচ্ছা জগদীশদা, যামলা করা বাস্তব না ?

—হ্যাঁ, বাস্তব, জগদীশদা ম্লান হাসল, তিন লক্ষ টাকা খরচ করতে পারলে দশ লক্ষ টাকা হয়তো আদায় করা যায়। কিয়, পারবি ? . . . দেখ, অগ্ন্যধায়ের প্রতিষ্ঠাকার-

টাতকার সনতে ভালো। কিন্তু আদালত হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে গরিব মানুষই সবচাইতে অসহায়। মানুষ কোথায় নেমে গেছে ভাবা যায় না। নীতির প্রশ্নে লড়াই করা মানুষ ভুলে গেছে। লড়াই হবে আমার বা আমার গোষ্ঠীর মুখে চেয়ে। এবং লড়াইয়ের সঙ্গে সব সময় লাভ-ক্ষতির হিসেব থাকবে। সবচেয়ে আগে হিসেব করে দেখা হবে এ লড়াই শুরু করলে যারা রাগতে পারে তারা না-রাগলে আমার লাভ বেশি না লড়াইতে জিতলে লাভ বেশি। নীতি-কীতি বহুকাল নির্বাচনে গেছে। মলয় শাজের কাছে গেলাম, সে যুক্তি দেখাল নিলয় টেকনিসিয়ান নয়, অতএব টেকনিসিয়ানস্ ইউনিয়নের কিছু করার নেই। প্রবালকুমারের কাছে গেলাম। সে বলল, নিলয় আর্টিস্ট নয়, তাই আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের এ ব্যাপারে নাক গলানো চলে না। কিন্তু নিলয় যে একটা সং সাধাবণ খেটে-খাওয়া মানুষ, তার প্রতি কয়েকটা লোক যে বিব্রাট অন্ডায়টা করে যাচ্ছে শুধুমাত্র নিজেদের পকেট ভাঙ্গি করার জন্য, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে না? লড়াই যানে এখন দরাদরি করে কিছু আদায় করা। এটা যে সরকারে ব্যাপার কেউ বুঝে না। যার দরাদরি করবার ক্ষমতা বেশি, যারা দলে ভাঙ্গি, তাদের আদায়ও হবে বেশি। যারা তুলনায় কম ভাঙ্গি, তাদের আদায়ও হবে কম। আর যাদের দল বাঁচার ক্ষমতা নেই, যেমন নিলয়, তারা শুধু পড়ে পড়ে মার খাবে। পাওনা আদায়ের সমস্ত লড়াই একটা পরিষ্কার সমান নীতি থেকে হওয়া উচিত। নইলে আমরা নিজেরাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাব। প্রবালকুমার প্রবালকুমারের মতোই বলেছে, ও নিয়ে ভাবি না। কিন্তু মলয় শাজের মুখে কি ও বক্তব্য মানায়? মানুষ কান পরিচয়ে ছোট বাঁধবে? আমি খেটে খাই—এই পরিচয়ে? না, আমি এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, অতএব বিশেষ সুবিধা আমার প্রাপ্য—এই পরিচয়ে?

জানি, পুরোপুরি এটা মেনে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু, ক্রমাগত আলাদা আলাদা দলে স্বযোগসুবিধা আদায়ের জন্য পাঞ্জা লড়াই চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে আমরা? মানুষের মিলবার জায়গাটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ নিজের গোষ্ঠীর বাইরে তাকাচ্ছে না। এই বুঝি তার সুবিধায় হাত পড়ে যায়।...আচ্ছা নিলয়, বিনোদন-বার্তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে জগদীশদা বলল, তুই স্বলক্ষণার কাছে গিয়েছিলি কেন?

সপ্রশ্ন চোখে নিলয়ের দিকে তাকাল নিনা। নিলয়ের চোখ মেঝের ওপর।

বিনোদন-বার্তার শেষের দিকে একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কাগজটা নিলয়ের হাতে দিল জগদীশদা। নিলয় আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে। কাগজটা ওর

তে, কিন্তু পড়ে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

নির্না কাগজটা নিলয়ের হাত থেকে নিয়ে নিল।

মাঝারি হরফ :

“অক্ষয়কুমারের ক্যাটে নিলয় মজুমদার কেন ?”

তারপর :

“এই সংখ্যায় নিলয় মজুমদারকে নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন এখন ছাড়া হচ্ছে তখন আমাদের কাছে সংবাদ আসে যে তিনি হিলটন স্ট্রীটে অক্ষয়কুমারের ক্যাটে গিয়েছিলেন। তিনি আধ ঘণ্টার মতো সময় সেখানে ছিলেন। হয়তো সুলক্ষণা দেবীর বিপদের সময় তাঁকে সাহায্য দিতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যাট থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

আমরা টেলিফোনে সুলক্ষণা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। অক্ষয়কুমারের জন্য তিনি খুবই উদ্বেগ উৎকর্ষ ও চুশ্চিত্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

নিলয় মজুমদার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি সরাসরি নিলয় মজুমদারকে অক্ষয়কুমারের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করে বলেন যে, তিনি নিলয়বাবুর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করবেন। আমরা অবশ্য সুলক্ষণা দেবীর উক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। কারণ, মামলা করতে হলে করতে পারেন অক্ষয়কুমার, সুলক্ষণা দেবী নয়। অক্ষয়কুমার বিচক্ষণ মানুষ, তিনি অকারণ মামলায় একজন নির্দোষ মানুষকে জড়াবেন কেন? কিন্তু নিলয়বাবুর সঙ্গে সুলক্ষণা দেবীর কি কথাবার্তা হয়েছিল সে প্রশ্নে তাঁর নীরবতা বহুশ্রময়।”

কাগজটা খাটের ওপর ছুঁড়ে কেলে নির্না ফুঁসে উঠল—ইস, মামলা করবে? করুক না মামলা। একটা নোংরা মেয়েছেলে...। কিন্তু তুমি, তুমি ওর কাছে গিয়েছিলে কেন? আমাকেও তো বলনি।

নিলয় একবার নির্নার মুখের পানে তাকিয়েই আবার মাথা নিচু করল।

—ভুরুপ সেন আমাকে বলেছিল ওর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বলতে পারলে হয়তো সুবিধা হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম ষাট না। কিন্তু সেদিন জগদীশদার বাড়ি থেকে ফেরার পথে হঠাৎই মনে হল দেখি না একবার গিয়ে।

—কি দেখলে গিয়ে? কি লাভ হল তোমার? নির্নার গলায় ঝাঁজ।

নিলয় নিরুত্তরে অসহায়ভাবে তাকাল।

—তোকে আশ্রয় বলতে হবে না, যা বোঝবার আমি বুঝে নিয়েছি, জগদীশদার

বলল, আরে বোকা, তুরূপ সেনের চাল তুই বুঝতে পারিল নি। ও তোকে টোপটা গিলিয়ে নিশ্চয়ই অক্ষয়কুমারের স্ন্যাটের কোনো কাজের লোককে ঘুষ-বাধ দিয়ে নজর রাখতে বলেছিল। খবর শুধু যে আপনা-আপনি তৈরি হয় তা নয়, খবর তৈরিও করে নিতে হয়। ষাক, সাগরে ষা শয্যা শিশিরে তার ভয় কি? মামলা-ফামলা হবে না। ও নিয়ে আমি চিন্তা করছি না। কিন্তু...

মা চা নিয়ে ঢুকতে জগদীশদা চুপ করে গেল।

—নাও বাবা, চা খাও। জগদীশদার সামনে চায়ের পেয়লা রেখে মা বললেন।

—আপনি আবার অস্থস্থ শরীরে চা করতে গেলেন কেন মাসিমা?

—আমি এখন বেশ ভালোই আছি বাবা।

—জগদীশদা, যা বলছিলেন আপনি মা'র সামনেই বলুন। আমি যতদূর জানি মাকে সবই বলেছি। নিনা বলল।

—হ্যাঁ নিলু, বোমা আমাকে বলেছে। জগদীশ, বাবা, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। আমার ছেলেকে তুমি অল্প যে কোনো একটা কাজ ঠিক করে দাও। কেমন কাজ যেখানে প্রাণপণ খেটেও পরগাছা হয়ে থাকতে হয়? এ কাজ নিলুকে আর আমি করতে দেব না। আমার কিছু সোনা আছে। যদি দরকার হয় সেগুলো বিক্রি করেও টাকা পাওয়া যাবে। আমার ছেলেকে আমি জানি। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা ওর আছে। তুমি শুধু রাস্তাটা ওকে দেখিয়ে দাও বাবা।

—না মা, সোনা তুমি বিক্রি করতে পারবে না। নিলয় বলল।

—তুই তোর দাদা আর বোনদেবর কথা ভাবছিল। ওরা কি মনে করবে—ভাই না? ওরা আমার জগ কতটুকু ভেবেছে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কতটুকু দাম দিয়েছে যে আজ আমি ওদের জগ ভাবতে বসব? না নিলু, অত উদার আমি নই। শুধু পাবার জন্তে ষারা হাত বাড়িয়ে আছে, দেবার হাত কখনো বাড়ায় না তারা আমার সম্মান হলেও তাদের দিয়ে-থয়ে ভালো-মা হতে আমি চাই না।

—আমিও যে শেষ পর্যন্ত ঐ রকমই হব না কে বলতে পারে। নিলয়ের মুখে হাসি ফুটল।

মাও হাসলেন—কেউ বলতে পারে না ঠিকই। তবে মা বোধ হয় অন্তদের চাইতে বেশি পারে।

—ষাক, বাঁচা গেল, জগদীশদা হঠাৎ যেন নিজের স্বাভাবিক খুশির মেজাজ ফিরে পেল, আমি ভাবতেই পারছিলাম না কি করে কথাটা পাড়ব। নিলয়, আমি মাসিমা

সঙ্গে একমত, তোর ডামিগিরির এখানেই শেষ । তোকে নতুন করে শুরু করতে হবে । মাহুঘ মাহুঘের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে । সেখানে মাহুঘ যেমন দেয়, তেমনি নেয় । কম-বেশি থাকে । কিন্তু আমি একটা মাহুঘকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, অন্তত তার আধাআধি তো আমিই, অথচ তার দাবি যোল আনার ওপর আঠারো আনা, আর আমার টিকে-থাকা সে দয়া করলে তবেই । অরুণকুমার যে তোকে আর দয়া করবে তাও মনে হয় না । নিলয়, অল্প পথ তোকে দেখতেই হবে ।

অসহায়ভাবে নিলয় বলল—কি করব আমি ?

—আরে বাবা, যার ঘরে এমন দু-তুটো সাহসের জায়গা আছে তার আবার ভয় কি ? আমার একটা প্লান আছে । অভিনয়ে অনেক রিস্ক তুই নিয়েছিস । যে কোনো সময়ে অ্যান্ড্রিডেঞ্চে মারা পড়তে পারতিস । তার বদলে তুই পেলি কি ? হঠাৎ আবিষ্কার করলি তোর নিজের কাজও তোর নিজের নয় । এবার থেকে তোর নিজের কাজের মালিক তুই নিজেই হবি । ফিল্ম-লাইনে তোর হবার মতো কাজ আপাতত আমি দেখছি না । আমি ষা ভেবেছি, বলছি । মাসিমার সোনা এক্সনি বিক্রি করবার দরকার নেই । সোনা কিনতেই দাম, বিক্রির সময় অর্ধেকও পাওয়া যায় না । শোন, তোর ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দে । খন্ডের আমি ঠিক করে দেব । বাড়িঘরের দাম যা বেড়েছে তুই সরকারী দেনা শোধ করেও হাজার তিরিশ টাকা লাভ পাবি । আমার বাড়ির কাছে দু'খানা ঘর দেখে রেখেছি । বড় ঘর, তবে টালির চাল, তাতে যায় আসে না । ওখানে উঠে চলে আয় ।

—তারপর ? মুহু স্বরে প্রশ্ন করল নিলয় ।

—তারপরের ভাবনা আমার । তিরিশ হাজার মূলধন থাকলে মাসে দু-আড়াই হাজার রোজগার কোনো সমস্যা নয় । দোকান দিয়ে বসলেও ভালোই চলে যাবে । দোকানঘর আমি ঠিক করে দেব । দোকান চালু করে দেবার দায়িত্ব আমার । শহর যে যেটে বাড়ছে তাতে খন্ডের অভাব কোনোদিন হবে না ।

—তার মানে আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হবে ? ফিল্মে আমি কাজ করতে পারব না ?

—হ্যাঁ, পালিয়েই বাঁচতে হবে । যুদ্ধটা ফিল্মে কাজ করা না-করার নয়, যুদ্ধটা বেঁচে থাকার । কাজের মর্যাদা না থাকলে তার সঙ্গে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন জুড়ে দেয়া ঠিক নয় । তাতে কষ্ট শুধু বাড়বে । বুঝতে পারছি, হঠাৎ একেবারে অচেনা রাস্তায় চলতে বললে মাহুঘ ইতস্তত করে, সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় । তুই ভেবে দেখতে সময় নে, কিন্তু

দিন সাভের বেশি না। ঘর ছুটো হাতছাড়া হয়ে গেলে ঘর পাওয়া শক্ত হবে। মনে রাখিস, তোর চেনা রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন রাস্তা তোকে ধরতেই হবে। মোহ রাখিস না। এ সমাজে এসব সেক্টিমেন্ট মোহ ছাড়া কিছু নয়। ভুই ভেবে দেখে।

জগদীশদা কাঁধের বোলায় বিনোদন-বার্তাটা রেখে উঠে দাঁড়াল। মা'র পান্নে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল—মাগিমা, নিলুকে আমিই এ কাজে এনেছিলাম। তখন ওর যা হোক একটা কাজের দরকার ছিল। এখন আবার ওরই ভালোর জন্য একেবারে নতুন পথে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আপনি ওকে সাহস দেবেন। সাহস দেবার ক্ষমতা আপনার আছে। আমি বুঝেছি। চলি যে নিনা।

জগদীশদা চলে যেতে নিলয়ের মনে হল ছুটো জরুরী বিষয় জগদীশদাকে তার জিজ্ঞেস করার ছিল। কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে মনেও পড়েনি। আজ সকালের ডাকে ত্রতীন গুরুকায়স্থর একটা চিঠি এসেছে। উনি তাকে দেখা করতে লিখেছেন। হঠাৎ তাকে ওঁর কি দরকার পড়ল? জগদীশদা আন্দাজ দিতে পারত। ডি. কে. বাসুর ব্যাপারেও হয়তো জানা যেত। যাকগে, পরে কথা বলে নেয়া যাবে। আপাতত সবচেয়ে বড় সমস্যা জগদীশদার প্রস্তাব। বড্ড বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে না কি?

১৪

বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে ছেলেটির। তাজা সতেজ চেহারা। পরনে পাঞ্জামা-পাঞ্জাবি। হাতে একটা বড় ডায়েরি, কয়েকখানা পত্র-পত্রিকা। দরজার বাইরে ছেলেটি।

আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে নিলয় বলল—কাকে চাই?

—আপনিই তো নিলয় মজুমদার?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমার নাম তরুণ লাহিড়ী। একটা ফিল্ম-ম্যাগাজিন ~~ফিল্ম~~—আমাদের চলচ্চিত্র দেখেছেন কিনা জানি না। কমান্ডার্স কাগজ নয়। সিনেমাটোকে আমরা সিনিয়ালি বুঝতে চাই। আমরা মনে করি এটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল মিডিয়াম। সিনিয়াল প্রবন্ধ আলোচনা রিভিউ আমরা ছাপি। আমাদের কাগজের বিক্রি কম, কিন্তু একটা বিশেষ সার্কেলে কদর আছে। আপনার সঙ্গে দরকার ছিল।

—আমার সঙ্গে দরকার ? নিলয় সন্দেহের স্বরে বলল।

ছেলেটি হাসিমুখে বলল—সাংবাদিকদের বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে শক্ত। তবু কেটু আলাপ করা ষাক না।

ছেলেটির সহজ আন্তরিক ভঙ্গি নিলয়কে সরাসরি আপত্তি করতে দিল না। ইতস্তত করে বলল—আঁসুন।

—আমাদের পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা আপনার জন্ত নিয়ে এসেছি, ছেলেটি চোকিতে বসে বলল, পড়ে দেখবেন। মতামত দেবেন।

—আমার মতামতের কি দাম আছে ? পত্রিকা নিয়ে দেখতে দেখতে নিলয় বলল।

—আপনারা, যারা ছবি তৈরির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছেন, তাঁদের মতামতের দাম নেই ? ছেলেটি উজ্জ্বল চোখে তাকাল নিলয়ের দিকে, আমার মনে হয় সত্যিকারের দামী মতামত অ-নামী লোকের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। নামী লোকের মতামত পাবলিসিটি মিডিয়াগুলি খুব ফোকাস করে। আমার কিন্তু ভীষণ হাসি পায়, বেশির ভাগই ছেঁদো কথাই বাঙালি। দেখবেন আপনি লক্ষ্য করে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রথম খবর হয়ে হয়তো বেকুল—অমুক বলেছেন, ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রা দারিদ্র্য। আহা, কি আবিষ্কার !

তরুণ লাহিড়ীকে নিলয়ের ভালো লাগছে। জড়তা নেই, ডান নেই। কথা বলার সময় গুর চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ও সারল্য একই সঙ্গে খেলা করে।

নিলয় হেসে বলল—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কি কাজ হবে ?

—মস্ত বড় একটা কাজ হবে বলেই আশা করছি। সাধারণভাবেই সাংবাদিকতার চরিত্র বহুদিন হল নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্ন-ম্যাগাজিনগুলোর ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি দেখা যাচ্ছে। চালু কিন্ন-ম্যাগাজিন মানেই নোংরামির ফ্লাও কারবার। ইয়ং জেনারেশনকে অধঃপাতে পাঠাবার কাজটা এরা বেশ প্রান্ড, ভাবে করে যাচ্ছে। এর পেছনে স্পষ্ট রাজনীতি আছে। পয়সা কামানোই একমাত্র লক্ষ্য নয়। অগ্রায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সক্ষম প্রতিবাদ জানাতে পারে তরুণ সমাজ। তাদের গোন্ধায় দিতে পারলে সমাজের সুবিধাভোগী অংশটা নিজেদের অনেক নিরাপদ ভাবে পারে। এরাই চালায় বিনোদন-বার্তার মতো কাগজ। সমস্ত নিউজ আর আমিউজমেন্ট মিডিয়াগুলোকে এরা ভেবে-চিন্তে পলিউট করেছে। এদের হাতেই

দেশের শিল্প-বাণিজ্য, সাদা-কালো টাকার পাহাড়, কাজেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশকে কিনে নিয়ে কারবারটা ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। যাক, বক্তৃতায় দিয়ে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। এসব নিশ্চয়ই আপনি জানেন। আপনার সঙ্গে আমার দরকারটা বলি। আমাদের পত্রিকা শুধু পত্রিকা নয়, আন্দোলনের হাতিয়ার। বিনোদন-বার্তারা যা করতে চায়, আমরা করতে চাই তার বিপরীত কাজটা। আচ্ছা নিলয়বাবু, বিনোদন-বার্তায় আপনার সম্পর্কে যা বেরিয়েছে আপনি তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে চান? আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন?

—করবার কি আছে? কি করতে পারি আমি?

—তা ঠিক, এদের বিরুদ্ধে একসার ক্ষমতায় লড়তে আপনি পারবেন না। কিন্তু আমরা যদি এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসি আপনি আমাদের সাহায্য করতে রাজী আছেন কি? ভেবে দেখুন, যদি মনে করেন আপনার ক্ষতি হতে পারে, তাহলে কখনোই আমি আপনাকে বলব না আমাদের প্রস্তাবে রাজী হতে।

—লিনেমায় আমার ক্যারিয়ারের ইতি হয়ে গেছে...আপনারা কি করতে চান বলুন।

—আমরা এই ব্রুথেল-মাগাজিনগুলোর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে চাই। ওরা বেশব নোংরা জিনিস ছাপে সেগুলো নিয়ে সমালোচনা করা যায়, ইস্যু হিসেবে নিয়ে আন্দোলন করা যায় না। কিন্তু শুধু একটা সেনসেশনাল নিউজ তৈরি করে পয়সা লোটবার জন্তু ওরা আপনাকে ভিকটিমাইজ করেছে! এই ইস্যুতে অনেকদূর এগনো চলে। বিনোদন-বার্তার মতো কাগজগুলোকে শিক্ষা দেবার এই একটা সুযোগ। আমরা এটাকে ইস্যু করতে চাই।

—কিভাবে এগোতে চান?

—একজন সংস্কারক কর্মী মানুষকে অকারণে স্ফাণ্ডলাইজ করার বিরুদ্ধে আমরা সম্পাদকীয় লিখেছি। সেটা ছাপবে। আপনার একটা জোরালো বক্তব্যও ছাপা হবে। কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, যারা বাস্টার্ডগুলোর কাছে মাথা বিক্রি করেননি, তাঁদের বক্তব্যও থাকবে। আমরা সহযোগী সংগঠনগুলিকে জড়ো করে প্রতিবাদ-সভা করব। ফাণ্ড তুলে আপনাকে দিয়ে মামলা করা হবে। মামলা আর আন্দোলন চলবে পাশাপাশি। আমরা মনে করছি একটা ধাক্কা ওদের দেয়া যাবে।

—অর্থাৎ আমাকে নিয়ে রাজনীতি করবেন? নিলয়ের মুখে কোঁড়কের হাসি।
তরুণ অদম্য। বলল—নিশ্চয়ই। রাজনীতিকে ঠেঁকাতে হবে রাজনীতি দিয়েই।

হিতোপদেশের দিন শেষ হয়ে গেছে। আপনার ভালো কতদূর হবে জানি না, কতি
যা হবার তা হুয়েই গেছে। তবে ইস্তাটাকে আমরা যেভাবে নিতে চাই তাতে কিছু
লোকের অন্তত চোখ ফুটবে। সেটাই লাভ। আপনার, আমার, সকলের।

নিলয় একটু ভাবল। তরুণ উদ্দেশ্য গোপন করেনি, নিলয়ের ভালো করার
প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ছেলেটা সৎ, সন্দেহ নেই। নিলয় মনের গোপনে জানে, পুরনো
কাজ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ফিল্মের জগতেই কাজ করার অল্প কোনো সুযোগ
এসে যাবে এ ধরনের অস্পষ্ট আশা মনের মধ্যে কাজ করছে। নইলে জগদীশদার
প্রস্থাবে সঙ্গে সঙ্গে তার রাজী হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

—আমি কি বিবৃতি দেব, নিলয় পাশ কাটাতে চাইল, বলা-লেখা কোনোটাই
আমার আসে না।

—আমি বলে যাব, আপনি লিখে সই করে দেবেন। কোথাও তুল বা
আপাত্ত্বজনক মনে হলে আলোচনা করে ঠিকঠাক করে নেয়া যাবে।

—আমি বলি কি, নিলয় আমতা আমতা করে বলল, বিবৃতিটা এখন থাক।

নিলয়ের চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হাসল তরুণ—সবাসরি জড়াতে চাইছেন
না ?

—হ্যাঁ। বিনোদন-বার্তার সঙ্গে ইনডাস্ট্রির বোঝাপড়া কোথায় এবং কতদূর তা
আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন। ইনডাস্ট্রির কর্তাদের ওরা ইনফ্লুয়েন্স করতে
পারে। তাই আমার জড়িয়ে পড়া বোকামি। সম্পাদকীয়তে আপনাদের যা বলবার
বলতে পারেন, বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যও ছাপতে পারেন। মামলা আপাতত থাক,
-প্রতিবাদ-সভার ব্যাপারটাও পরে ভাববেন।

—যা যা বন্ধ রাখতে বলছেন সেগুলোই যে আসল। সম্পাদকীয় আর বুদ্ধিজীবীদের
বক্তব্য ছেপে আমরা যে কাজটা করতে চাইছি তা করা যাবে না। মামলা হলে
শমস্ত কাগজে তার কভারেজ থাকবে, কারণ লোকে মুখিয়ে থাকবে মামলার খবরের
জ্ঞ। প্রতিবাদ-সভায়ও ভালো কভারেজ পাওয়া যাবে। এ ছুটো কাজ আপনাকে বাদ
দিয়ে হতে পারে না। মামলা করবেন আপনি, ফাণ্ড তুলে দেব আমরা। আপনার
জ্ঞ প্রতিবাদ-সভা, আপনি অল্পপস্থিত, তা কি হয়। আপনার আপত্তি কোথায়
বুঝতে পারছি না। আপনার ব্যক্তিগত লাভের জ্ঞ আমরা কিছু করছি না, কিন্তু
আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতিরও কোনো কারণ নেই। বলুন, আছে ?

—আমি আপনাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, নিলয় বলল, কিন্তু

খোলাখুলি আপনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেমে পড়লে দরজাটা যাতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় সে ব্যবস্থা ওরা করবে।

—করবে। তাতে আপনার কি হল? সব রাত্তাই আপনার বন্ধ হয়ে গেছে। ধরুন, মামলা করলেও, আপনি নিশ্চিত থাকুন, জিততে পারবেন না। ক্ষতিপূরণ পাবেন? না। বোকার মতো আশা করে লাভ নেই। আমরা যা ভেবেছি সমস্তটাই লোকের সামনে ওদের চরিত্র অন্তত খানিকটা মেলে ধরবার একটা প্রসেস। আপনি যদি মনে করেন এতে আপনার বিপদ আছে, আমরা আপনাকে বাধা করতে পারি না। তরুণের চোখ তীক্ষ্ণ হল।

তরুণের স্পষ্টভার সামনে নিলয় বিব্রত অসহায় বোধ করতে লাগল। তরুণ ভালো কাজই করতে চায়। হয়তো ওদের চেষ্টায় ফলও মিলবে—হাতে হাতে প্রাপ্তি নয়, অনেক বড় প্রাপ্তির মুখ চেয়ে মাহুষকে সচেতন করার প্রয়াস। নিলয় বোঝে না তা নয়। তবু—

নিলয় তরুণকে বোঝাতে সচেষ্ট হল—আমি সবই জানি তরুণবাবু। কিন্তু মাহুষ ডোববার সময় কুটোগাছটাও আঁকড়ে ধরতে চায়। আমি খুঁচিয়ে যা করতে চাই না।

—আপনার ধোঁচানোর দরকার নেই। গ্যাংগ্রিন এমনিতেই শুরু হয়ে গেছে কেটে বাদ দিলে তারপর হয়তো ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে পারবেন। ওষুধের ভরসা থাকলে প্রাণটাও যাবে। তরুণের হাসিটা বিজ্ঞপেও করুণ।

—মাহুষের মন থেকে দয়ামায়ী উবে গেছে বলছেন?

—কোন মাহুষের কথা বলছেন? ব্যক্তি-মাহুষ? না, পচা-গলা একটা সিলটেডে মধ্যে টাকা তৈরির যন্ত্রে পরিণত হওয়া মাহুষ? তরুণ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

নিলয় না-বোঝার দৃষ্টি চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর বলল—তবু...

—ধন্য আশা কুহকিনী, তরুণ হেসে ফেলল, ঠিক আছে, আপনাকে আড়া দেবেই আপাতত আমরা যা করবার করব। তারপর যখন বন্ধ দরজার কড়া নাড়লে নাড়তে হাত বাধা হয়ে যাবে, দরকার মনে হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তখন আপনাকে নিয়ে আমি কিঞ্চিং রাজনীতি করব। আপনাকে কিছু পাইলে দেবার আশা দিতে আজও আসিনি, সেদিনও আসব না। সাদা বাংলার বলি আপনাকে আমরা ব্যবহার করব বৃহত্তর স্বার্থে। আপনার জন্ত দরজা খোঁ থাকবে।

তরুণের ভক্তি দেখে বোঝা গেল সে ওঠার জন্ত তৈরি ।

নিলয় মুখে হাসি টেনে বলল—এক মিনিট তরুণবাবু, আমার একটা জিনিস জানতে খুব ইচ্ছে করছে ।

—বলুন ।

—আমার সঙ্গে আপনি যেমন সহজভাবে আলাপ করলেন, অরুণকুমারের সঙ্গে কি তা পারবেন ?

—আমি যদি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি, আপনি আমার সঙ্গে যে রকম সহজ হতে পারছেন অরুণকুমার কি তা পারবে ?

—কথার প্যাচে আপনি ওস্তাদ ।

—হতে পারি । তবে মিথ্যে বলিনি । আমরা ছু'জনেই অংশত হলেও ব্যক্তি-মাত্রা । অরুণকুমার যজ্ঞ-মানব—বিশেষ গিলটেমের বিশেষ প্রোডাক্ট । ওর সঙ্গে শব্দের বিনিময় হতে পারে, ব্যাপোর্ট হতে পারে না ।

—কি যে বলেন বুঝি না, নিলয় আত্ম-সমর্পণ করল, অরুণকুমার যজ্ঞ-মানব হলে আমি কি ? আমি তো ওঁর ডামি ।

—গোলমাল ঠিক ঐ জায়গাটায়—আপনার মানসিকতায় । ডামির কাজ আপনার প্রফেশন, ওটাকে আপনার মানসিকতা হতে দেবেন না । ধ্বংসবাদ । চলি তবে আজ ।

—তাড়া না থাকলে বহ্নন না পাঁচ-দশ মিনিট, চা খেয়ে যান ।

—তাড়া ? বিদ্যুৎ না । বরং আপনি না বললে বেরিয়েই চায়ের দোকান খুঁজতে হত ।

নিলয়ের মনটা হঠাৎ আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল ।

১৫

রাস্তায় বিশেষ বেয়োয় না নিলয় । পথ চলতে অদ্ভুত একটা অহুভূতি হয় । মনে হয় চারপাশের মানুষজনের দৃষ্টি তার ওপর । ওদের চোখে যেন ঘৃণা, অবিশ্বাস, বিস্ময় । সত্যিই কি তা-ই ? নিলয় চোরা চোখে তাকিয়ে কোনো কোনো মুখের নীরব ভাষা চোখের ইঙ্গিত পড়তে চেষ্টা করার মতো সাহসী হয়ে ওঠে মুহূর্তেক ।

নির্বিকার দেখায় মুখগুলো । নিজেকে প্রশ্ন করে নিলয় । সবটাই কি তার

কল্পনা? বিশাল শহরের অন্তর্নতি মানুষের ক'জন বিনোদন-বার্তার ধবর রাখে? বেঁচে-থাকার ঝগাটে মানুষ জেরবার। বেশির ভাগের ইচ্ছা-আগ্রহ-কৌতুহলে বিনোদন-বার্তার কেছা নিশ্চয়ই ভাগ বসাতে পারে না। বিনোদন-বার্তা লক্ষ কপি বিক্রি হলেও কয়েক কোটির তুলনায় সংখ্যাটা নিশ্চয়ই হিসেবে আনার মতো নয়। যারা পড়ে তারাও বিনোদিত হয়, মাথা ঘামায় না। চাল ডাল কেবোদিন কজি-রোজগার মানুষের আসল সমস্যা, সেখানে তার আগ্রহ আন্তরিক ও গভীর। বিনোদন-বার্তাও তারা সমাজের শরীরটাকে কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে সে অল্পসন্ধানের সময় বা বুদ্ধি তাদের নেই। প্রবল যুক্তির অন্তরালেও কিন্তু প্রবলতর অর্থোক্তিক অল্পভুক্তিটা কাজ করে চলে।

তবে সরকারী আবাসনে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় বই কি। কারণ, এজমালি বাড়ি আর জল-কল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে যৌথ দায়িত্বের ফলে চেনাশোনা মেলামেশা অনেক বেশি। শহরের পাড়ার বাসিন্দাদের মতো ইচ্ছা হলে নিজেই অপরিচিত রাখা এখানে সম্ভব নয়। নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষকে মেলামেশা করতে হয়।

পরিচয়ের স্ববাদে আবাসন এলাকার মধ্যে কারো কারো কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর নিলয়কে দিতে হয়েছে। এদের এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সত্য-মিথ্যার মিশেল দেয়া কাহিনী নিলয় এদের উপহার দেয়। তবে কাহিনীটা যাতে সর্বত্র একই হয় এবং অসঙ্গতি না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। কারণ ভদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা তাদের শিক্ষাদীক্ষার ঐতিহ্য বজায় রেখে সামনে সর্বদাই সদাশয় উদার সুবিবেচক। অন্তরালে নিজেই ও নিজের পরিবারভুক্ত ক'জনকে বাদ দিয়ে যে কোনো মানুষের সহস্র সহস্র ছিদ্র এরা মুহূর্তে আবিষ্কার করতে পারে এবং নিজের যে প্রকৃতি-প্রদত্ত নবদ্বারের অতিরিক্ত কোনো ছিদ্র নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ট্রামে-বাসে, অফিস-কাছারিতে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এদের সম্পর্কে নিলয়ের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত, সে কারণে সামনে মিষ্টতা বজায় রাখতেই হয়। তবু এরা চেনা মানুষ। নিলয়ের ভদ্র স্বস্বস্তি আবাসন এলাকার বাইরে অচেনা মানুষজনের মধ্যেই বেশি। বাইরে বেরুতে সে আজকাল মাথায় রাখে সাদা খেলোয়াড়ী টুপি, চোখে গগলস্। নিজেই গোপন রাখার আসল উদ্দেশ্যটাকে আড়াল রাখতে তৈরি আছে প্রচণ্ড গরমের অজুহাত।

নিনাকে অবশ্য অজুহাত দেখানোর দরকার হয় না। ও নিজেই নিলয়কে যাতে

বাড়ি থেকে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া বাইরে বেরতে না হয় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বাজার দোকান ডাক্তার নিনাই দেখেছে। বলেছে—তুমি কিছুদিন বাড়ি থেকে বেশি বেরবে না। নেহাত যেখানে তোমার না গেলে নয় সেখানে যাবে।

—ভয় পাচ্ছ ? লোকে আমাকে ধরে শেটাবে ? নিলয় হেলছে।

—না, ভয় পাচ্ছি না। তবে রাস্তাঘাটে তোমাকে বিরক্ত করার লোকেরও অভাব হবে না। আমাকেই এখানকার মেয়ে-বৌরা নানান প্রশ্ন করছে। নিনা বলেছে :

—তুমি কি উত্তর দিচ্ছ ?

—যাকে যেমন উত্তর দিলে খুশি করা যায়।

—তার মানে ?

—মানে আবার কি। ঘটনা তো একটাই। সেটাই যাকে যেমন করে বললে খুশি হয়। কেউ ভক্তিমতী বৌমার ভক্তি পছন্দ করে, কারো ভালো লাগে ছেনাল বৌদি, কেউ আবার খুব প্রাইভেট করে বলার ভাব দেখালে খুশি হয়। এই আবার কি :

নিনার কথাগুলো মনে পড়তে নিলয়ের মনটা একটু হালকা লাগল।

নিনা বাজারে গেছে। যাচ্ছে কদিন ধরেই। নিলয়ের বাজারে যাওয়া তো চলবেই না, কারণ বাজারেই বেশি লোকের সঙ্গে দেখা হবে। এটাই নিনার যুক্তি।

মা রাস্তাঘরে টুকটাক কাজ করছেন। মাকে কড়া শাসনে রেখেছে নিনা। তিনি কতটুকু কাজ করতে পারেন তা ও বেঁবে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে তার বেশি করলে হলখুল কাণ্ড হবে। মা হাসিমুখে বৌমার শাসন মেনে নিয়েছেন।

বাবুসোনা এসে বাবার পাজামা খামচে ধরল :—এই বাবা, আয়।

—কেন ? নিলয় বাবুসোনার খুতনি নেড়ে দিল।

—আয় না।

—এই ব্যাটা, বাবাকে কেউ ভুই-তোকারি করে ছোটলোকের মতো ?...কোথেকে শিখলি রে ? তা, নষ্ট ভক্তলোক হওয়ার চাইতে নির্ভেজাল ছোটলোক হওয়া ভালো, কি বলিস ? বাবুসোনাকে কোলে তুলে নিলয় বলল।

—এই বাবা, আয় না। বাবুসোনা তার নিজস্ব সমস্তার সমাধানে অবিচল।

—চল, ছাড়বি না এখন। বাবুসোনাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল নিলয়।

ছেলে বাবার হাত ধরে নিয়ে চলল।

—বাবা, জুজু...। বাবুলোনা কচি হাত তুলে ঘরের কোনায় দেখাল।

উইয়ের বাসা। সব আঁকাবাঁকা রেখায় এগিয়ে চলেছে। অবাক কাণ্ড। বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে মাত্র সাত বছর আগে। এরই মধ্যে মাটির আশ্রয় থেকে দেয়াল কুরে কুরে তিনতলা পর্যন্ত চলে এসেছে। অথচ বাড়ি তৈরির সময় নাকি ভিতে উই ঠেকানোর মালমশলা দেয়া হয়ে থাকে। তাহলে কি উই ঠেকানোর কথাটা ভাঙত? অথবা উই ঠেকানোর পদ্ধতিটাই আমাদের ভুল? ইঞ্চি কয়েক লম্বা একটামাত্র বাসা। নিলয় বাসার নিচে বা হাতের তালু পেতে ডান হাতের আঙুলের টোকায় বাসাটা ভেঙে দিল। হাতের তালুতে ধুলোর মধ্যে কিলবিল করতে লাগল সাদা সাদা উইগুলো।

—জুজু...আলে বাবা...। বাবুলোনা দু'হাত তুলে এক পা পিছিয়ে গেল।

নিলয় উইগুলোকে লক্ষ্য করছে। আড়াল পেলে নিঃশব্দে কাজ সারতে ওরা ওস্তাদ, তাই কুরে কুরে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আড়ালটাও তৈরি করে নেয়। খোলা আলোয় বাতাসে ওদের ভয়, অস্থিরতা। নিলয়ের হাতের তালুতে ওরা ছটকট করছে, চেপ্টা করছে পালাতে, পারছে না, নিলয় হাতের তালু বায়বার কঁচকে ওদের এপাশ-ওপাশ সরে যাওয়া আটকাচ্ছে।

তারপর নিলয়, আশ্তে আশ্তে, বিচক্ষণ খুনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সমাধা করার মতো, ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নির্বিকারভাবে ধুলো সমেত উইগুলোকে ঠেঁনি ডলার মতো ডলতে ডলতে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। ওর স্থির দৃষ্টি তখন সাদা দেয়ালে একটা সূক্ষ্ম ফুটোর ওপর, যেখান দিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। দেয়ালের পেছনে ওদের অবাধ বিচিত্র সাম্রাজ্য কতদূর চলে গেছে কে জানে। হয়তো সমস্ত বাড়িটাকে নিয়েই চলছে ওদের কুরে কুরে খাওয়ার ষড়যন্ত্র। অদৃশ্য জালের মতো ওরা ঘিরে কেলেছে বাড়িটাকে।

নিলয়ের হাত দুটো ঘরের স্বয়ংক্রিয়তায় কাজ করে চলেছে।

—নিলু, কি হয়েছে রে ওখানে?

—আঁ!।

মায়ের ডাকে নিলয় ঘুরে তাকাল।

—কি হয়েছে ওখানে? মা প্রস্তুতির পুনরাবৃত্তি করলেন।

—কিছু না। উই।

—ও। মা উই নামক সবল সত্যকে আমল না দিয়ে বললেন, উই আর দেখবার কি

আছে। ভূতের মতো কি দেখছিলি? চা খাবি?

—না। তোমার বোমা কিরলে আমি একবার বেরুব। নিলয় বলল।

—এসো দাদুভাই, তোমাকে দুধ পাইয়ে দি।

ঠান্নার ডাকে বাবুসোনা সহজেই সাড়া দিল, সচরাচর যা ও করে না, কারণ তখন আগ্রহ ওর কম।

এক হাতে বাজারের থলে আরেক হাতে এক তাড়া চিঠি নিয়ে বাড়ি কিরল নিনা।

—এত চিঠি কিসের? নিলয় জিজ্ঞেস করল।

বাজারের থলে নামিয়ে রেখে নিলয়ের হাতে চিঠিগুলো দিয়ে নিনা বলল— তোমারই চিঠি। বিনোদন-বার্তা থেকে বি-ডাইরেক্টে করা।

—মা, মা, কি করছেন আপনি? নিনা ঠাক দিল।

—দাদুভাইকে দুধ খাইয়ে দিচ্ছি। মা বললেন রান্নাঘর থেকে।

—ঠিক আছে।

নিলয় আড়চোখে তাকিয়ে দুষ্টমি করার ইচ্ছায় বলল—কাল থেকে আমি বাজারে যাব।

—কেন, খরচ বেশি করে কেলছি?

—এ যে দেখছি উলটো চাপ। পরচ আমি দেখি কখনো? নিলয় হাসল।

—তবে?

—তোমার ওপর চাপ বড় বেশি হয়ে থাকে।

—দয়া করে আমার জেতে অত চিন্তা করো না। সহবে না। তারপর গলা নামিয়ে বলল নিনা, আর কটা দিন থাক। তোমার তো আজ বেরুনো আছে। কিছু করে দিচ্ছি, খেয়ে বেরবে।

কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল নিনা।

চিঠিগুলো দেখতে লাগল নিলয়। বিনোদন-বার্তায় তুরূপ সেনের কালোয়াতি বেরুনোর পর অরুণকুমারের ক্যানদের প্রতিক্রিয়া। বহু মাসের মগজে অরুণকুমারের বাণিজ্য কত গভীর তার পরিচয় রয়েছে চিঠিগুলিতে। নানান বয়সের, বিভিন্ন স্তরের, আপাত-শিকায় আকাশ-পাতাল প্রভেদের মানুষ সব।

একজন লিখেছে—‘অরুণকুমার মরিয়া গেলে আমি আত্মহত্যা করিব। কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না! তোকে আমি ঘেমা করি।’ মহিলায় চিঠি। বয়স অল্পমান

কবার উপায় নেই, ভাবায় শিক্ষার বহর পরিষ্কার। ধারা পরিচ্ছন্ন বা চোস্ত ইংরিজিতে নিজেদের শিক্ষার পরিচয় রেখেছে চিঠিতে তাদেরও চিঠির মর্মকথা অশিক্ষিতা মহিলাটির থেকে আলাদা নয়। ‘আমার স্বপ্নের নায়কের জীবনে কোনো অঘটন ঘটে গেলে আপনাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই অরুণকুমারকে আমি ভালোবাসি। এ প্রেম মাটির পৃথিবীর ক্ষণিক মোহের ফুল নয়, স্বর্গের অক্ষয় পারিজাত। রূপালী পর্দার বাইরে আমি তাঁকে দেখিনি, দেখার বাসনাও নেই, আমার মনের পর্দা জুড়ে রয়েছে তাঁর নির্মল স্তম্ভের মুখখানা।’ ইংরিজি উদ্ধৃতি দিয়েছে একজন—‘স্মিং অ্যাণ্ডয়ে অ্যাশ্বিশন, বাই দ্যাট সিন ফেল দি আনভেলস্।’ মর্ম মাথায় ঢোকেনি নিলয়ের। পরে সাদামাটা ইংরিজিতে গালাগাল, সেগুলো বোঝা গেছে। ‘একটি অ-স্বাক্ষরিত চিঠি শুধু ব্যতিক্রম। ‘আরেকটু বেশি শক্তি কি আপনি ঘুঘিটার জন্তু বায়্য করতে পারতেন না?’ একটাই মাত্র বাক্য। গতানুগতিক স্তরে কথা বলেনি পত্রলেখক বা লেখিকা। তবে কি যে বলতে চেয়েছে তাও নিলয়ের বুদ্ধির অগম্য।

চিঠিগুলো গুছিয়ে একটা গার্টার দিয়ে জড়িয়ে রাখল নিলয়।

খবরের কাগজটা দেখা হয়নি। তুলে নিল। প্রথম পৃষ্ঠার নিচের দিকে একটি খবর। অরুণকুমার বাড়ি ফিরছেন। অরুণকুমার দু’একদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন। চিকিৎসকরা মনে করছেন তাঁর আর নাসিং হোমে থাকার দরকার নেই। তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হয়েছেন, তবে কতদিনে কর্মক্ষম হয়ে উঠবেন তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

তাকে চিকিৎসার জন্তু বিদেশে পাঠানোর প্রয়োজন আছে বলে চিকিৎসকরা মনে করছেন না। অবশ্য আমেরিকার দুই বিশেষজ্ঞ ডক্টর লিও টন্ন ও ডক্টর টনি টাকনোর সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন।

অরুণকুমারের বাড়ি ফেরার সংবাদ ঘনিষ্ঠ মহলে প্রচারিত হবার পর থেকেই শুভেচ্ছা জানাতে বহু লোক আসছেন নাসিং হোমে। তাঁদের সবাইকে অরুণকুমারের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। অরুণকুমারের সেক্রেটারির কাছে ফুল ও শুভেচ্ছা-বার্তা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন স্নেনকে।

খবরের কাগজে আর এগনো সম্ভব হল না নিলয়ের। মাথায় চিন্তার জিড়।

ব্রতীন পুরকায়স্থ এ পর্যন্ত ছ'খানা ছবি করেছে। কুড়ি বছরে মাত্র ছ'খানা ছবি পরিচালকের সাকল্যের প্রমাণ নয়। ব্রতীন পুরকায়স্থর ছবিতে টাকা ঢালতে প্রযোজকের আগ্রহ কম, কারণ তার ছবি স্বদেশের বাজারে খেদের পায় না, যদিও বিদেশী সমালোচকদের চোখে নাকি তার কোনো কোনো কাজ অসাধারণ ঠেকেছে। ব্রতীনবাবুর এতে মন ভরলেও প্রযোজকের পকেট ভরে না। তারা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। কলে ব্রতীনবাবু শাস্ত্রিককালের একজন অত্যন্ত রাগী পরিচালক। ফিল্ম পাণ্ডিত্য নাকি তার অসাধারণ। কিন্তু মাহুশ যদি সে পাণ্ডিত্যের নাগাল না পায় তাহলে দোষটা কার তা নিয়ে গবেষণা চালানো যেতে পারে, মাহুশকে ছবি দেখতে বাধা করা চলে না।

ব্রতীনবাবুর কয়েকখানা ছবি নিলয় দেখেছে। তার ছবিতে মাহুশের সুখ-দুঃখ, সমস্যা, ইঙ্গিত অতীব সুন্দর। সুন্দরতা অতি উচ্চ পর্যায়ের হলে অনেকসময় তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা বেশির ভাগ মাহুশের পক্ষে সম্ভব হয় না। ব্রতীনবাবুর সৃষ্ট চরিত্রের সুখ-দুঃখ আবেগ এ দেশের গোলা-বুদ্ধি সাধারণ দর্শকের অচেনা। তারা নিজেদের সুখ-দুঃখ বেমনটি চেনে সিনেমায় তেমনটি দেখতে পেলে খুশি হয়। হিন্দি ছবির বয়স্ক রূপকথার অটেল আমোদে মজে যেতেও তাদের আগ্রহেব অন্ত নেই। ব্রতীনবাবুর বিচরণের ক্ষেত্র এ দুয়ের একটিও নয়। ব্রতীনবাবু হালকা আমোদের ছবি করে না। তার ছবি সিরিয়াস, অতিশয় জটিল মনস্তাত্ত্বিক বয়স্কাই তার বেশির ভাগ ছবির বিষয়, যে বয়স্কার ঠিকানা ডাল-ভাত-রুটির বয়স্কার 'সদগতি'র দেশের মাহুশদের জানা নেই। তারা তাই ব্রতীনবাবুর ছবির বয়স্কার ভাগ নিতেও আগ্রহ দেখায় না। নিজের সামান্য বিদ্রোহবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় নিলয়ের এ রকমই মনে হয়েছে।

ব্রতীনবাবু তার ড্রইংরুম-কাম-লাইব্রেরিতে যত্রতত্র ছড়ানো এবং স্তূপীকৃত পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের মধ্যে বসে আছে। গৃহসজ্জা বা সজ্জাহীনতা লক্ষণীয়। খাটের ওপর নায়েবী ডেক্সো। লেখার সরঞ্জাম। খাটের এখানে-ওখানে টুকরো টুকরো লেখা কাগজ ছোয়াত ছুড়ি অ্যাশ-ট্রে ইত্যাদি দিয়ে চাপা দেয়া আছে।

একটি মহৎ চলচ্চিত্রের অঙ্কন—চিত্রনাট্য তৈরির কাজ চলছে। দিন কয়েক হল

আইডিয়াটা ব্রতীনবাবুর মাথায় এসেছে। এবং আনামাজই কাগজে-কলমে সেটাকে ধরে রাখার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এ গল্পের প্রযোজকের অভাব হবে না। গত তিন বছরে একটা ছবি ফাইনাল করার লোকও ব্রতীনবাবু পায়নি। তাদের বক্তব্য—তার ছবি নেবার মতো যোগ্য দর্শক এদেশে হয়নি। দেশটার হল কি? ছবি না করলেও ব্রতীনবাবুর সংসার অচল হবে না। পৈতৃক সৃত্তে যা পাওয়া গেছে তাতেই ছোট্ট সংসার ভালোভাবে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে টাকায় ছবি তৈরি করবার ঝুঁকি নেয়া যায় না। অথচ ছবি না করেও ব্রতীনবাবুর উপায় নেই। সৃষ্টি! সৃষ্টি! সৃষ্টির যন্ত্রণা! তাই, বাধ্য হয়েই তাকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। না, ছবির বিষয়ে বা ভাষায় কোনো আপস থাকবে না। সংসানে ব্রতীন পুরকায়স্থ হইজ ব্রতীন পুরকায়স্থ। সবাই পুকুরের মাছ। যে ধার নিজেই পুকুরেই ভালো থাকে। কিন্তু প্রযোজক, এবং তারপর দর্শককে টানবার জন্য কৌশলের আশ্রয় নিতেই হবে—মন থেকে পুরোপুরি সায় না মিললেও। প্রতিভা নিয়ে জন্মানোর বড় জালা!

চিত্রনাট্যের একটা জটিল জায়গায় ঠেক খাওয়ার পর চিংপাত হয়ে শুয়ে ব্রতীনবাবু ভাবতে ভাবতে একের পর এক সিগারেট পুড়িয়ে চলছিল।

—এক ভঙ্গলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। নাম বললেন নিলয় মজুমদার। মিসেস পুরকায়স্থ দরজা থেকে বলল।

তড়াক করে উঠে বলল ব্রতীনবাবু—নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। শোন, ছুঁকাপ চা পাঠিয়ে দিও।

—চা হবে না, ছুঁ নেই। ঝি আসেনি। তোমার ছেলেকে বললাম, তার সময় নেই ছুঁ আনবার, আড্ডা মারতে বেঞ্চল। মিসেলের উচ্চারণ যান্ত্রিক, এ ধরনের নাকোর সহযোগী ক্ষোভ উন্মাদ বিরক্তি সম্পূর্ণ অল্পশস্থিত।

—ঠিক আছে, লেবু চা-ই দিও ছুঁকাপ।

মিসেস চলে যেতে মুহূর্ত ভাবল ব্রতীনবাবু, মিসেসের কথা বলার ভক্তিটা যদি কোনো চরিত্রের অভিনয়ে ব্যবহার করা হয় এ দেশের দর্শক তার কি ব্যাখ্যা করবে? ব্রতীনবাবু তার বিবাহিত জীবনের ইতিহাস স্মরণ করতে চেষ্টা করল। মন্দিরা বরাবর এইভাবে কথা বলত না। একসময় গুর স্বভাবেও যথেষ্ট আবেগ উচ্ছলতা ছিল। ও কবে থেকে নিরাবেগ হতে শুরু করল? কেন? জটিল অল্পসন্ধান-প্রক্রিয়া বেশিদূর এগোতে পারল না।

নিলয় ঘরে ঢুকে বলল—নমস্কার।

—বসুন, বসুন। সন্দেহজনক চেহারার একটা চেয়ার দেখিয়ে ত্রতীনবাবু বলল।

শরীরটাকে যথাসম্ভব হালকা করে সাবধানে বসল নিলয়। আন্তে আন্তে চাপ বাড়াল। না, ভেঙে পড়বার ভয় নেই।

একটা তাকিয়া কোলের ওপর রেখে তার ওপর দুই কনুই এবং তনুপরি দুই তালুতে পুতনি রেখে ত্রতীনবাবু বলল—আমার ছবি আপনি দেখেছেন নিলয়বাবু ?

—দেখেছি। কয়েকটা।

—কেমন লেগেছে আপনার ? মোটা চশমার পেছনে ত্রতীনবাবুর চোখ অন্তর্ভেদী।

নিলয় সময় নিয়ে বলল—ভালোই লেগেছে। তবে সব জিনিস বুঝতে পারিনি।

ত্রতীনবাবু হেসে বলল—ছাট্‌স্‌ আন অনেস্ট কনকেশন। দিস প্রজেক্ট টাইম—বর্তমান সময় আমাকে পুরোপুরি বুঝবে না। বিকজ আই থিংক অ্যাহেড অব মাই টাইম। বহু শিল্পী সাহিত্যিক কবিকে তাদের সময় বুঝতে পারেনি। মনে কল্পবেন না যেন আমি নিজেকে জিনিয়াস বলে দাবি করি, ভাবীকাল আমাকে মাথায় তুলে রাখবে না। আন্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি যা অনুভব করি তা আমাকে বলতেই হবে।

নিলয় বুঝে নিয়েছে তার ভূমিকা আপাতত নির্বাক শ্রোতার। এখন চলছে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনার পর্ব পার হয়ে আসল বক্তব্যে না পৌঁছতে তার কিছু বলার থাকতে পারে না। এত বইপত্রের সঙ্গে যার বসবাস তার সামনে শ্রোতা হওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

—এ এক তাজ্জব দেশ মশাই, এ দেশে একবার নাম করে ফেললে আপনি দেবতাদের কাছাকাছি চলে গেলেন, আপনি তখন যা ইচ্ছে তা-ই করেই বাহবা ফুড়োতে পারেন। সত্যজিৎবাবু পরিচালক হিসেবে কত বড় সে বিচারে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু তিনি পৃথিবীজোড়া নাম করেছেন। অতএব তাঁর সবকিছুই করার রাইট আছে। পড়েছেন ওঁর লেখা সায়েন্স ফিকশন ? আইজ্যাক আসিমভ, আর্থার সি ক্লার্ক বা মারে লেইনস্টার যারা পড়েছে তারা সত্যজিৎবাবুর সায়েন্স ফিকশন ছ'পাতা পড়তে পারবে না। ও রকম দেনো লেখা কল্পনা করা যায় না। ছোটদের গল্পে উনি অ্যাংজায়েটি নিউরোসিস, প্যারানোইস্মা, স্কিজোফ্রেনিয়া, এমন কি প্যারা-সাইকোলজি পর্যন্ত ঢোকানছেন। এগুলো ছোটদের গল্পের বিষয় ? যদি বলেন ছোটদের নিয়ে বড়দের জ্ঞান লেখা, তাহলে বলব ছোট-বড় কারো জ্ঞানই গল্প লেখার যোগ্যতা

সত্যজিৎবাবুর নেই। সাহিত্যের ভাষাই ঠর কলমে নেই। অথচ হু হু করে বিক্রি হচ্ছে। একদল কাগজওয়ালা ঠর লেখা নিয়ে নিলক্ষের মতো স্তাবকতা করে যাচ্ছে। বিদেশের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের দেশেও সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য যথেষ্ট আছে, পাঠাগুলোর যদি তাও পড়া থাকত! তাই বলছিলাম, নাম করবার পর এ দেশে আপনি যা ইচ্ছে করে যেতে পারেন। আপনার কি মনে হয় ?

—আমি পড়িনি, নিলয় সভয়ে বলল, পড়লেও ভালো লাগা মন্দ লাগার বেশি বলার মতো বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই।

একটি ছোট মেয়ে খাটের ওপর দু'কাপ চা রেখে দিয়ে চলে গেল।

—নিন, চা খান, ব্রতীনবাবু বলল, আপনাকে জিজ্ঞেস না করেই দিয়ে গেল। আপনি লেবু-চা খান তো ? আমাদের বাড়িতে আবার দুধ চিনি দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস কারো নেই।

অনভ্যস্ত লেবু-চায়ে চুমুক দিয়ে নিলয় বলল—ভালোই তো।

—লেবু দিয়ে চা খাওয়া অভ্যাস করুন। ইট্‌স্‌ গুড। দুধ চিনি দিয়ে চা খাওয়া আর বিষ খাওয়া একই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, যেমন ধরুন আপনাদের অরুণকুমার, ইজ হি অ্যান অ্যাটর্নয় অ্যাট অল ? যে কোনো চরিত্রে দিন, একই অভিনয়। অথচ লাখ লাখ টাকা পিটে নিচ্ছে। আদল জিনিস হচ্ছে এডুকেশন, রীয়ায়াল এডুকেশন, এডুকেশনই নেই তো হবে কি। পাবলিসিটির হাওয়া তুলতে পারলে লোককে যা ইচ্ছে গেলানো যায়। রুচি তৈরি করবার দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না। কমার্শিয়াল ছবির কথা বাদ দিন, আর্ট-ফিল্মের নামে যা তৈরি হচ্ছে তা-ও কি সত্যিকারের আর্ট-ফিল্ম ? সেখানেও দেখবেন রীয়ায়াল মোটিভেশন হচ্ছে বাবসা—কম পয়সায় বাবসা। আইজেনস্টাইন...

আইজেনস্টাইন, চাপলিন, ফেলিনি, গদায়, জুফো, সত্যজিৎ, মুগাল, হু গুল্লোভ, থার্ড ওয়ার্ল্ড সিনেমা ইত্যাদির অর্থে জলে নির্বাক নিলয়কে নাকানিচোবানি খাওয়াতে খাওয়াতে যখন তার কান-মাথা ভেঁ ভেঁ করতে শুরু করেছে তখন হঠাৎ ব্রতীনবাবু অস্ত্র প্রসঙ্গ তুলল—আপনি এখন কি করবেন ভাবছেন ? অরুণকুমার আর কাজে ফিরতে পারবে কিনা সন্দেহ। পারলেও...

বাক্যটা শেষ না করে নিলয়ের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল ব্রতীনবাবু।

নিলয় নিরুত্তর।

সময় নিয়ে আবার শুরু করল ব্রতীনবাবু—একটা আইডিয়া আমাকে হস্ত করছে।

দাক্ষণ কমপ্লিকটেড থিম। একজন ষষ্ঠীয় নায়কের অন্তর্লোকের সমস্ত। সে ভালো ছবিতে সত্যিকারের রক্তমাংসের চরিত্রে অভিনয় করতে চায় অথচ ইনডাস্ট্রি তাকে ছকের বাইরে যেতে দেবে না, কেননা তাতেই টাকা। অভিনেতার পক্ষেও বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, কারণ স্ট্যাটাসের ভূত তার ঘাড় চেপে আছে। একটা ভিলাস সাইকেল। নায়ক অন্তর্দৃষ্টি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। এই সময় হঠাৎ সে পারালিমিসে আক্রান্ত হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটায়। সেরে ওঠার আশা কম। টাকাপয়সার অভাব নেই, সেরে না উঠলেও তার চলবে। মনে রাখবেন, সেরে না উঠলেও চলবে। এটা তার মুক্তি না মৃত্যু? আমি ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু করতে চাই। আমি আপনাকে এই চরিত্রের জন্ত ভেবেছি।

চমকে উঠল নিলয়। এতক্ষণ সে মন দিয়ে গল্পটা শুনছিল। মনে হচ্ছিল গল্পটার মধ্যে বস্তু আছে।

—আমি? এ রকম কঠিন চরিত্রে অভিনয় করব আমি? আমি কখনো অভিনয় করিনি।

—আমি করিয়ে নেব।

—আপনি বরং অল্প কাউকে, যেমন ধরুন প্রবালকুমারকে, নিন না।

—ওটা আমার ভাবনা নিলয়বাবু। আপনি রাজী কিনা বলুন। দেখুন, এই অক্ষর বিকিউজ করার আপনার একটামাত্র কারণ থাকতে পারে। আপনি হয়তো ভাবছেন আমার ছবিতে নায়কের বোল করবার পর অরুণকুমারের ডামি আপনি আর হতে পারবেন না। কিন্তু না করলেও কি আর পারবেন? আমি সব পবরট রাপি নিলয়বাবু। আপনার জীবনে ফিল্মে অভিনয়ের প্রথম ও শেষ স্বেযোগ আমিষ্ট আপনাকে দিচ্ছি। নেয়া না-নেয়া আপনার ইচ্ছে। শব্দগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ভেঙে বলল ত্রতীনবাবু।

নিষ্ঠুর সত্য। বলার ভঙ্গিটা আরো নিষ্ঠুর। ভেতরে ভেতরে তেতে উঠল নিলয়, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল—আপনি বা বললেন তা ঠিক। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমার মনে হচ্ছে আপনিও বাবসা করতে চান। গল্পটা আপনি ছবি করতে যাচ্ছেন এমন সময়ে যখন অরুণকুমার শয্যাশায়ী—আপনার নায়কের মতোই। আমাকে নায়ক করতে চাইছেন অরুণকুমারের সঙ্গে আমার চেহারার মিলের জন্ত। আপনি অরুণকুমারের জনপ্রিয়তাকে এভাবে ব্যবহার করে ছবির কর্মসিঁদ্যাল সাকসেসের দিকটা ভাবছেন। ঠিক কিনা বলুন।

ব্রতীনবাবু অল্প সময় চুপ করে থেকে বলল—এসটার্লিশমেটকে আঘাত করার জন্য যদি আমি এসটার্লিশমেটের কায়দাই ব্যবহার করি তাতে ক্ষতি কি? আপনারও ক্ষতি নেই।

—না, আমার কোনো ক্ষতি নেই। নিলয় আস্তে আস্তে বলল।

—তাহলে আপনি রাজী?

চুপ করে কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে নিলয় বলল—হ্যাঁ, আমি রাজী। আপনি তৈরি হয়ে আমাকে খবর পাঠাবেন। তবে সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট টাকা আমাকে অ্যাডভান্স দিতে হবে।

ফ্রিজ-শটের মতো স্থির ব্রতীনবাবুর মুখে বিস্ময় ও বিরক্তির আশ্চর্য মিশ্র অভিব্যক্তি।

আর নিলয় ভাবছে অক্ষয়কুমারকে যে টাকা দিতে হয় তার শতকরা দু'ভাগের বেশি তাকে দেয়া হবে না। এবং আগাম টাকাটাই তার নিশ্চিত প্রাপ্তি, বাকিটা অনিশ্চিততার গর্ভে। যেহেতু (১) সে অক্ষয়কুমার নয়। (২) পরিচালক ব্রতীন পুরকারের জানে তার ক্ষমতার বহর। যে আদায় করে নিতে অক্ষয় তাকে বেশি দেয়ার মতো মূর্খ সংসারে কমই আছে। বিশেষত ব্রতীনবাবুর মতো তত্ত্বজ্ঞানীরা এ প্রকার সবল তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োগে ভুল কদাচ করে না।

শহরের নতুন সম্পন্ন এলাকা। এখানে শহর অনেক মুক্ত, পথের জ্যামিতি পুরনো শহরের মতো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের মুখ চেয়ে তৈরি ঘিঞ্জি অবৈজ্ঞানিক নয়। চওড়া সমান্তরাল পথ। পথের দু'পাশে স্থপতিকল্পিত গাছের সারি। দুপুরের চড়া রোদের তাপও তেমন গা-জ্বালানো মনে হচ্ছে না। হাওয়ার চলাচলে বাধা নেই।

পথে মানুষজন না থাকার মতোই। মাঝে মাঝে ফাঁকা দাস্তার হ হ ছুটে যাচ্ছে সরকারী-বেসরকারী যানবাহন।

বাসের কনডাক্টর ছেলোটো ভদ্র। নিলয়কে ঠিক জায়গায় নামিয়ে পথের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে।

নিলয় বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে চলেছে। বাড়িগুলি স্বথেষ্ট ব্যবধান রেখে তৈরি। স্কন্দর, খোলামেলা অবশ্রুই। অধিকাংশ বাড়িতেই আধুনিক স্থাপত্য-বিভার নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কোনো কোনোটিতে কল্পনা-পরিকল্পনা ইত্যাদির সঙ্গে প্রচুর

অর্থের মিলনে খুব যে সফল ফলেছে তা বলা চলে না। প্রসাধন কতখানি পৰ্বস্ত সৌন্দৰ্যের সহায়ক সেটা জানাও একটা বিচা, না জানলে রূপ খোলে না, বড় জোৰ অলঙ্কারের আতিশয্যে নিবোধ অহংকার তৃপ্ত হয়। নম্ব মিলিয়ে যে বাড়ির সামনে নিলয় দাঁড়াল তাকে কিন্তু এ অপবাদ দেয়া যায় না। প্রচুর অর্থের সঙ্গে স্তম্ভটির মেলবন্ধন ঘটেছে। বাড়ির নাম তীর্থভূমি, শ্বেতপাথরের ওপর খোদাই-করা অক্ষর মথার্থ শিল্পীর হাতের কাজ। ডি. কে. বাহু রুচিবান মাহু নিঃসন্দেহে।

বাড়িতে লোকজন আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সদর দরজা বন্ধ। বাইরে তালা ঝোলানো নেই, অতএব ভেতর থেকে বন্ধ, অর্থাৎ বাড়িতে লোক আছে। কিন্তু তাদের খবর দেয়া যায় কিভাবে? বাইরে কলিংবেল থাকলেও হত।

নিলয়ের সমস্ত্র সমাধান করতেই যেন একটি মাঝ-বয়সী গোল-পানা ভাবলেশহীন মুখের মাহু দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল—আহ্নন।

লোকটির চেহারা পোশাক-আশাক কাজের লোকের মতো। তাকে নিচ্চয়ই নিলয়কে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্ত মোতায়ন রাখা হয়েছিল।

নিলয় লোকটিকে অহুসরণ করতে লাগল।

তিনতলায় একটি দামী দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো পৰ্বস্ত নিলয় বাড়িতে এই লোকটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাহুষের অস্তিত্ব অহুভব করেনি।

—এখানে দাঁড়ান। বলে লোকটি দরজায় দুটো টোকা দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

সন্তুর্পণে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হল দরজা। একটি সতর্ক মুখ উঁকি দিল।

নিলয় ভালো করে বোঝবার আগেই ‘আহ্নন আহ্নন’ অভ্যর্থনার সঙ্গে বিরাট হলঘরের মধ্যে। পেছনে দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। নিলয় নিজেকে আবিষ্কার করল ছোটখাট একটি স্টুডিও-ক্লোয়ে। এয়ার-কুলায়ের ঠাণ্ডা আমেজ। অনেকগুলি জানলা, কিন্তু সবক’টাই বন্ধ। ঘরের এক কোনায় শোবার ঘরের সেট পড়েছে। আলো ক্যামেরা তৈরি। স্মাটিং শুরু করলেই হয়। বাড়ির ভেতরে এত আয়োজন, অথচ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকতে লাগল নিলয়ের।

ঘরের ভেতরে নিলয় বাদে আর তিনজন মাহুষ। সোফায় বসে নিচু পর্দায় কথা বলছে এক ভদ্রলোক ও একটি মহিলা।

যে ভদ্রলোক নিলয়কে দরজা খুলে দিয়েছিল পাশ থেকে সে বলল—আহ্নন

নিলয়বাবু, এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি। প্রথমে নিজের পরিচয় দেয়া দরকার। আমি ডি. কে. বাসু।

—নমস্কার।

নিলয় বাসুর দিকে তাকাল। ছিপছিপে দাবালো চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা ব্যাকত্রাশ-করা চুল, পরনে টি-শার্ট ট্রাউজার, মোটা মাইনাল পাওয়ারের চশমা পরে চোখ দুটো ছোট দেখাচ্ছে—কিন্তু অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। বয়স্ক বুদ্ধিজীবী মাস্তুলের চেহারা বাসুর।

সোফায় বসে ভদ্রলোক ও মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাসু বলল—নিলয়বাবু, ইনি মিস্টার সান্যাল। আমার প্রোডাকশনের পুরো দায়িত্ব এঁর। আর, আমরা যে ছোট্ট কাজটা করতে যাচ্ছি এ হচ্ছে তার দায়িত্ব।

নমস্কার বিনিময় করতে করতে নিলয় অপরিচিতা মেয়েটির মুখে লক্ষ্য করল সহজলভ্য অন্তরঙ্গতার হাসি। মেয়েটির মুখে লাভণ্যের অভাব, কিন্তু দেহটি স্থগাম। হঠাৎ নিলয়ের মনে একটা প্রশ্ন খচ করে উঠল। মিস্টার সান্যালের পুরো নামটা কি? বিভূ সান্যাল? জগদীশদা কি সেদিন এই ব্যক্তিটির কথাই বলেছিল? সৌজ্ঞেয় খাতিরে প্রশ্নটাকে চেপে রাখল নিলয়।

—বসুন নিলয়বাবু। বাসু বলল।

বলে ঘরের আয়তক প্রান্তে দেয়াল-আলমারির কাছে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল প্লেটে লাডু জাতীয় দুটো মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে। নিলয়ের সামনে ছোট টেবিলে রাখল।

—লিন, খেয়ো লিন। মেয়েটি বলল হেসে।

মেয়েটির অমার্জিত উচ্চারণ বিস্মিত করল নিলয়কে।

—হ্যাঁ, তেতে-পুড়ে এসেছেন, একটু জল মিষ্টি খান, খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। বাসু বলল সোফায় নিলয়ের পাশে বসতে বসতে।

নিরন্তরে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে কামড় দিল নিলয়। অপরিচিত স্বাদ, সামান্য তিতকুটে মিষ্টি, আর ফিকে বুনো গন্ধ। খেতে মন্দ না।

—নিলয়বাবু, আপনাকে এখন দারুণ প্রলোভনের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাই না? সান্যাল বলল।

—হ্যাঁ। তবে প্রলোভনা সাময়িক। নিলয়ের উত্তর সাবধানী।

—আপনি ষাই বলুন নিলয়বাবু, কথাটা তুলে নিল বাসু, আপনিও জানেন,

আমরাও জানি, অরুণকুমারের ডামি হিসেবে আপনার ফিউচার শেষ। অরুণকুমার
স্বস্থ হয়ে উঠলে আপনার কোনো চান্সই নেই। আর যদি সে সেরে না ওঠে তাহলে
হয়তো আপনাকে দিয়ে জোড়া-তাড়া করে কয়েকটা ছবি শেষ করা হবে। কিছু কাজ
আপনি পাবেন। তারপর ?

—প্রব্রমটা যখন আমার, আমাকেই ভাবতে দিন না।

—সিওর, সিওর, সান্যাল বলল, আমরা বিজনেসমান, নিঃস্বার্থভাবে কারো
উপকার আমরা করি না। আমরা আপনাকে একটা ওয়াণ্ডারফুল ওপেনিং দেব। প্রচুর
টাকা—ইজি মানি। আমরাও নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা লাভ করব। সত্যি বলতে কি,
আপনার প্রব্রেম-টব্রেম নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাদের প্রব্রেম নিব্রেমও
আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ইটস্ এ বিজনেস ডিল। বাস্ সাহেব আর ঘাই
হোন দানছত্র খুলে বসার লোক নন। আপনাকে দিয়ে ঠর কাজ হবে বুঝেই উনি
অলরেডি নাট্‌বাবুকে এক হাজার টাকা দিয়েছেন।

—নাট্‌বাবুকে টাকা দিয়েছেন ? কেন ? কক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল নিলয়।

—আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার পারিশ্রমিক বলতে পারেন, দালালিও
বলতে পারেন। সান্যাল কালো-কালো ছোপখরা দাঁত বের করে হাসল।

মেয়েটি এখন নিলয়ের পাশে বসে আছে। এবং দু'জনের ব্যবধান এমন সঙ্গীর্ণ
করে এনেছে যে নিলয় ওর শরীরের নরম স্পর্শ পাচ্ছে। পাচ্ছে পুরনো নারকেল
তেল আর চড়া সেন্টের গন্ধ।

মেয়েটি নিলয়ের হাতে হাত রাখল। নিলয় মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মেয়েটি ভারি
ঠোঁটের নির্লজ্জ হাসি উপহার দিয়ে নিলয়ের আঙুলগুলো পেঁচিয়ে ধরল নিজের
আঙুলে।

ওর অপরিচ্ছন্ন পরিচয় এখন নিলয়ের কাছে স্পষ্ট, তবু নিলয় হাত সরিয়ে নেবার
তাগিদ বোধ করল না। হঠাৎ যেন তার সহনশীলতা অদ্ভুত বেড়ে গেছে, এবং
স্নায়ুগুলো অমুভূতির তীক্ষ্ণতা হারিয়ে প্স্থর নরম আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে।

নিলয় মুখ নিচু করে ভাবতে লাগল। মেয়েটি তার আঙুল নিয়ে খেলা করে
চলেছে। ওর শরীর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে লেপটে আছে নিলয়ের শরীরের সঙ্গে। অথচ
নিলয় উত্তেজনা বা বিরক্তি বোধ করছে না। আশ্চর্য! ও নির্বিকারভাবে ভেবে
চলেছে। কি এমন কাজ যে তার মতো একজন নগণা ব্যক্তির সঙ্গে শুধু যোগাযোগ
করিয়ে দেবার পারিশ্রমিকই এক হাজার টাকা? অবশ্য বহুশ্রুটি অল্প পরেই আর বহুশ্রু

থাকবে না। কিন্তু ধা বলবার ওরই বলুক, নিলয় আগ্রহ দেখাবে না।

—সান্যাল, তোমার কি মনে হয় থি-এক্সই তোলা ধাক? ডিটেলস্‌গুলে ভালো আসবে।

—না বাহু সাহেব, ডাবল এক্সই ভালো হবে। ডিটেলস্‌ কম থাকবে বটে, কিন্তু লংশটে নিলয়বাবুকে ছবছ অরুণকুমারের মতো দেখাবে। সে আমি বুঝে নিয়েছি। ছাট উইল সার্ভ আওয়ার পারপাজ বেটার। অরুণকুমারের অ্যাডভানটেজ থাকলে থি-এক্স এর চেয়ে ডাবল এক্স-এর দাম বেশি পাওয়া যাবে। ফাণ্টস্‌ওলারা কি করছে? স্পেক অফ বডিও গণ পপুলার কোনো আর্টিস্টের মাথা বসিয়ে দিচ্ছে। অর্ডিনারি ফাণ্টস্‌য়ের চেয়ে এর দাম অনেক বেশি। এখানে আমরা ডাবল এক্স করতে পুরো অরুণকুমারকে পাচ্ছি। বুঝুন! নামটাও আমার মাথায় এসে গেছে। অরুণকুমার আগু মিশ্রি। হা: হা:।

—রাইট।

সাংকেতিক শব্দগুলোর অর্থ নিলয়ের জানা নেই। তবে সে বুঝতে পারছে অরুণকুমারের সঙ্গে তার চেহারার মিল এদের কাছেও একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণ্যার নিলয় মুখ তুলল। তাকাল বাহুর মুখের দিকে। চোখে প্রশ্ন।

—আরে, আপনাদের দু'জনে বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি, বাহু হাসল, খুব ভালো, খুব ভালো, আফটার অল ইউ আর পার্টনারস।

—হ্যাঁ, খুব ভাব হয়ে গেছে, নিলয় ভাবলেশহীন গলায় বলল, তা, আপনাদের প্রস্তাবটা জানতে পারলে এবার ভালো হয়।

—জাস্ট এ মিনিট। সান্যাল, নিলয়বাবুকে শ্রাণ্ডো অ্যাণ্ড ববিটা দেখিয়ে দাও। নিলয়বাবু, আপনাকে একটা ফিল্ম দেখাচ্ছি। ভালো করে দেখে রাখবেন। ইউ হ্যাভ টু রিপিট দোজ থিংস। কোনো সিন্ডা নেই। দিস লেডি ইজ ভেরি হেল্প্‌ফুল। সান্যাল এক্সসেলেন্ট ক্যামেরাম্যান। ঘণ্টা চারেকের কাজ। আপনাকে আমরা চারটের মধ্যে ছেড়ে দেব।

সান্যাল একটা প্রোজেক্টর অ্যাডজাস্ট করছে। দেয়ালে আলোর আয়তক্ষেত্রটা বাড়ছে কমছে। শব্দ হচ্ছে কিরকির করে।

মিনিট খানেক পরে সান্যাল বলল—ঠিক আছে।

সুইচ টেপার শব্দ হল। ঘরের আলোগুলো নিভে গেল। কয়েক সেকেন্ড নিশ্চিন্দ অন্ধকার। তারপরই প্রোজেক্টর থেকে আলোর বিজ্জ্বরণ দেয়ালে গিয়ে ফুটিয়ে তুলল।

তিনটি শব্দ—স্মাণ্ডা অ্যাণ্ড ববি ।

—নিলয়বাবু, পাশ থেকে নরম গলায় বলে চলল বাহু, পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী দুটো: ইনস্টিংক্ট নিয়ে জন্মায়। প্রিজারভেশন আণ্ড রিপ্ৰোডাকশন অব লাইফ। রিপ্ৰোডাকশনের প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের মধ্যে দেখা দেয় অদম্য যৌন আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার নানাভাবে প্রকাশ ঘটছে, বিকাশ ঘটছে। এবং এটা ঘটছে প্রাকৃতিক নিয়মেই। এর মধ্যে অনেকে বিকৃতি আবিষ্কার করে। আমরা বলি, না, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিস। প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত আনন্দের উপকরণ টেলে দিয়েছে তাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার অধিকার মানুষের জন্মগত। কিন্তু কিছু নকল নীতিবাগীশ আইন করে মানুষের এই জন্মগত অধিকারকে খর্ব করতে চায়। এদের হাতে ক্ষমতা, আইন, স্টেট-পাওয়ার। কিন্তু আমরা মানি না। আমরা তাই মানুষের চরম আনন্দের দৃশ্য ফিল্মে ধরে রাখি, মানুষকে চূড়ান্ত আনন্দের আন্বাদ দিতে চাই। আমরা আনন্দের কারবারী—ডিলায়স্ ইন প্লেজার। হ্যা, উই মেক মানি আউট অব ইট। পৃথিবীতে কিছুই বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না। আনন্দ পেতে হলেও টাকা দিতে হয়।...

এ পাশ থেকে চলছে বাহু সাহেবের অবিরাম কথকতা, অশ্লদিক থেকে মেয়েটি নিলয়ের নিরন্তর শরীরটাকে নিয়ে হুঁহাতে ইচ্ছামতো খেলা করে চলেছে। নিলয়ের ঠাণ্ডা ঘাড় গালে পড়ছে ওর ঘন গরম নিশ্বাস। তারি ঠোঁট দুটো বারবার নিলয়ের গালে ঠোঁটে নিবিড় হয়ে আসছে।

আর দেয়ালের ওপর চলছে একটি বলিষ্ঠ নিগ্রো যুবকের সঙ্গে একটি শেভাল যুবতীর অবিখ্যস্ত কামকেলি।

নিলয়ের মনটা ধীরে ধীরে বুনো মোষের মতো ঘাড় বেকিয়ে শিং উঁচিয়ে লাড়ানো। বৃকের ভেতরে পাথুরে ঠাণ্ডা ক্রোধ।

তার আর বুঝতে বাকি নেই যে সে একটা ব্লু-ফিল্ম দেখানো ও তোলার আখড়ায় এসে পড়েছে। এককাল সে শুনেই এসেছে, কিন্তু এটা যে সমাজের আপাত-স্বচ্ছ চেহারার আড়ালে কতখানি গভীরে শিকড় ছড়িয়েছে তা জানার সুযোগ হয়নি। ছি ছি, মানুষ কোন্ অধঃপাতে নেমে গেলে নিজের বোনের স্বামীকে এখানে পাঠিয়ে টাকা নিতে পারে! নাট্টকে শিক্ষা দেবার সুযোগ এই মুহূর্তে তার নেই। কিন্তু অপমানের কিছুটা অন্তত এই ভদ্রবেশী কুকুর দুটোকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নিলয় তার অসম্ভব মানসিক দৃঢ়তা ও স্নায়ুহীন শীতলতায় অবাধ।

ছবি শেষ হল। ঘরের আলো জ্বলে উঠল। বাস্তব অনর্গল তবকথা

তখনো চলেছে ।

—প্রিন্স মিস্টার বাসু, এক ঝটকায় মেয়েটির হাত সরিয়ে টান টান হয়ে উঠে পাড়াল নিলয়, আপনার থিয়োরি থামান । কি করতে হবে বলুন ।

—যা দেখলেন তা-ই ।

—বেশ ! কত দেবেন ?

—ক্যাশ ডাউন এইট খাউজ্যাণ্ড । এবং মেনি মোর সাচ, অফারস্ ইন কিউচার । বাসু হাস্তময় ।

—ঠিক আছে । আমি রাজী, নিলয়ের মনে একটা কুট দাবাড়ু কাজ করছে, কিন্তু ছবি তোলার আগে মেক-আপ দিয়ে আমার অরুণকুমার-অরুণকুমার চেহারাটা পালটে দিতে হবে ।

—কি বলছেন আপনি, আঁতকে উঠল সান্যাল, ওটাই আপনার আসল অ্যাসেট । নইলে পাঁচশো দিলে আচ্ছা আচ্ছা পাঠ্যই জোয়ান ছোকরা-পাওয়া যায় ।

—এই ফ্যানটাসটিক টাকাটা দিচ্ছি সিম্পলি ফর ইণ্ডর অ্যাপিয়াবেল । বাসু বলল ।

—আমার অ্যাপিয়াবেল বলবেন না, বলুন অরুণকুমারের অ্যাপিয়াবেল । অরুণকুমারকে দেখাতে হলে অরুণকুমারের বা মিনিমাম ফী তা-ই আমাকে দিতে হবে ।

—কত চান আপনি ? বাসু জিজ্ঞেস করল ।

—তিন লাখ । নিলয় ছোট শব্দ দুটিকে টেনে যথালম্বব দীঘ করল ।

—আর ইউ ম্যাড ! বাসু লাফিয়ে উঠল ।

—হতে যাচ্ছিলাম । কিন্তু আপনার চিকিৎসায় সেবে উঠেছি । ধন্যবাদ ।

—আপনি এ রকম করবেন জানলে আমি অ্যারেঞ্জমেন্টস্ করতাম না, বাসু মুখেব চেহারা গম্ভীর করল, জানেন আমার কত টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে ।

—যদি মনে করেন আপনার সঙ্গে আমার কোনোরকম চুক্তি হয়েছিল, নিলয় বলল, চুক্তিভঙ্গের জন্য মামলা করতে পারেন ।

—নিলয়বাবু, আপনার কালচার এডুকেশন কি আপনার থেকে অন্তত পঁচিশ বছরের বড় একজন-ভ্রলোকের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে শিখিয়েছে ? আপনি জানেন আমাদের সম্পূর্ণ বাবলাটাই চলছে বিশ্বাসের ওপর । আমরা মাহুশকে বিশ্বাস করি । খাতাপত্র হিসাব আমাদের থাকে না...

—স্বাধা সম্ভব নয় । নিলয় ধরিয়ে দিল ।

—হ্যাঁ, স্বাধা সম্ভব নয় । নাটুবাবু আমাকে ওয়ার্ড অব্ অনার দিয়েছিলেন ।

—নাটুবাবুর নামের সঙ্গে ওয়ার্ড আর অনার শব্দ ছুটো মানায় না। দেখা হলে ওকে বলবেন ওর জন্ত একজোড়া নতুন চম্বল আমি কিনে রাখব। ওর পালে ছিঁড়বার জন্ত।

সান্যাল এক মুঠো লাড্ডু নিয়ে খেতে খেতে পাশে এলে দাঁড়িয়েছে।—হি হি হি নিলয়বাবু, নাটুবাবু আপনার জীব বড়ভাই। তার সম্পর্কে এ ধরনের...

নিলয় সান্যালকে বাধা দিয়ে বলল—চম্বল জোড়ার এক পাটি নাটুবাবুর পালে ছিঁড়ব আমি, আরেক পাটি ছিঁড়বেন আমার জী। আমাদের এইসব অভ্যন্তর আচরণ নিয়ে আপনারদের মাথা না ঘামালেও চলবে। আচ্ছা, আপনার নাম কি বিত্ত সান্যাল ?
—হ্যাঁ।

—চমৎকার। তাহলে তিন লাখ আপনারা দিতে পারছেন না? চলি তাহলে। দরজার দিকে এগোল নিলয়।

বাহু ছুটে এসে বলল—এখনো ভেবে দেখুন নিলয়বাবু। এ স্বযোগ আর পাবেন না।

নিলয় দাঁড়াল। মুখে হাসি।—একটা আইডিয়া দিতে পারি। ভেবে দেখতে পারেন। আমার বদলে আপনি বা মিস্টার সান্যাল নেমে যান ঐ বেস্তার্টার সঙ্গে। চমৎকার একটা কমিক ক্লব্বিং হবে।

ভেড়ে এল মেয়েটি। অস্বীল পালাপাল করতে লাগল। নিলয় নির্বিকার।

—নিলয়বাবু, আপনি যেতে পারেন। আজ যা দেখলেন তা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। পরিশ্রম ভালো হবে না। বাহুর মুখের চেহারা অভ্যন্তর কঠিন ও নিষ্ঠুর।

—ভয় দেখাবেন না। ভয় আমি আয় পাই না। বলে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিলয়।

বাস থেকে নেমে নিলয় প্রথমে টুকল বাজারে। স্বন্দর একটা ফুলের তোড়া কিনল। দোকানীর কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখল—আপনার ক্ষত আরোগ্য কামনা করি—নিলয় মজুমদার। কাগজটা ফুলের তোড়ার ওপর এঁটে দিল।

নার্সিং হোমের বাইরে সারি সারি গাড়ি। এখানে-ওখানে মাহুষের জটলা।

নিলয় টুপি আর পগলস্ খুলে ফেলল।

ভারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে রিসেপশন কাউন্টায়ে গিয়ে বলল—আমি অরুণকুমারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কাউটাের মেয়েটি বলল—আপনার নাম ?

—নিলয় মজুমদার ।

—আমি খুব পাঠাছি । তবে দেখা বোধ হয় হবে না । উনি খুব কম লোকের সঙ্গেই দেখা করছেন, আপনি অপেক্ষা করুন ।

—আপনি বরং বোকেটা ঠুকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন । তারপর যদি আমাকে বেতে বলেন বাব । আমি বলছি ।

—দিন ।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না । ফুলের তোড়াটা কেবল এল নিলয়ের হাতে । কাগজের টুকরোটোর উলটেটা পিঠে লেখা—আপনি আর কখনো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবেন না ।

কাগজটা দেখতে দেখতে নিলয়ের মুখে একটা অদ্ভুত হাসির আভাস ফুটে উঠল ।

ও ভরতর করে নেমে এল রাস্তায় । কাগজটা উড়িয়ে দিল হাওয়ার । ফুলের তোড়াটা দোলাতে দোলাতে খুশির চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটতে লাগল ।

বাবো-ভেরো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ধারে । কাঁখে ঝোলানো ফুলের ব্যাগ ।

নিলয় মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল—মামণি, তুমি ফুলগুলো নেবে ?

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল ।

—নাও না । নিলয় মিনতির স্বরে বলল ।

এবার হাসিমুখে হাত বাড়াল মেয়েটি ।

নিলয় মেয়েটির হাতে ফুলের তোড়াটি দিয়ে বলল—সন্দী মেয়ে । তুমি আমার ছোট্ট বা ।

তারপর রাস্তা পার হয়ে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াল । হাতবড়িতে সময় দেখল । বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে বাবে । তা হোক । যা নিনা ভাববে । তাহলেও উপায় নেই, শহরের দুই প্রান্তে দু'টি বাছুর তার অন্ত অপেক্ষা করে আছে । তাদের কাছে তাকে আজই বেতে হবে । এখনই ।